উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

প্রথম সেমেস্টার

মঙ্গল কাব্য ও আখ্যান কাব্য

কোর পত্র – ১০৩ (আবশ্যিক)

পর্যায় – খ

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় ক

একক ১- মনসামঙ্গলের কাব্য পরিচয় ও চরিত্র

একক ২- মনসামঙ্গলের চরিত্র

একক ৩- মনসামঙ্গল ও পুরাণ

একক ৪- মনসামঙ্গলের লোকাচার ও রীতিনীতি

একক ৫- লোরচন্দ্রানীর প্রেক্ষাপট ও কাব্য পরিচয়

একক ৬- লোরচন্দ্রানীর চরিত্র সৃষ্টি

একক ৭- লোরচন্দ্রানী- রোমান্টিক ও মৌলিক কাব্য

পর্যায় খ

একক ৮- চন্ডীমঙ্গলের কাব্য পরিচয়

একক ৯- চন্ডীমঙ্গলের কাহিনীবৃতান্ত

একক ১০- চন্ডীমঙ্গলের পুরাণকথা

একক ১১- চন্ডীমঙ্গলের ভাষা

একক ১২- চন্ডীমঙ্গলের চরিত্র

একক ১৩- বাস্তবতা ও চন্ডীমঙ্গল

একক ১৪- গোরক্ষবিজয়

১০৩ - মঙ্গলকাব্য ও আখ্যান কাব্য

পর্যায় খ

একক ৮- চন্ডীমঙ্গলের কাব্য পরিচয় – কবিজীবনী, আত্মবিবরনী, কবিকঙ্কণের কাব্যরচনাকাল, কাহিনী-নির্বাচন ও শিল্পীমন, বাস্তবতা ও বিশিষ্টতা।

একক ৯- চন্ডীমঙ্গলের কাহিনীবৃতান্ত - চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'আখেটিক খণ্ডে'র কাহিনীসার, কাহিনীবৃত্ত : ধনপতির আখ্যান(বণিকখন্ড), কাহিনী-আভাস : শিব-চণ্ডী বৃত্তান্ত।

একক ১০- চন্ডীমঙ্গলের পুরাণকথা - পৌরাণিক প্রসঙ্গ, অলৌকিকতা, উপন্যাসের লক্ষণ, হাস্যরস।

একক ১১- চন্ডীমঙ্গলের ভাষা - মুকুন্দের কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব, কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলেঃ সতীন সমস্যা, ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, প্রবাদ প্রবচন।

একক ১২- চন্ডীমঙ্গলের চরিত্র - চন্ডীমঙ্গলের চরিত্র, শিব ও চণ্ডী, কালকেতু ও ফুল্লরা, মুরারি,ভাঁড়ু, ধনপতি-খুল্লনা-লহনা-দুর্বলা।

একক ১৩- বাস্তবতা ও চন্ডীমঙ্গল - বাস্তববোধ ও চন্ডীমঙ্গল, দ্বিজ মাধব এবং মুকুন্দরাম, কালিদাস এবং মুকুন্দরাম, ফুল্লরার বারমাস্যা, সামাজিক ও পারিবারিক জীবন, পশুদের দুঃখ বর্ননা, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ।

একক ১৪- গোরক্ষবিজয় - গোারক্ষবিজয়

একক ৮- চন্ডীমঙ্গলের কাব্য পরিচয়

বিন্যাস ক্রম

৮.১ কবিজীবনী

৮.২ আত্মবিবরনী

৮.৩ কবিকঙ্কণের কাব্যরচনাকাল

৮.৪ কাহিনী-নির্বাচন ও শিল্পীমন

৮.৫ বাস্তবতা ও বিশিষ্টতা

৮.৬ নির্বাচিত প্রশ্ন

৮.৭ সহায়ক গ্রন্থ

৮.১ কবিজীবনী

মুকুন্দরামের এই স্বাতন্ত্র অনুসরণগ্যো। কোথায় এই স্বাতন্ত্র? এর উৎস কি কবির জীবনে। অথবা গভীর সত্তায়?

কবির জীবনকথা সামান্য। উপকরণও বেশি নেই। কবির আত্মজীবনীটি এর প্রধান অবলম্বন। পণ্ডিতমহলে কিছু বিতর্ক আছে। সুনির্দিষ্ট সন-তারিখ নির্ণয়ে তাঁরা একমত হতে পারেননি। এ বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত অসম্ভব। তবে -ষাড়শ শতকের একেবারে শেষ ভাগে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি রচিত হয়েছিল বলা যায়। সঠিক হিসেবে বছর কুড়ি-পঁচিশের গরমিল হচ্ছে। কিন্তু তা -ষাড়শ শতকের শেষ দিকের চতুর্থাংশের সীমাকে কোন দিকেই ডিঙিয়ে যাচ্ছে না।

মুকুন্দরামের জন্ম হয়ে -ষাড়শ শতকের প্রথম দিকে। সম্ভবত তিনের দশকে। কবির পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, মাতা দৈবকী। বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রাম ছিল কয়েক পুরুষ ধরে তাঁর পৈতৃক নিবাস। দামুন্যার তালুকদার নন্দীদের জমিজমা পুরুষানুক্রমে চাষবাস করিয়ে মুকুন্দরামদের জীবিকা নির্বাহ হত।

পঞ্চোপাসক হিন্দু পরিবারের সন্তান মুকুন্দরাম। তবে বিশেষ করে শিবভক্ত ছিলেন। তাঁরা। পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

সরল গ্রাম্য জীবন ধীর লয়ে বয়ে চলছিল। এমন সময়ে রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক বিপপাত দামুনা গ্রামকে বিপর্যস্ত করে দিল। বহুকাল পরে কবি স্মৃতিচারণায় বলেছেন-

ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।
সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিপ।।

সম্ভবত কবির স্মৃতি ঐতিহাসিক কালজ্ঞান থেকে কিছু ভ্রষ্ট হয়েছে। মানসিংহ বঙ্গের সুবাদার থাকাকালে উক্ত মাৎস্যন্যায় দেখা দিয়েছিল কিনা এ বিষয়ে সংশয় আছে।

সে যাই হোক, মুকুন্দরামের যৌবনকালে রাজকর্মচারীদের অত্যাচারে দামুন্যার জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল বলে মনে হয়। কবি তার বস্তুনিষ্ঠ এবং বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে কবির পর্যবেক্ষণ ও রচনাক্ষমতার যেমন পরিচয় আছে, তেমনি আছে কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ ডিহিদার-পোদ্দার-উজিরে মিলে শোষণে আর অত্যাচারে শ্মশান-বিভীষিকা সৃষ্টি করে তুলল। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে মুসলমান প্রশাসকদের বিদ্বেষ ঘনীভূত হয়ে উঠল। জমির মাপ নেওয়া হল কোণে-কোণে দড়ি ধরে। পনের কাঠায় এক কুড়ার হিসেব লেখা হল। অনাবাদী জমিকে ধরা হল সুফলা বলে। ফলে খাজনা যা ধার্য হল তা যেমন অন্যায্য, তেমনি প্রজার শক্তির অতীত। চারদিকে পড়ে গেল হাহাকার। কর্মচারীদের ঘুষের হাত নির্লজ্জভাবে প্রসারিত হয়ে রইল; ঘুষেও উপকার মিলত না। সুযোগ বুঝে পোদ্দার বসাল মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। ধার দিতে

গিয়ে দিনপ্রতি এক পাই সুদ তো রাখলই, টাকায় আড়াই আনা করে অকারণে কেটে নিতে লাগল। লোক জন ত্রাসে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হল। গ্রাম ছেড়ে সব পালাতে লাগল—ধান-গরু সহায়-সম্বল জলের দরে বিক্রি করে। কিনবার লোক মেলা ভার। খেতেখামারে কাজ করবার মত দিনমজুরও রইল না দেশে।

খাজনার ভয়ে প্রজা পালাচ্ছে দেখে প্রতি গৃহস্থের দরজায় পাইক বসা-না হল। মুকুন্দরামের জমিদার -গাপীনাথ নন্দী বন্দী হলেন! কবি এবারে বিশেষ আতঙ্কিত হলেন। গরিব খাঁয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে শ্রীমন্ত খাঁর সহায়তায় জন্মভূমি দামুন্যা ত্যাগ করলেন। সঙ্গে বয়স্ক পুরুষের মধ্যে অনুজ রামানন্দ এবং অনুচর দামোদর নন্দী। মধ্যপথে দস্যুসদার রূপরায় সঞ্চিত ধনসম্পত্তি কেড়ে নিল। সম্ভবত রামানন্দের বুদ্ধির ভুল এর জন্য কতকটা দায়ী ছিল। হলে কবি লিখতেন না

ভাই নহে উপযুক্ত রূপরায় নিল বিত্ত।

সম্বলহীন কবিকে নিজগৃহে আশ্রয় দিল যদু কুণ্ডু। তিন দিবসের আহার্যও দান করল। এর পর কবি জলপথেই গোড়াই নদী বেয়ে তেউট্যায় পৌঁছলেন। সেখান থেকে দারুকেশ্বর নদী ধরে বাতনগিরিতে গেলেন। বাতনগিরির গঙ্গাদাস সম্বলহীন কবিকে নানাভাবে সাহায্য করল। অবশেষে তিনি দামোদর নদ হয়ে কুচুট নগরে উপস্থিত হলেন। কবির আর্থিক দুরবস্থা তখন চরমে পৌছেছে। স্নানের তেল জোটে না, ভাতের জন্য শিশুপুত্রের কান্না থামাতে হয় জল দিয়ে।

ক্ষুধা-ভয়-পরিশ্রমে কাতর নিদ্রিত মুকুন্দরাম স্বপ্নে চণ্ডীর দেখা পেলেন, কাব্য লিখবার জন্য আদিষ্ট হলেন। অবশেষে শিলাই নদী ধরে চলতে চলতে আড়রা গ্রামে গিয়ে বিপন্মুক্ত হলেন। এ অঞ্চলের জমিদার ব্রাহ্মণ—নাম বাঁকুড়া রায়। মুকুন্দরামের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে দশ আড়া ধান পুরস্কার দিলেন এবং আপন পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন। মুকুন্দরামের আর্থিক সমস্যা মিটল। অবশেষে তাঁর ছাত্র রঘুনাথ জমিদার হলেন। কিন্তু কাব্যরচনা আর হয় না। অনুচর দামোদর নন্দী স্বপ্নের

খবর রাখত। তার উৎসাহ প্রথমাবধিই ছিল। অবশেষে নরপতি রঘুনাথের অনুরোধে কবি কাব্য রচনা করলেন।

৮.২ আত্মবিবরনী

মুকুন্দরামের জীবনের তথ্য এইটুকুমাত্র জানা গিয়েছে। ঘটনা খুব সামান্য, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে কবির জীবনবোধের কেন্দ্রে পৌছানো যায় কিনা তাই আমরা খুঁজে দেখব।

মুকুরামের জীবনে হয়তো আরও কিছু ঘটনা ছিল। কিন্তু তা পাওয়া যায়নি। কবি তাঁর সমগ্র জীবন কাহিনী বিবৃত করতে চাননি। গ্রইবচনার পূর্ব-কথা মাত্র ব্যক্ত করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর জীবনে আরো কিছু ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়। তবে সে-তথ্য আমাদের হাতে নেই। প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যেই সিদ্ধান্তে পৌছানো ভালো । অবশ্য আমার বিশ্বাস মুকুন্দরামের জীবনে আর-কোন উল্লেখযোগ্যঘটনা ঘটেনি। ঘটনাবিরলই তাঁর জীবন। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে মুন্যা ত্যাগ, পথের বিপদ, নিষ্করুণ দারিদ্র্য, বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় লাভ এবং দীর্ঘকাল পরে রঘুনাথের অনুরোধে চণ্ডীমঙ্গল রচনা। মুকুন্দরামের জীবনের সর্বপ্রধান অভিজ্ঞতা দামুন্যার মাৎস্যন্যায় থেকে বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়প্রাপ্তি পর্যন্ত। চণ্ডীমঙ্গল রচনাও কবির মনের দিকে থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাইরের ঘটনাবর্তে প্রবল তরঙ্গ ও উত্তেজনা এর দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে না। কাজেই বিবরণযাগ্য কিছুই এর মধ্যে নেই। এক পংক্তিতেই কাব্যরচনার বিষয়টির উপর ছেদ টানলেন। তাঁর কবিচিত্তের বিস্ফার হৃদয়াভ্যন্তরেই গুপ্ত রইল। সে-উপলব্ধি তাঁর একার, অপরে তার অংশীদার নয়। তাই সে কথা কবির অন্তরেই গুঞ্জরিত হয়েছে, বাইরে প্রকাশ পায়নি। বাহির-অন্তর জুড়ে যে প্রবল ঘটনাসংক্ষোভ কবির একমাত্র অভিজ্ঞতার বস্তু তা হল এই মাৎস্যন্যায়ে জন্মভূমি-ত্যাগ। পরবর্তী কালে অনুরূপ তীব্র কোন অভিজ্ঞতা লাভ করলে কবি নিশ্চয়ই তা আত্মজীবনীতে উল্লেখ করতেন। ঐ অভিজ্ঞতা যে কবিজীবনে একক এবং বিপুল প্রভাব বিস্তারে তাৎপর্যপূর্ণ তা বোঝা যায় দুটি কারণে।

১. কবির আত্মজীবনী উক্ত ঘটনার বিবরণেই পূর্ণ। কবি অবশ্য এর নাম দিয়েছেন। গ্রন্থেৎপত্তির কারণ। কিন্তু চণ্ডীর স্বপ্নদেশের মত মঙ্গলকাব্যের একটা প্রথানুগ কাল্পনিক

ব্যাপারকে যে-কোন প্রসঙ্গেই বিবৃত করা যেত। কবি আপন জীবনের একমাত্র এবং বিশেষ উত্তেজক অভিজ্ঞতার সঙ্গেই তাকে যুক্ত করে প্রকাশ করলেন।

২. কবির ব্যে এই ঘটনার পরোক্ষ কিন্তু নিশ্চিত প্রতিফলন পড়েছে বহুস্থানে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তাড়িত কলিঙ্গ-প্রজাদের দেশত্যাগে দামুন্যাবাসীদের গ্রাম ছেড়ে যাবার স্মৃতি ধরে রেখেছেন। গুজরাটে কালকেতুর নগর-পত্তনে এমন একটি আদর্শ জনপদের কল্পনা করেছেন কবি, যার ভূমি-ব্যবস্থায় ডিহিদারি অরাজকতা স্থান পাবে না। কালকেতু বুলান মণ্ডলকে বলেছে—

আমার নগরে বৈস। যত ভূমি চাহ চষ
তিন সন বই দিও কর।
হাল পিছে এক তঙ্কা করো কাহার শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর।
খন্দে নাহি নিব বাড়ি রয়ে বসে দিও কড়ি
ডিহিদার না করিব দেশে।
সেলামী কি বাঁশগাড়ী। নানা ভাবে যত কড়ি
লইব গুজরাট বাসে।

কালকেতুর অচারে পশুদের ক্রন্দনের ভাষায় ও রাজকীয় অত্যরে পীড়িত ভূমিভিত্তিক মানুষের ক্রন্দন শ্রুত হয়েছে।

কিন্তু এই তীব্র দিনগুলি কবির ব্যক্তিত্বকে গঠন করেনি। প্রবল ঘটনাতরঙ্গের প্রতি কোনরূপ আবর্ষণ তিনি বোধ করেননি, প্রচণ্ডর কেশর চেপে উল্লাসের বিপুলতাকে তিনি আকণ্ঠ পান করতে চাননি। এ অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে উল্লেখ্য ব্যতিক্রম। ঘটনাবিরল জীবনের প্রাত্যহিকের মধ্যেই মুকুন্দ নিশ্চিন্ত থেকেছেন। পুরাতন বাঙালির জীবনযাত্রার যে স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন ড. নীহাররঞ্জন রায় এই প্রসঙ্গে সে-কথা মনে পড়ে, বৃহত্তর,

সংগ্রাম-মুখর, উল্লাস-উতরোল জীবনের স্পর্শও সেইজন্যই বাঙালির গ্রামীণ সংস্কৃতির স্রোতে কোন বৃহৎ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে নাই, তাহার তটরেখাকে প্রসারিত বা প্রবাহকে গভীর গম্ভীর করিতে পারে নাই। ...সেখানে জীবনের শান্ত, সংযত, সমতাল; পরিমিত সুখ ও পারিবারিক বন্ধনের আনন্দ ও বেদনা, সুবিস্তৃত উদার মাঠ ও দিগন্তের, নদীর ঘাট ও বটের ছায়ার সৌন্দর্য।

অবশ্য ষোড়শ শতক জুড়ে বাংলাদেশে রাজনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। পাঠানমোগলদের সংগ্রাম দীর্ঘকাল এবং বিস্তৃত স্থান জুড়ে চলেছে। তার কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মুকুন্দরাম লাভ করেছিলেন কিনা নিশ্চয় করে বলা যায় না। মেদিনীপুর-আড়রা গ্রামে বা নিকটবর্তী অঞ্চলে কোন যুদ্ধক্ষেত্র রচিত হয়েছিল কিনা সে-তথ্য আমাদের হাতে নেই। অন্যথায় সেকালে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রশ্নই ওঠে না। যুদ্ধবিগ্রহ, রাজনৈতিক বিপর্যয় একেবারে মাথার উপরে এসে না পড়লে মধ্যযুগের সাধারণ বাঙালি চঞ্চল হত না। মুকুন্দরাম এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। মনে হয় যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও কবির ছিল না। কারণ—

১. তাঁর যুদ্ধবর্ণনায় একান্ত অবাস্তব কল্পনাতিরেক;

২. আত্মজীবনীতে এ-জাতীয় উত্তেজক অভিজ্ঞতার অনুপস্থিতি।

সিদ্ধান্ত এই-

১. সাধারণ বাঙালি পরিবারকেন্দ্র নিত্যধর্মই মুকুন্দরামের জীবনে আচরিত।

২. মুকুন্দরামের পৃষ্ঠ-পাষক রঘুনাথ রায় গ্রাম্য ভূস্বামী মাত্র ছিলেন। তাঁর নরপতি অভিধা নেহাতই গৌরবসূচক। সেখানে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ও জীবন-বেগ যেমন ছিল, তেমনি ঐশ্বর্য ও বিলাসের আড়ম্বরও ছিল না। মুকুন্দরামের জীবনচচার অতি সাধারণ সামান্যতার সঙ্গে এই পৃষ্ঠ-পোষকতার সহজ সামঞ্জস্য আছে।

৩. মুকুন্দরামের ধর্ম-বিশ্বাস কিছুটা আ-লাচনার বিষয়। মুকুন্দরামের জন্ম শৈব পরিবারে। কিন্তু তাঁর পিতামহ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। আবার মুকুন্দরাম শাক্তদেবী চণ্ডীর মাহাত্মজ্ঞাপক কাব্য লিখলেন। মুকুন্দরামের ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে এই

কারণেই বিতর্ক আছে। এ সম্পর্কে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমতই অনেকে মেনে নিয়েছেন, 'lt appears clear and transparent that Kabikankan Mukundaram Chakravarty was neither a Vaishnava, nor a Sakta, nor a Saiva, nor a Ganapatya : but he was everything. In other words, he was a believer of all the deties of the Smarta cult of meidieval Bengal." তবে কথাও মনে হয় বৈষ্ণব ভাবনার প্রতি কবির কিছু বেশি প্রবণতা ছিল। কাব্যশেষে তিনি স্বয়ং চণ্ডীর মুখে বলিয়েছেন-

কলির চরিত্র যত বিষম গণন।

ইহাতে ঔষধ কিছু আছয়ে কারণ।।

কলিকাল-গরলে ঔষধ নারায়ণ।

বদনে করিলে পান না দেখে শমন।।

ঘোর কলিকালে যেবা হরিনাম লয়।

জরা রোগ মৃত্যু শোক যমে নাহি ভয়।

এর কারণ, চৈতন্য-পরবর্তী কালে বৈষ্ণবতার সাধারণ প্রভাব।

8. মুকুন্দরাম বার্ধক্যে কাব্যরচনা করেছিলেন বলে মনে হয়। দেশত্যাগ করে পুত্রপরিবার সহ তিনি বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ তখন শিশু। রঘুনাথ জমিদারিলাভের বেশ কিছুকাল পরে কবি কাব্যরচনা করেন। দেশত্যাগের পরে কবির একটি শিশুপুত্রের উল্লেখ আছে। কাব্যরচনাকালে কবি পুত্র-পৌত্রাদির কল্যাণ, প্রার্থনা করেছেন। বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত পরিবারজীবনের বহুল অভিজ্ঞতায় (তা প্রবল নয়, বিচিত্র ঘটনাবর্তে ও উদ্দামতায়ও পূর্ণ নয়) মুকুন্দরামের কবিচিত্ত পুষ্ট হয়েছে। সে-জীবনের সুখদুঃখ, হাসি কান্না, জন্ম-মৃত্যুর লীলা তিনি অনেকই দেখেছেন, নিজেও -ভাগ করেছেন। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবর্তের সঙ্গে বয়সোচিত এক ধরনের দূরত্ব তৈরি হয়েছে। নিরাসক্তের দৃষ্টি কতকটা আয়ত্ত হয়েছে এই বয়সের গুণে। মানুষের

ভোগ ও ত্যাগ, প্রবৃত্তিতাড়না তথা আসক্তির আলোছায়ায় ভাসমান জীবন এক প্রসন্ন কৌতুকের সৃষ্টি করেছে কবির অধরে। চিরনবীন এই বালক-পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে এ হল বয়স্ক কবির প্রসন্ন হাস্যের উপহার।

৫. কিন্তু বয়সই এই নিরাসক্ত জীবনবোধের স্রষ্টা নয়। কবির ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রেই জীবনাতীত. উর্ধ্বচারী এক কবি-আত্মার স্থিতি। এই কবি-আত্মা জীবনস্রোতে তরঙ্গিত নয়, তার দর্শকাত্র। এবং স্মিতমুখ দর্শক। ভারতচন্দ্র এক জায়গায় বলেছিলেন,

চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ।

যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।

যে জন অচেতচিত্ত সেই সদা দুখী।।

প্রমথ চৌধুরী একটি প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এই সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু তা যথার্থ বলে মনে হয় না। এই চিদানন্দে চেতনাযুক্ত চিত্ত সেকালের বাংলা সাহিত্যে যদি কারও শ্বাকে তবে তা মুকুন্দরামের। এই দৃষ্টির বলেই তিনি আপন জীবনের তিক্ততম তীব্রতম অভিজ্ঞতাকেও একান্ত নির্লিপ্ত সুরে উত্তাপহীন কণ্ঠে বিবৃত করেছেন। পিতৃ-পুরুষের বাস্তুভিটা ত্যাগ করলেন, পথিমধ্যে সঞ্চিত সম্পদ লুণ্ঠিত হল, দারিদ্র্যের চরম স্তরে অপরের কাছ থেকে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে প্রাণরক্ষা করতে হল, ভাতের জন্য শিশুপুত্র ক্রন্দন করতে লাগল, নিজের ব্যক্তিজীবনের এই ঘটনাকেও কবি নিরাসক্ত দর্শকের মতই বর্ণনা করে গেলেন। আবেগের চড়া সুর কোথাও লাগল না। কবিদৃষ্টির কাছে নিজের জীবনও অপরের জীবনের মই দূরবর্তী।

কোন কোন বিশিষ্ট সমালোচক মুকুন্দরামের জীবন দুঃখময় বলে মনে করেছেন। দুঃখপূর্ণ জীবন কবিকে দুঃখবাদী করে তুলেছিল। চণ্ডীমঙ্গলে আছে তারই প্রতিফলন। কিন্তু এই মত ঠিক নয়। কারণ,

৫.১. মুকুন্দরাম জীবনে একটা বড় দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু আজীবন তীব্র দুঃখ-দরিদ্রই তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে, এমনও নয়। দেশত্যাগের পূর্বে বা বাঁকুড়া রায়ের আলাভের পরে অসচ্ছলতা কবিকে পীড়িত করেছিল—এমন প্রমাণ নেই।

৫.২. দু-একটি দুঃখের অভিজ্ঞতা তো দুরের কথা ব্যক্তিগত জীবন দুঃখময় হলেই মানুষ দুঃখবাদী হয় না। মুকুন্দরামের কবিবৃষ্টির কৌতুকবর্ষণে তাঁর গোটা কাব্যই সরস। এবং এই কৌতুকদৃষ্টির উৎসে আছে কবির নিরাসক্ত জীবনবোধ, তাঁর বস্তুতন্ত্রতা।

৬. মুকুন্দরাম একস্থানে স্পষ্ট করে বলেছিলেন বিচারিয়া অনেক পুরাণ' তিনি কাব্যরচনা করেছেন। বিশেষ করে এ-কথা উল্লেখ করবার তাৎপর্য কি? মুকুন্দরাম নিশ্চয়ই নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করবার জন্য এ-কথা বলেননি। কবির কাব্যদেহগঠনে সংক্ষিপ্ত পুরাণকাহিনীর সংযোজন কিছু বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। কবি কি এই কথা জানাতেই চেয়েছিলেন? অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃত কারণটি আরও একটু গভীরে বলে মনে হয়। কবির জীবনচেতনায়। আদর্শবাদ ছিল না, রোমান্টিক সৌন্দর্যাকৃতি বা রহস্যজড়িত অস্পষ্টতার লেশমাত্র চিহ্ন ছিল। না। কিন্তু পৌরাণিক জীবনভাবনার প্রভাব তাঁর মধ্যে এত পরিমাণ ছিল যে মাঝে মাঝে কবির বস্তুবাোধেও ফাঁকি জমে যেত। নিরপেক্ষ-নিরাসক্ত কবিদৃষ্টিও স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলত। পুরাণ-প্রসঙ্গে। তিনটি ক্ষেত্রে এর প্রমাণ আছে।।

৬.১. পুরাণ-কাহিনীর আতিশয্য।

৬.২. চরিত্রবৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য না রাখা। যেমন, কালকেতু-ফুল্লরার মত অনার্য। ব্যাধদম্পতীর কথায়ও পৌরাণিক উদাহরণের প্রাচুর্য।

৬.৩. ব্যাধসমাজের স্বাভাবিক বাস্তব চিত্রের উপরে পুরাণকথিত জীবনবোধের আরোপ।

কবির ব্যক্তিত্বকেন্দ্রে যে শিল্পীআত্মার প্রতিষ্ঠা তার প্রধান বিচ্যুতি ঘটেছে এই পৌরাণিক ভাবনার অতিরেকে। কবি কি তাঁর চিত্তের সেই দ্বিধা বুঝেছিলেন বলেই অনুরূপ উক্তি করেছিলেন, অথবা না জেনেই সাধারণভাবে কথাটি প্রকাশ পেয়েছে?

৭. মুকুন্দরাম দেবীর কাছ থেকে স্বপ্নদেশ পেলেন দেশত্যাগ করবার পরে পথের মধ্যে। আর কাব্য লিখলেন বহু দিন পরে। অনেকের মতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে। দেবীর প্রত্যাদেশ নেহাতই মঙ্গলকাব্যের প্রথা-রক্ষা, এ বুঝতে অসুবিধা হয় না। পথশ্রমে,

ক্ষুধায়, ভয়ে ও চিন্তায় কাতর অবস্থায় মুকুন্দরাম দেবীর দেখা পেয়েছেন। এই ভাবনার মধ্যে কবির বস্তুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় আছে। বিকারগ্রস্ত বা ক্লান্ত মনেই বিভ্রম-দর্শন সম্ভব। নানা ভাবেই কবি প্রথানুগ স্বপ্নদেশ বর্ণনা করেও ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন এই অলৌকিক ঘটনার অসম্ভাব্যতার। এই স্বপ্ন তার অচরিতার্থ কামনাই। কারণ তিনি কবি ছিলেন। বাঁকুড়া রায়কে আপনার কবিত্বশক্তির দ্বারা মুগ্ধ করেছিলেন তিনি।

পড়িয়া কবিত্ব বাণী সম্ভাষিণু নৃপমণি

রাজা দিল দশ আড়া ধান।।

তাঁর পূর্বপুরুষও কবিত্বলাভের বাসনায় বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন।

কয়্যারি কুলেতে জাত মহামিশ্র জগন্নাথ

একভাবে পূজিল গোপাল।

কবিত্ব মাগিয়া বর মন্ত্র জপি দশাক্ষর

মীন মাংস ছাড়ি বহু কাল।।

কিন্তু প্রকৃত কাব্য রচনায় নিযুক্ত হতে তাকে অনেক কাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। রঘুনাথের কৃপাদৃষ্টি ছাড়া কাব্যনির্মাণ সম্ভব ছিল না। প্রতিভার অধিকারী হয়েও কাব্য রচনার সু-যাগের জন্য তাঁকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে অন্তরের গভীরে তিনি কোন যন্ত্রনা অনুভব করেন নি।

৮.৩ কবিকঙ্কণের কাব্যরচনাকাল

দীনেশচন্দ্র সেন কবির পুত্র শিবরাম চক্রবর্তীর নামাঙ্কিত একটি ভূমিদানপত্র দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "বারা খা বর্ধমান সিলিমাবাদ পরগণার শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ১৬৪০ খ্রীঃ অঃ (১০৪৭ বাং সনে) কবিকঙ্কণের পুত্র শিবরাম ভট্টাচার্যকে বিশ বিঘা মৌরসী জমি প্রদান করেন। কবিকঙ্কণের বংশধর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় উক্ত দানপত্রখানি কদিনের জন্য আমার নিকটে রাখিয়াছিলেন।" নগেন্দ্রনাথ বসু রচিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' ব্রাহ্মণকাণ্ডে এই দলিলটি আলোকচিত্র

সমেত মুদ্রিত হয়েছে। এতে বারা খা ও কুতুব খাঁ দুজনেরই নাম আছে। দলিলটির আলোকচিত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে, এর লিপিকার ১০৪৭ নয়, ১০৪১ সাল। ৪ এর পরে ১ সংখ্যাটি লেনস দিয়ে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায়। দলিলটির লিপিকর ১-এর নীচের পুঁটলিটি থেকে উপর দিকে কোণাকুণি টান দিয়ে একটি দাঁড়ি লিখেছিলেন। ঐ দাঁড়ির সঙ্গে আর একটি কালির দাগ এমনভাবে মিশেছে যে তাকে ৭ বলে মনে হয়, কিন্তু বাংলা ৭-এর মাথা এমন তিনকোণা হয় না। সংখ্যাটি ১৬৪৭ হলে ৪-এর সঙ্গে ৭-এর এতখানি ব্যবধান থাকত না।

আমরা নীচে দলিলটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করলাম।

"শ্রীশ্রীযুৎ যুতায় মিঞা বারা খা

ব্রহ্মোর জমী দলঙ্গে শ্রীযুত কুতুব খাঁ

মহাসয় (?) শ্রীযুত জীউ

রববনী অত শ্রীসিবরাম চক্রবর্ত্ত্বী

নৌজে দামিন্যা পরগণে হাউলী

সরকার ছিলেমাবাজ গ্রাম মহকুরে ,

তোমাকে জমি বিষ ২০ বিঘা তুমি বাষবাড়ী দিন)

যুতিয়া জোতাইয়া...কে দোহা করিয়া পরম সুখে

ভোগ করহ অপর হা তীন তরফে সভাপণ্ডিতি।

বিত্তি আচার্য্য বরণ ও হুদি বিবরণ ও জলদান ও

জস্বের বিধি বেবস্তার চৌউত বেদীর সীমানা

ও গয়রহ তোমারে দিব ইতি ইস ১০৪১ সাল

তাং-১ ফাল্গুন।

দলিলটির আলোকচিত্রও আমরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের' তথ্য ও কালক্রম বইয়ে (পৃঃ ১২৮-এর বিপরীতে) দিয়েছি। (নগেন্দ্রনাথ বসু দীনেশচন্দ্র সেনের কাছ থেকেই দলিলটি নিয়ে তার পাঠ ও আলোকচিত্র প্রকাশ করেছিলেন। তার প্রমাণ, তিনি পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে (পৃঃ ৯৮) দীনেশবাবুর কাছে রক্ষিত কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত পুথি' বলে পরিচিত দামিন্যা গ্রামের পুথির আলোকচিত্রও প্রকাশ করেছেন।

শিবরাম চক্রবর্তীর আর একটি জমি দানের সনদ দেখেছিলেন অম্বিকাচরণ গুপ্ত। এতে "কুতব খাঁ নামক কর্মচারীর স্বাক্ষর ছিল। এঁর মারফৎ "দামুনা গ্রামে ষোল বিঘা বাস্তু বাগাত ইত্যাদি নিষ্কর করিয়া দেওয়া হয়েছিল বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি আরো লিখেছেন যে সনদটিতে "লিখিত তারিখ বড়ই দুর্বোধ কেবল ফায়ুন মাস এবং সন ১১২৫ সাল বেশ বুঝিতে পারা যায়।" (প্রদীপ, অগ্রহায়ণ ১৩১২, পৃঃ ২৯১-৩০২ দ্রষ্টব্য) এই দানপত্র এবং বারা খাঁর নাম সংবলিত দানপত্রকে আমরা ইতিপূর্বে এক ভেবেছিলাম। কিন্তু দুটি দানপত্র ভিন্ন। কারণ অম্বিকাচরণ লিখেছেন যে তার দেখা দানপত্রে "লিখিত তারিখ বড়ই দুর্বোধ" কিন্তু আমাদের দলিলটির "১ তারিখ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং এর সালাঙ্ককে। "১০২৫" পড়ার কোন কারণ নেই (অম্বিকাচরণ "১০২৫"-কে "বেশ বুঝিতে পারা যায়" বলেছিলেন)। আমাদের দলিল অনুসারে শিবরাম ২০ বিঘা এবং অম্বিকাচরণ কথিত দলিল অনুসারে ১৬ বিঘা জমি পান। সুতরাং (এ বইয়ে উল্লিখিত) শিবরাম চক্রবর্তীর ১০৪১ ও ১০৫৯ সনের, দলিল ছাড়াও তৃতীয় আর একটি দলিল ছিল, তার তারিখ ১০২৫ সনের (বঙ্গাব্দের) ফাল্গুন মাস অর্থাৎ ১৬১৯ খ্রীঃ।

শিবরাম চক্রবর্তীর আর একটি দলিলও মিলেছে (বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৬ দ্রষ্টব্য)। দলিলটি উদ্ধৃত করছি,

"পারসী-মাহর" নং'আদিকীর্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত সিবরাম চক্রবর্ত্তি সদাসয়েষু শ্রীলিখিত কার্য্যঞ্চ আগে মৌজে মুজাপুর তোমাকে আয়মা দিন ওয়া দোয়া করিয়া ভোগস্বত্ব গ্রামের রাজস্ব আমীদির তোমার সহিত রাজস্বের দায় নাহি আর আসল প্রদান আবহ পরগণাতে জে তোমার আমল আছে তাহা আমল করহ ইতি তা ২১ ফারুন সন ১০৫৯ সাল (১৬৫৩ খ্রীঃ)"

শিবরামের ১৬১৯, ১৬৩৫ ও ১৬৫৩ খ্রীঃ-র দানপত্র মিলেছে। তখন পিতা বেঁচে থাকতে পুত্রের নামে দানপত্র লেখা হত না। সুতরাং শিবরামের নামে প্রদত্ত প্রথম দানপত্র (১৬১৯): লেখা হবার আগে কবিকঙ্কণ কাব্যরচনা শেষ করে পরলোকগমন করেছিলেন বলে স্থির করা যায়।

এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা গেল, তার থেকে একটা বিষয় সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যে, কবিকঙ্কণের পূর্ণ অভুদয়কাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন কবির অভ্যুদয় তথা গ্রন্থরচনাকালকে আরও অর্ধ শতাব্দী আগে নিয়ে যেতে চান। তাঁর যুক্তি, (১) কবিকঙ্কণ চণ্ডীর প্রথম মুদ্রিত সংস্করণে গ্রন্থশেষে এই রচনাকালবাচক পয়ারটি ছিল,

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।

কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা।

কোন কোন পুথিতেও পয়ারটি পাওয়া যায় (প্রত্যেকটি পুথির তারিখই প্রথম মুদ্রিত সংস্করণের পরবর্তী; মনে হয় মুদ্রিত সংস্করণ থেকেই পয়ারটি নিয়ে পুথিগুলিতে বসানো হয়েছে। এর থেকে ১৭৬৬ শকাব্দ বা ১৫৪৪-৪৫ খ্রীঃ পাওয়া যায়। (ডঃ সুকুমার সেনের মতে) এটিই কবিকঙ্কণ চণ্ডীর রচনাকাল।

(২) কোন কোন পুথিতে এই ত্রিপদীটি মেলে--

এ অষ্টমঙ্গলা সায় শ্রীকবিকঙ্কণ গায় অমর সাগর মুনিবরে।

(সুকুমার রবুর মতে) অমর = ১৪, সাগর = ৭, মুনি = ৭ এবং এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী ১৪৭৭ শক বা ১৫৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গীত হয়েছিল।

(৩) রামগতি ন্যায়রত্নের ‘বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব বইয়ে লেখা আছে যে কবিকঙ্কণের পৃষ্ঠপোষক রাজা রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকাল ১৫৭৩ থেকে ১৬০২ খ্রীঃ। সুতরাং কবিকঙ্কণ এই সময়ের মধ্যেই কাব্য রচনা করেছিলেন।

কিন্তু এই তিনটি যুক্তিই অত্যন্ত দুর্বল। প্রথমত, শাকে রস রস বেদ ইত্যাদি চরণটি কবিকঙ্কণীর কোন প্রাচীন পুথিতে মেলে না। পক্ষান্তরে মুকুন্দ কবিচন্দ্রের লেখা বাশুলীমসলর (এটিও আসলে চণ্ডীমঙ্গল) মধ্যে বাশুলীমঙ্গলের রচনাকাল এইভাবে নির্দেশ করা হয়েছে, 'শাকে রস রস (রথ) বেশ শশাঙ্ক গণিতে'। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী ও বাশুলীমঙ্গল দুই কাব্যের লেখকের নাম মুকুন্দ', কাজেই শাকে রস' ইত্যাদি পয়ারটি গায়ন বা লিপিকরদেরহস্তক্ষেপে বাশুলীমঙ্গল থেকেই এসে কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর মধ্যে ঢুকেছে—এমন হওয়া খুবই সম্ভব।

ডঃ সুকুমার সেনের দ্বিতীয় যুক্তিটি সম্বন্ধে বলা যায়, অষ্টমঙ্গলা সায় ইত্যাদি ত্রিপদীটি যে কালবাচক, তার প্রমাণ নেই, তার মধ্যে শকাব্দ' কথাটিও উল্লিখিত নেই। তা ছাড়া অমর = ১৪ কোনমতেই ধরা যায় না। আসলে, এই ত্রিপদীর যে পাঠ সুকুমারবাবু পেয়েছেন সেটি ভুল। অনেক পুথিতে এর পাঠান্তর পাই,

'অষ্টমসলা সায় শ্রীকবিকা গাম শ্রীঅমর সোমের মন্দিরে!!

অর্থাৎ অমর সোম নামে কোন লোকের বাড়িতে কবিকঙ্কণ গান করছেন। এটিই ঠিক পাঠ। . ডঃ সেনের তৃতীয় যুক্তি অর্থাৎ রঘুনাথ রায়ের তথাকথিত রাজত্বকাল সম্বন্ধীয় যুক্তিটি সম্বন্ধে বলা যায় যে এই রাজত্বকাল কোন শিলালিপি বা প্রাচীন পুথিতে পাওয়া যায় না। রামায় চট্টোপাধ্যায় (মেদিনীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) এই রাজত্বকালটি সংগ্রহ করে রামগতি ন্যায়রত্নকে দিয়েছিলেন। এই জাতীয় উড়ো খবর মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। এটি নির্ভরযোগ্য নয় এই কারণেও যে এতে বলা হয়েছে যে রঘুনাথ রায় ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে, পরলোকগমন, করেছিলেন, কিন্তু তিনি যে ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন, তা মনে করার কারণ আছে (কোশিয়াড়ী শিলালিপি সম্বন্ধে আ-লাচনা দ্রষ্টব্য)

ডঃ সুকুমার সেন আত্মকাহিনীতে মানসিংহের উল্লেখ থাকায় এবং তার মতের সঙ্গে বিরোধ ঘটায় আত্মকাহিনীটিকে প্রামাণিক বলতে চান না। কিন্তু কবিকঙ্কণের আত্মকাহিনী বাংলা সাহিত্যের অমর সৃষ্টি, তার চণ্ডীমঙ্গলের অধিকাংশ পুথিতেই তা

পাওয়া যায়; অতএব তাকে জাল বলার, কিংবা তার মধ্যে মানসিংহের উল্লেখকে প্রক্ষিপ্ত বলার কোন কারণই নেই।

কবিকঙ্কণ ১৫৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে চণ্ডীমঙ্গল লিখতে পারেন না, কারণ

(১) এই কাব্যে ফারাঙ্গী বা ফিরাঙ্গী (পর্তুগীজ), হারমাদ (পর্তুগীজ জলদস্যু), আলু প্রভৃতির উল্লেখ মেলে। পর্তুগীজরা বাংলার সুলতানের কাছ থেকে কুঠি নির্মাণের অধিকার পায় ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে, তার সাত বছরের মধ্যেই তারা জলদস্যুবৃত্তি করে সকলের ভীতি উৎপাদন করতে লাগল এবং বাংলায় এই কয় বছরেই হারমাদ’ শব্দ চালু হয়ে গেল বলে ভাবা যায় না। ১৫৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় আলুও আসেনি। কবিকঙ্কণ এই কাব্যে তার পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথ রায় সম্বন্ধে বলেছেন, “বারভুইএগ্রা করে যার মান” (পঞ্চানন মণ্ডল সং, পৃঃ ৮); বারভূঁইয়ার উদ্ভব ১৫৪৪-৪৫ খ্রীঃ-র কয়েক দশক পরে ঘটেছিল।

‘শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা’র ‘রস’কে ৬ না ধরে ৯ ধরে কেউ কেউ এর অর্থ করেন। ১৪৯৯ শক বা ১৫৭৭ খ্রঃ। কিন্তু ‘বস’-এর আঙ্কিক অর্থ ৬, ৯ অর্থে এর ব্যবহারের প্রমাণ মেলে না।

সম্প্রতি কবিকঙ্কণের গ্রন্থরচনাকাল নির্ধারণ করার কিছু উপকরণ ডঃ বুদ্ধদেব আচার্য উদ্ধার করেছেন বিশ্বভারতীর ১৬৯ নং পুথি থেকে। কিন্তু তার আগে একটি কথা বলা দরকার। ইতিপূর্বে একটি পুথিতে (বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির ২১ নং বাংলা পুথি, ১২১৩ বঙ্গাব্দে। লিখিত) এই রচনাকালবাচক শ্লোকটি পাওয়া গিয়েছিল,

সাল শাকে বসু পৃষ্ঠে ঠেকিল অম্বর। নির্ঘাত মারিল বাণ চন্দ্রের উপর। ।

এই শকে পুথি হইল চণ্ডী অনুভব। ডিল্লীর তক্তেতে তখন বাদসা অরংজেব।।

(ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে, পৃঃ ২০৭)

এর থেকে ১৫০৮ শকাব্দ (বসু = ৮, অম্বর = ০, বাণ = ৫, চন্দ্র = ১) অর্থাৎ ১৫৮৬. ৮৭ খ্রীঃ পাওয়া যায়। এটি কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু

উপরে উদ্ধৃত চরণগুলির শেষটিতে দিল্লীর বাদশা অরংজেব অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের (রাজত্বকাল ১৬৫৮১৭০৭ খ্রীঃ) উল্লেখ থাকায় চরণগুলিকে অপ্রামাণিক বলে মনে হয়।

এখন আমরা বিশ্বভারতীর ১৬৯ নং পুথিতে যা লেখা আছে, তা নীচে উদ্ধৃত করছি,

চক্রবর্ত্তী বিস্তারিল ভূত ভবিষ্যতি। সক দিয়সিছে তার জ দিনের পুথি।।

যুন সক ব্যপৃষ্ঠে দিয়াছে অম্বরে। নিঘ্যাতে মারিয়া বাণ চন্দ্রের উপরে।।

সাকে রস রসে সাক সসাঙ্ক যুনিতে। অম্বিকামল গান হইল শ্লোক (গীতে)

বষু পূর্ব্বে অম্বর চন্দ্রের পরে বাণ। সাতে ছয় ছএ সাত সকের প্রমাণ।

সসাঙ্ক করিয়া ভাব করে আক রাখ।

(ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত সংস্করণের ২৮৮ পৃষ্ঠায়ও উপরে উদ্ধৃত অংশটি ছাপা হয়েছে।

উদ্ধৃত অংশের ৩য়-৪র্থ এবং ৭ম ছত্রের অর্থ ১৫০৮ শক বা ১৫৮৬-৮৭ খ্রীঃ ধরা যায়। বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির পুথির মত এখানে আওরঙ্গজেবের উল্লেখ নেই। কাজেই অংশটিকে কবিকণের স্বরচিত বলে মনে হতে পারে। এর থেকে এও মনে করা যায় যে, (১) ১৫৮৬৮৭ খ্রীঃ তাঁর কাব্যরচনা আরম্ভের তারিখ, (২) তিনি মানসিংহের শাসনকালে অর্থাৎ ১৫৯৪-: ১৬০৬ খ্রঃর মধ্যে কোন এক সময়ে কাব্যরচনা সম্পূর্ণ করেছিলেন, (৩) আত্মকাহিনীর ‘সে মানসিংহের কালে’ বা ‘রাজা মানসিংহ গেলে’ পাঠ ভুল, অধর্ম্মী রাজার কালে’ পাঠই ঠিক।

কিন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল তাঁর সম্পাদিত প্রাণরাম কবিবল্লভের কালিকামঙ্গল’-এর প্রাথনে (পৃঃ ১১) দেখিয়েছেন যে—১৩৩১-৩২ বঙ্গাব্দের মাধবী পত্রিকায় প্রকাশিত কালীমঙ্গল’ প্রবন্ধে ভুবনচন্দ্র ভট্টাচার্য এই ছত্রগুলি উদ্ধৃত করেছিলেন,

শুন শক বসু পিঠে ঠেকিল অম্বর। নির্ভয়ে মারিনু বাণ চন্দ্রের উপর।।

সাজাইবে পরলোকে অরাজনগর। নরংসহ সাহসুজায় বাধিল সমর।।

হেন কালে হৈল গীত শুন সর্ব্বজন।..

ভুবনচন্দ্রের মতে এই ছত্রগুলি কবীন্দ্রের কালিকামঙ্গলের রচনাকাল-নির্দেশক এবং কবীন্দ্রেরই রচনা। প্রথম দুই ছত্র (শুন শক ... চন্দ্রের উপর) থেকে ১৫৮০ শক পাওয়া যায় বলে ভুবনববুমনে করেন। চতুর্থ ছত্রের 'নরংসহ", "অরংসাহ" অর্থাৎ "আওরংজেব"কে বোঝাচ্ছে; তার সঙ্গে সুজার যুদ্ধ ১৫৮০ শকেই (৫ই জানুয়ারী, ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ) সংঘটিত হয়েছিল। এই নতুন আবিষ্কারের ফলে এ কথা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যাচ্ছে না যে, "শুন শক বসু পৃষ্ঠে দিয়াছে অম্বরে। নির্ঘাতে মারিয়া বাণ চন্দ্রে উপরে।" চরণদ্বয় কবিকঙ্কণের স্বরচিত এবং তাঁর। চণ্ডীমঙ্গলের রচনা ১৫৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়েছিল। আত্মকাহিনীর "অধর্ম্মী রাজার কালে", "সে মানসিংহের কালে" এবং "রাজা মানসিংহ গেলে"--এই তিনটি পাঠের মধ্যে কোনটি প্রামাঙ্কি এবং কবির দেশত্যাগকাল-নির্দেশক, তাও নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব হচ্ছে না। এইটুকু মাত্র নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল ১৫৯৪ খ্রীঃ (বাংলায় মানসিংহের শাসনালের প্রথম বছর) এবং ১৬১৯ খ্রীঃ (কবির পুত্র শিবরাম চক্রবর্তীর পাওয়া প্রথম দানপত্রের তারিখ)—এই দুই তারিখের মধ্যে কোন এক সময়ে সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং কবিকঙ্কণনিঃসন্দেহে ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন (এ সম্বন্ধে আমাদের নিজস্ব অভিমত ও তৎসংক্রান্ত যুক্তির জন্য এই প্রবন্ধের সর্বশেষ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ডঃ বুদ্ধদেব আচার্য এখনও মনে করেন যে (কবিকঙ্কণ মুকুন্দর চণ্ডীমঙ্গল ও আলোচনা ও পর্যালোচনা, পৃঃ ১৫-২২ দ্রঃ), "শুন শক বসু পৃষ্ঠে দিয়াছে অম্বরে" ইত্যাদি চরণদ্বয় থেকে ১৫০৮ শকাব্দ পাওয়া যায় এবং এটি কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'র রচনাকাল। ভুবনচন্দ্র ভট্টাচার্য এর যে। পাতন (১৫৮০ শকাব্দ) করেছেন তাতে বুদ্ধদেব আস্থাবান নন, কারণ 'ভুবনচন্দ্র যে পুঁথি। অবলম্বনে কালিকামঙ্গলের রচনাকাল লিখেছেন, সে পুঁথির কোন হদিস পাওয়া যায় নি।" পুথি, না পাওয়া গেলেও নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থেকে বলা যায় যে, ভুবচন্দ্রের পাতন সঠিক,

মন্তব্য

(১) ১৫৮০ শকাব্দে আওরঙ্গজেব ও সুজার যুদ্ধ হয়েছিল।

(২) বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির ১২নং পুথিতে আলোচ্য চরণদ্বয়কে "চণ্ডী" সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলে তারপর বলা হয়েছে, "ডিল্লীর তত্তেতে তখন বাদশা অরংজেব"। ১৩৮০ শকাব্দে আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন।

(৩) এই চরণদ্বয় যদি কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল-নির্দেশক হয়, তাহলে বলতে হবে ভুবনচন্দ্র জুয়াচুরি করে এটিকে কবীন্দ্রের কালিকামঙ্গলের রচনাকাল বলেছেন এবং তার বিকৃত ব্যাখ্যা (১৫০৮ শকের বদলে ১৫৮০ শক) দিয়েছেন। কিন্তু ভুবনচন্দ্রের যদি এই উদ্দেশ্য থাকত, তা হলে তিনি নগণ্য মাধবী' পত্রিকায় এটি প্রকাশ করে তারপর চুপচাপ বসে থাকতেন। ভুবনচন্দ্র যখন তার এই লেখা প্রকাশ করেছিলেন, তখন এই চরণদ্বয়ের ব্যাখ্যা নিয়ে কোন বিতর্ক দেখা দেয় নি এবং বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির ২১ নং পুথি কিংবা বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের পুথিশালার ১৬৯ নং পুথি আবিষ্কৃত হয় নি।

(৪) বিশ্বভারতীর পূর্বোক্ত ১৬৯ নং পৃথির লিপিকর ধর্মদাস ১২৩৯ বঙ্গাব্দে (১৮৩২-৩৩-- খ্রঃ) পুথিটি লিখেছিলেন, অর্থাৎ তিনি কবিকঙ্কণের প্রায় আড়াইশো বছর পরের লোক। অতএব তিনি "শুন শক বসু পৃষ্ঠে" ইত্যাদি চরণদ্বয়কে কবিকঙ্কণের রচনা বলেছেন—তাঁর এই। কথায় বিনা প্রমাণে আস্থা স্থাপন করা যায় না। ভুবনচন্দ্র ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যা অনুসারে কবীন্দ্র নিজেই আলোচ্য চরণদ্বয়ের দ্বারা তার লেখা কালিকামঙ্গলের' রচনার কালনির্দেশ করেছেন। যতদূর মনে হয়, কালক্রমে এই চরণদ্বয় কবিকঙ্কণের কাব্যের কোন পুথির লিপিকরের হাতে গিয়ে পড়ে এবং তিনি উ-ধার পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে একে কবিকঙ্কণের কাব্যের রচনাকাল নির্দেশক বলে চালান। অন্য কোন কোন লিপিকর তাকে অনুসরণ করেছেন। এটি যাঁরই লেখা হোক, তিনি কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'র রচনাকাল-নির্দেশক বলে কথিত বিভিন্ন পয়ার সংকলন করেছেন মাত্র, "সাকে রস রসে সাক সসাস্ক যুনিতে" "শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক

গণি'রই বিকৃত রূপক ডঃ বুদ্ধদেব আচার্য লিখেছেন, অধ্যাপক (সুখময়) মুখোপাধ্যায় উক্ত পয়ারের আঙ্গিক অর্থ ১৫০৮ শকাব্দ না ধরে ১৫৮০ শকাব্দ,বা ১৬৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দ ধরতে চেয়েছেন। একেবারে ভুল কথা। আমি কিছুই ধরতে চাইনি। আমি লিখেছিলাম, "ভুবনবাবুর মতে এই ছত্রগুলি কবীন্দ্রের কালিকামঙ্গলের রচনাকাল-নিদের্শক এবং কবীরেই রচনা।" (মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, ৩য় সং, পৃঃ ১৩৩) বুদ্ধদেব আমার বিচার-পদ্ধতি বুঝতে পারেন নি বলে মনে হয়। তিনি যখন কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর একটি পুথি থেকে "শুন শক বসু পৃষ্ঠে ইতাদি পয়ারটি আবিষ্কার করলেন, তখন আমি সেটিকে কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'র রচনাকাল-নির্দেশক বলে মনে করলাম, আবার যখন অক্ষয়বাবু পয়ারটি কবীন্দ্রের কালিকামঙ্গলের রচনাকালনির্দেশক বলে প্রমাণ উপস্থাপিত করলেন, তখন আমি দেখলাম এটি একটি বিতর্কমূলক বিষয়। বিতর্কমূলক বিষয়ের একদিক্ অবলম্বন করে কবিকঙ্কণের গ্রন্থরচনাকাল বিতর্কহীনভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। এইজন্য ঐ পয়ারকে বর্জন করে অন্যান্য প্রমাণের সাহায্যে এই বিষয় সম্বন্ধে আমি আমার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। তবে বুদ্ধদেববাবুর প্রবন্ধ পড়ে আমি নতুন করে বিষয়টির পর্যালোচনা করেছি এবং এখন আমার স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'র রচনাকালের সঙ্গে "শুন শক বসু পৃষ্ঠে দিয়াছে অম্বরে পয়ারের কোন সম্পর্ক নেই।

বুদ্ধদেব লিখেছেন, "এ পয়ারের মুখ্য অর্থ 'অঙ্কস বামাগতিঃ হিসাবে আমরা ১৫০৮। শকাব্দই ধরব।" 'অঙ্কস্য বামাগতিঃ' ধরলে "বসু পূর্বে অম্বর চন্দ্রের পরে বাণ' হয় ৫১০৮। আসলে এই চরণটিতে কৌতুকের ভঙ্গিতে বামাগতি ও দক্ষিণাগতি মিশিয়ে কালাঙ্ক লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। "শুন শক বসু পৃষ্ঠে দিয়াছে অম্বরে পয়ারটিতেও তাই করা হয়েছে। এর প্রথম চরণে রচনাকালের শেষাংশ। এখানে দক্ষিণা গতি। "বসু পৃষ্ঠে দিয়াছে অম্বরে" অর্থাৎ ৮ এর পিঠে ০ দ্বিতীয় চরণে 'মারিল বাণ চন্দ্রের উপরে"— এখানে রচনাকালের প্রথমাংশ; এখানে বামাগতি, ৫-এর বামে ১।

বুদ্ধদেব আচার্য অনেক কাল্পনিক কথাও লিখেছেন, যেমন ১৫০৮ শকাব্দ কবিকঙ্কণের দেবখণ্ডের রচনাকাল; "উজীর হল্য রায়জাদা"র উজীর' হচ্ছে রাজপ্রতিনিধি Wazir Khan ইত্যাদি। কিন্তু কল্পনা কখনও গবেষণার স্থান অধিকার করতে পারে না।

এখন, কবিকঙ্কণের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আমাদের নিজস্ব অভিমত লিপিবদ্ধ করছি। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়েছি যে কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল ১৫৯৪ থেকে ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। এখন আমরা নিঃসন্দেহ যে—এই কাব্য ১৬১৯ খ্রীঃর অল্পকিছু আগে, সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিকে রচিত হয়েছিল। এই মতের স্বপক্ষে যে যুক্তি তা সংক্ষেপে বলছি। দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল ও কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে কোন কোন বিষয়ে এমন সাদৃশ্য দেখা যায়, তাতে একজন কবি যে অপর জনের দ্বারা প্রভাবিত, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। মাধবের চণ্ডীমঙ্গল যে আকবরের রাজত্বকালে এবং ১৫০১ শকাব্দে (১৫৭৯-৮০ খ্রীঃ) রচিন্ন হয়েছিল, তা নিশ্চিত (এ সম্বন্ধে সুকুমার সেন যে-সব আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন, সেগুলি নিতাই দুর্বল; মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' বইয়ের ৩য় সংস্করণের কুড়ি' সংখ্যক অধ্যায়ে আমি সেগুলি খণ্ডন করেছি)। পক্ষান্তরে, কবিকঙ্কণ ১৫৯৪ খ্রীঃর আগে কাব্য সমাপ্ত করেন নি। সুতরাং তিনিই মাধবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। মাধব সপ্তগ্রাম অঞ্চলের -গাক, আর কবিকঙ্কণ দামিন্যা গ্রামের লোক। উভয় কবির দেশ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত হলেও দুই স্থানে দূরত্ব রয়েছে; তাই মাধবের চণ্ডীমঙ্গল* রচিত হওয়ার পরে বেশ খানিকটা সময় অতিবাহিত না হলে তার কাব্য কবিকঙ্কণের হাতে পৌঁছানো এবং শে-ষাক্ত কবির রচনায় তার প্রভাব পড়া সম্ভব বলে মনে হয় না। এই কারণেই, আমি করি-কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল ১৫১০ খ্রীঃর পরে এবং ১৫১৯ খ্রীঃর কিছু আগে রচিত হয়েছিল।

৮.৪ কাহিনী-নির্বাচন ও শিল্পীমন

মুকুন্দরাম কেন মঙ্গলকাব্য লিখলেন, বিশেষ করে চণ্ডীমঙ্গল লিখলেন কেন—এই জিজ্ঞাসার মধ্যে তাঁর শিল্পীমনের রহস্যের কিছু পরিচয় আছে। পুরাতন সাহিত্যের পাঠকের কাছে এর উত্তর খুব জটিল নয়। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল বা ধর্মঠাকুরের কাহিনী—শুধু সাহিত্যধারা হিসেবে এদের প্রতিষ্ঠা নয়, এরা ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। মনসার ভক্ত। মনসার কাহিনীই লিখবেন, বৈষ্ণব-সাহিত্য রচনার চেষ্টামাত্র করবেন না, কারণ বিশুদ্ধ। সাহিত্যিক চেতনা নয়, ধর্মসাধনাযুক্ত প্রথানুসরণই

তাঁর মজ্জাগত। মুকুন্দরাম কেন লিখলেন। তার কারণ কবির ধর্মবিশ্বাসে, সাহিত্যিক বিচারবোধে নয়। কিন্তু মুকুন্দরামের যুগে মঙ্গলদেবতাদের মহাত্মকীর্তন একটা সাহিত্যধারায় মাত্র পর্যবসিত হয়েছিল। চৈতন্য-প্রভাবে চণ্ডী-মনসার ক্ষমতায় বিশ্বাস তখন ক্ষয়িত। অন্তত অনার্যকুলসম্ভূত দেবদেবীর উচ্চকোটিতে স্বীকৃতি পাবার যে প্রাথমিক উৎসাহে বিজয়গুপ্ত-নারায়ণদেবের মঙ্গলকাব্য লিখিত তা আজ আরও সুদূর স্মৃতিতে স্তিমিত। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যেও এ সত্য প্রমাণিত। মুকুন্দরাম কাব্যশেষে স্বয়ং চণ্ডীর মুখে হরিনামের মাহাত্মকীর্তন করিয়েছেন। কলিকাল গরলে ঔষধ নারায়ণ। অথাৎ চণ্ডীমঙ্গল লিখতে কবিকে কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের সীমাভুক্ত হতে হয়নি। চৈতন্যোত্তর পর্বে মঙ্গলকাব্য একটা সাহিত্যিক ‘প্যাটার্ন বা কাব্যাকৃতিতে পরিণত হয়েছিল। কাজেই মুকুন্দরামের মত বড় কবি কেন এ জাতীয় একটি কাব্যাদর্শের অনুসরণ করলেন এ প্রশ্ন -তালা খুবই সঙ্গত। কারণ কবির এই নির্বাচনের মধ্যেও তাঁর শিল্পীমন অনেকখানি ধরা পড়বার কথা।

মুকুন্দরারে বৈষ্ণবপ্রীতি নানাভাবে তাঁর কাব্যমধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই একথা মনে করা যেতে পারে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের অন্যতম রচয়িতারূপে তিনি একজন মহাজন পদকর্তা হয়ে উঠলেন না কেন? এর উত্তর তাঁর কবিপ্রতিভার স্বরূপের মধ্যেই রয়েছে। বস্তুভারহীন, তথ্যোত্তীর্ণ, অনুভূতি-প্রাধান্য বৈষ্ণব কবিতার প্রাণ। হৃদয়ের গভীর রহস্যলোকে আশা-নিরাশা,সংশয়-সন্দেহ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির এক কুহেলি-আচ্ছন্ন মনোরাজ্যেই বৈষ্ণবপদের পরিক্রমা। মুকুন্দরামের কবিদৃষ্টি রহস্যলোকভেদে নিরুৎসাহ এবং সম্ভবত অসমর্থও, হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম ঊর্মিমুখরতা তাঁর বোধকে স্পর্শ করে না। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক মন্তয়ু এক্ষেত্রে অবশ্য স্মরণ-যাগ্য। মুকুন্দরাম রোমান্টিক কবি ছিলেন না, জীবনের সূক্ষ্ম, অপ্রত্যক্ষ ভাব-ব্যঞ্জনা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি প্রত্যক্ষ বাস্তবের কবি এবং এক সুপ্রতিষ্ঠিত ধারার বাহক। কাজেই বৈষ্ণব কবির অতীন্দ্রিয় ভাববিভোর কল্পনা তাঁহার মধ্যে প্রত্যাশা করা যায় না।

বোধ হয় এই একই কারণে মনসামঙ্গল কাব্যধারাও তাঁর কবিচিত্তের আশ্রয় হয়ে ওঠেনি। মনসামঙ্গলের কাব্যকল্পনায় এমন একটি বলিষ্ঠ আদর্শবাদ আছে, সর্বত্যাগী

কিন্তু জীবনরসপুষ্ট এমন এক সংগ্রামী চরিত্রের কল্পনা আছে যা প্রত্যক্ষ বাস্তবতায় দৈনন্দিনের অভিজ্ঞতা হয়ে ধরা দেবার নয়। বিশেষ করে বেহুলা-চরিত্রের মধ্যে মৃত্যুস্রোতে ভাসমান জীবনকে দু হাতে আঁকড়ে ধরবার যে রোমান্টিক কামনা ব্যঞ্জিত হয়েছে মুকুন্দরামের প্রতিভার স্বরূপেই তার থেকে পার্থক্য।

কবির ধনপতি-আখ্যানে খুল্লনা-ধনপতির পূর্বরাগ-বিবাহ-বিরহ ও পুনর্মিলনকে কেন্দ্র করে একটি অস্পষ্ট প্রেম কথা রচনার আভাস মিলছে। ধনপতির পারাবত-ক্রীড়ার কথা দ্বিজ মাধবেও আছে। কিন্তু মুকুন্দরামে ধনপতির কপোত লক্ষপতির গৃহচুড়ে উড়ে বসেনি, খুল্লনার অঞ্চল আশ্রয় করেছে। ধনপতির কথায় যে দ্ব্যর্থকতা আছে-

কে তুমি পায়রা লয়ে যাও হে সুন্দরী।

পারাবত লয়ে মোর প্রাণ কর চুরি।

তাতে বক্তার প্রণয়-নিবেদনের সুর বেজেছে। বিশেষ করে খুল্লনার পরিহাস-রসিকতায় পূর্বরাগসঞ্চারের ইঙ্গিত প্রায় স্পষ্ট। সে বলেছে-

প্রাণভয়ে পারাবত লয়েছে শরণ।

প্রাণ দিয়া রক্ষা করি অনুগত জন।।

নার দৈবে দিল পারাবত নাহি করি চুরি।

মিথ্যা কার্যে কর সাধু কপট চাতুরী।।

তুমি ত রাজার সাধু কে তোমাতে টুটা।

তবে দিব পারাবত দাঁতে কর কুটা।

এবং সুচতুর ধনপতির কাছে খুল্লনার মনোভাব অজ্ঞাত রইল না, ‘পরিহাসে ধনপতি বুঝে কার্য্যগতি। একদিকে পূর্বরাগের এই সুর, অন্যদিকে কাহিনীকাব্যের নিজস্ব আঙ্গিকের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বিস্তারিত বিরহ-ক্রন্দন বিশেষভাবে চোখে পড়ে। বসন্ত আগমনে খুল্লনার খেদ’, সারী-শুক-প্রতি খুল্লনা, তরুলতার প্রতি খুল্লনা, ‘কোকিলার

প্রতি খুল্লনা, 'খুল্লনার বিরহ-বেদনা প্রভৃতি অংশে প্রকৃতির পরিবেশে বিরহিণী নারীর বেদনাধারা অনেকখানি প্রকাশিত। একটি প্রেমকাহিনীর পূর্ণরূপ গড়ে উঠবার উপকরণ ধনপতি-কাহিনীর প্রথমাংশে ছিল, কিন্তু মঙ্গলকাব্যের কাঠামোয়, বিশেষ করে মুকুন্দরামের শিল্পীমনের প্রবণতায় সেরূপ সিদ্ধি সম্ভব ছিল না।

রোমান্টিক প্রণয়-চেতনার আকস্মিক মুক্ত দীপ্তিতে নয়, নিত্যপ্রবহমান পরিবার-ধর্মের কথায়ই মুকুন্দের পারদর্শিতা। এই পরিবার-ধর্ম থেকে কাহিনী যেখানেই উঁচু সুরে ম-নাবীণাকে বেঁধে দিতে চেয়েছে তার সেখানেই ছিড়ে গেছে। প্রেম-কথা-চিত্রণে অগ্রসর হয়েও তিনি দ্বিধামুক্ত নন। মুক্তপ্রেমের লীলা-বিলাস-বিচিত্রতা-বণ্যতা অপেক্ষা দাম্পত্য প্রণয়ের প্রাত্যহিক স্তিমিত আবেগের বর্ণনায় কবির আগ্রহ অনেক বেশি। যুদ্ধের প্রসঙ্গ কাহিনীর অনুরাধে এ-কাধিকবার এসেছে। কিন্তু সহজেই অনুভব করা যায় কবির মন সেখানে জাগেনি। সেবর্ণনা মামুলি এবং একঘেয়ে। কিছু বীররস এবং ডাকিনী-যোগিনী সহ-যাগে কিছু বীভৎস রসসৃষ্টির চেষ্টাও আছে। বাংলা রামায়ণ-মহাভারত যুদ্ধবর্ণনায় অনেকটা সহজ সাফল্য লাভ করেছিল; কোন কোন ধর্মমঙ্গলে সীমিত সার্থকতার কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে মুকুন্দরাম নুযনতম কৃতিত্বের দাবিও করতে পারেন না। যুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে কবি নিজের ভাব ও ভাষার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন। শ্রীমন্তকে রক্ষা করবার জন্য সিংহল রাজসৈন্যের সঙ্গে ভূতপ্রেত-ডাকিনী-যোগিনী পরিবৃত চণ্ডীর সংঘর্ষের একটি হুবহু সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মিলবে উজানীরাজ বিক্রমকেশরীর বিরুদ্ধে চণ্ডীর অভিযানে। এবং প্রত্যেকটি যুদ্ধের শেষে মৃত সেনানীর পুনর্জীবন ঘটেছে। ফলে যুদ্ধে যুদ্ধত্ব কিছুই থাকেনি, গতানুগতিক দেবীভক্তির সুরই বেজেছে।

মুকুন্দ কাহিনী-বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর পৌরাণিক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। তাদের সংখ্যা এত বেশি যে তাঁর কাব্যদেহের একটি প্রধান লক্ষণ বলে পুরাণ-কাহিনীর উপস্থিতিকে চিহ্নিত করতে হয়। কিন্তু কবির হাতে এই কাহিনীগুলি কোন বিশিষ্ট সৌন্দর্য-সষ্টিতে সমর্থ হয়নি। পুরাণঘটনার সমুচ্চ এবং বণাঢ্য চিত্র মুকুন্দরামের ভাষায় সিদ্ধ হবার নয়। জীবনঘটনার প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে কৌতুকহাস্যের অকস্মাৎ

বিচ্ছুরণে অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্রের গভীরে নূতন আলোকপাতে মুকুন্দরামের কৃতিত্ব। পৌরাণিক ঘটনার রাজ্যে কর্মযজ্ঞের যে মহাসঙ্গীত ধ্বনিত তার প্রবল, গম্ভীর ও সমুন্নত সুরলহরী কবির আয়ত্তে ছিল না।

তিনি পরিবারতন্ত্রের কবি। বাঙালির গৃহজীবনের শ্লথগতির স্তিমিত ঘটনার চিত্রাঙ্কনেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। কাহিনীর নানা শাখায়িত বিস্তার, পল্লবিত অলঙ্করণ এবং প্রথাবদ্ধতার মধ্য থেকে কবির সৃষ্টির এই কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্যে দৃষ্টিপাত করতে হবে। কবির বাস্তবদৃষ্টি আপন অভিজ্ঞতার জগৎ বাঙালি পরিবার-জীবনকেই বেছে নিয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীধারায় অন্য ধরনের দুর্বলতা থাকলেও মুকুন্দরামের ব্যক্তি-প্রবণতাকে যথোচিত সুযোগ করে দিয়েছে। তাঁর কবিদৃষ্টি এবং সৃষ্টিক্ষমতাকে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতেই তাঁর আপন রচনাশক্তির সর্বাধিক সাফল্যের সম্ভাবনা। মনসামঙ্গল কিংবা ধর্মমঙ্গলে পরিবারজীবনের কথা আছে, কিন্তু কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ একটা আদর্শবাদের দিকে; অথবা বহুবস্থিত এবং বিচিত্র যুদ্ধ-ঘটনার বর্ণনায়। অবশ্য মঙ্গলকাব্যমাত্রেই সমাজ ও পরিবারজীবনের যে ছবি প্রাপ্তব্য তা থেকে মনসামঙ্গল বা ধর্মমঙ্গল কাব্যধারা বঞ্চিত নয়। বিবিধ পূজার্চনা, মেয়েলি অনুষ্ঠান, বিবাহ, সাধ এবং নবজাতক শিশুকে কেন্দ্র করে নানাবিধ স্ত্রীআচারের বর্ণনা সর্বত্রই আছে। কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্য এই প্যাটার্ন-নিরপেক্ষভাবেই পারিবারিক জীবনলীলার উপ-ভাগ্য কাহিনী হিসেবে গ্রাহ্য।

মুকুন্দরামের কৃতিত্ব পারিবারিক জীবনের নিস্তরঙ্গ সামান্যতম আয়োজনকে রসাবেদনে অসামান্য করে তোলার মধ্যে। বাচনভঙ্গিতে নৈর্ব্যক্তিকতা এবং কাহিনীকথনের ফাঁকে ফাঁকে কৌতুক ও কটাক্ষের আলিম্পনায় তিনি পুরাতন বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়-রহিত। সর্বোপরি ক্ষুদ্র টাইপ-চরিত্ব সৃষ্টিতে নৈপুণ্য এবং কচিৎ গভীরতা প্রদর্শনে কবি-প্রাণের নিশ্চিত উদ্বোধন লক্ষ্য করা যায়।

৮.৫ বাস্তবতা ও বিশিষ্টতা

মুকুন্দ রোমান্টিক ছিলেন না, আদর্শবাদী ছিলেন না। তিনি বাস্তববাদী শিল্পী, বিষয়-নিবাচনে তাঁর শিল্পীসত্তারএই বৈশিষ্ট্য অনেকখানি প্রকাশ পেয়েছে। এমন কাহিনী কবি

বেছে নিয়েছেন যেখানে কল্পনাতিরেক, ব্যঞ্জনাপ্রাধান্য সূক্ষ্ম চিত্তবিস্কার এবং রহস্যমণ্ডিত অস্পষ্টতা নেই, আবার আদর্শবাদের উচ্চকণ্ঠও সেখানে ধ্বনিত নয়। মুকুন্দরামে কচিৎ গীতিপ্রবণতা আছে, কিন্তু আখ্যানকাব্যের কাঠামোকে তা ডিঙোতে চায়নি; কোথাও এর বস্তুধর্মে বাধার সৃষ্টি করেনি।

বাংলাদেশের পুরাতন কাব্যধারায় বৈষ্ণব কবিতাকে বলা চলে রোমান্টিক সুরের রচনা, মঙ্গলকাব্যকে চিহ্নিত করা উচিত বাস্তবধর্মী সাহিত্য হিসেবে। সব বৈষ্ণব কবি সমান রোমান্টিক নন। চণ্ডীদাসের সমুচ্চ রোমান্টিক ভাবকল্পনা ও রূপরচনার তুলনায় বিদ্যাপতির তীক্ষ্ণ বস্তুবোধ এবং তির্যক ভাবনা অনেকখানি বাস্তবধর্মী। মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও সব ধারায় বাস্তববতার অবকাশ সমান নয়। মনসামঙ্গলের কাহিনীকল্পনায় এবং চাঁদ সদাগর ও বেহুলাচরিত্রে রোমান্টিক ভাবনার কিছুটা স্থান আছে। আসলে বাস্তবতা ও রোমান্টিকতায় কৃত্রিম দূরত্ব কতকটা সমালোচকদের তৈরি করা। এদের মধ্যে নানা অনুপাতের মিশ্রণ প্রায়ই দেখা যায়। অবশ্য সব মঙ্গলকাব্যেই মধ্যযুগের বাঙালির জীবনের বাস্তব ছবি প্রধান হয়েছে। বাঙালির সমাজ এবং পরিবার-জীবন; জাতকর্ম থেকে প্রেতকর্ম পর্যন্ত যাবতীয় আচারঅনুষ্ঠানের মধ্যে দেবখণ্ডের কথা অবশ্য থাকবে, অলৌকিক ঘটনার ভূমিকাও হবে বেশ বিস্তৃত। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মঙ্গলকাব্যকথিত দেবতারাও বাস্তব পৃথিবীরই মানুষ একান্ত সাধারণ, রক্তমাংসের, বেদনা-আনন্দের, দুর্বল আবেগাতিরেকের—কোন অতিমানুষী শক্তির অধিকারীও তারা নয়। অলৌকিক ঘটনার সমারোহেও একটা সাধারণ প্রথানুগত্য অথবা দৈবীভক্তির পথ ধরে এসেছে। তাদের মঙ্গলকাব্যের অপরিহার্য দেহাংশ বলে গণ্য করতে হবে, কিন্তু কাব্যগুলির প্রাণধর্ম পর্যন্ত এরা পৌঁছায় না। মঙ্গলকাব্যগুলির উৎসে যে মানব-ভাবনা সক্রিয় তা বস্তুধর্মী, সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মানুষের বাস্তব কামনাবাসনা তুচ্ছ নয় মঙ্গলকবির ভাবনায়। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চাই, পুত্রকলত্র পরিজন নিয়ে আনন্দঘেরা সংসার চাই, রোগ শোক দুঃখদারিদ্র্য থেকে মুক্তি চাই। ইহলোকে সুখভোগ' এবং অন্তে যে স্বর্গ চাই তাও পার্থিব জীবনেরই একটা বর্ণাঢ্য রূপমাত্র। মঙ্গলকাব্যের সব কটি কাহিনীই পার্থিব দুঃখমোচনের কথা।

মঙ্গলকাব্যের এই সাধারণ বস্তুধর্মের মধ্যেও আবার মুকুন্দ বিশেষভাবে বাস্তবধর্মী। তাঁর এই বাস্তবতার বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানযোগ্য।।

১, মুকুন্দরাম অভিজ্ঞতার কবি। তাঁর বাস্তবচেতনার ভিত্তিতেও অভিজ্ঞতাই প্রথম কথা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রূপদান বাস্তববাদী শিল্পীর পক্ষে হয়তো সুবিধাজনক। যেসব ঘটনা এবং যে-জাতীয় মানুষের সংস্পর্শে তিনি প্রত্যক্ষত এসেছেন তাদের কথা বলায় কল্পনার ঋণ স্বীকার করতে হয় না। সত্যের প্রতি বিশ্বস্ততা অটুট থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে পদাপর্ণে তাঁর বাধা কোথায়? শিল্প প্রকৃতির আরসি নয়। এ-কথা বাস্তববাদী শিল্পীর পক্ষেও প্রযোজ্য। নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্যের অভিজ্ঞতাকে মেলাতে হয়। তারই নাম জ্ঞান। বাস্তববাদী শিল্পী যদি আপনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকেসর্বস্ব বলে মনে করেন, তার বাইরে গেলেই যদি তাঁর পদস্খলন ঘটে তবে তাঁর সৃষ্টির গৌরবও সঙ্কুচিতু হয়ে পড়ে।

তাছাড়া শিল্পীচিত্তে বস্তুকে ছাপিয়ে কল্পনার লীলা যখন প্রধান হয়ে ওঠে তাকে রোমান্টিকতা বলতেই হবে। কিন্তু বস্তুর প্রাধান্য মেনে নিয়ে কল্পনা যখন তাকে সম্পূর্ণ করে তোলে, তার অভাব মেটায়, অথবা কল্পনা যখন বস্তুর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে—ছাড়িয়ে যায় না, তখনও কি শিল্পী-চেতনাকে রোমান্টিক বলতে হবে? শিল্পে কল্পনা থাকবেই। আসল সমস্যা তার প্রাধান্য নিয়ে, তার ভঙ্গি ও স্বরূপ নিয়ে। শ্রেষ্ঠ বাস্তববাদী শিল্পীরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সীমায় বদ্ধ নন, বহুর অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানসাধনায় তাঁরা যেমন আত্মস্থ করেন তেমনি কল্পনার সহায়তায় ব্যাপক ও গভীর সত্যকে আয়ত্ত করবেন। কিন্তু তাঁদের কবিদৃষ্টির বিশিষ্টতায় কল্পনার পথ ধরেও বস্তুসত্যে গিয়েই তাঁরা পৌছবেন। তাঁদের সে-রচনা বস্তুরূপে সত্য হবে, আত্মভাবনার আরোপে কবিচেতনার বাহনমাত্র হবে না। এ জাতীয় কামনাকে যদি বাস্তববাদী কল্পনা বলি তাহলে রোমান্টিক কল্পনা থেকে এদের পার্থক্য সূচিত হবে। প্রথম শ্রেণীর কল্পনায় বস্তুসত্যই লক্ষ্য, কল্পনা উপলক্ষ মাত্র। অপর ক্ষেত্রে কল্পনাই হল লক্ষ্য। কল্পনা মাত্রে পক্ষী-জাতীয়। কিন্তু বাস্তববাদী কল্পনা সেই ধরনের পাখি যাদের ডানায় আকাশের সুদূরকে স্পর্শ করবার

জোর নেই, নেই কামনাও। সে উড়ে উড়ে মাটির পৃথিবীর বন্ধন কাটাতে পারে না, চায়ও না। রোমান্টিক কল্পনার পাখির ডানায় নীল আকাশের স্বপ্ন।

মুকুন্দরামে বাস্তববাদী, কল্পনার অভাব। তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কবি। কবি অবশ্য শিক্ষিত লোক ছিলেন। বিচারিয়া অনেক পুরাণ' তিনি কাব্য লিখেছিলেন—এ তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি। কিন্তু পৌরাণিক বিষয়ের সঙ্গে কবিচিত্তের সংসক্তি ঘটেনি।মুকুন্দরাম কল্পনায় দীন। যে যুদ্ধ তিনি দেখেননি তার বাস্তব রূপাঙ্কনে ব্যর্থ হয়েছেন। যে বণিকবৃত্তি তাঁর তথা সমগ্র বাংলাদেশে ষোড়শ শতকীয় অভিজ্ঞতার বাইরের বস্তু তার বিবরণ হয়ে উঠেছে হাস্যকর। ধনপতি-শ্রীপতির বাণিজ্যিক অভিজ্ঞতাই শুধু হাস্যকর নয়, তাদের চরিত্র বা আচরণের কোথাও বণিকসুলভ বিশিষ্টতা প্রকাশ পায়নি। বণিকপ্রবর ধনপতি পায়রা নিয়ে অলস ক্রীড়ায় রত; রাজার শখের পাখির জন্য সোনার খাঁচা তৈরি করতে গৌড়দেশে গমনই তার বিদেশ ভ্রমণের সীমা। স্মরণাতীত কালে তাঁদের পরিবার বিদেশে বাণিজ্যে গিয়েছে, বাণিজ্যতরীগুলি জলের নিচে ডোবানো রয়েছে বহুকাল, পথের পরিচয় তার জানা নেই, এমনকি নৌকোর মাঝিকেও অনভিজ্ঞতার জন্য সদাগরকে ভর্ৎসনা করতে হয়েছে; -

কড়ির ঝাঁক যখন এসে নৌকো আটকে ধরল—

সদাগর বলে শুন কর্ণধার ভাই।।

তুমি যদি মনে কর পুটি মৎস্য খাই।

কর্ণধার বলে সাধু তুমি বড় চাষা।।

কভু নাহি কর তুমি বাণিজ্য ব্যবসা।

নেহাতই প্রথনুগ গল্পের অনুরোধে এরা বণিকরূপে পরিচিত হয়েছে, বণিকের কাজ করেছে; কিন্তু তাতে প্রাণের স্পর্শ লাগেনি। বরং বণিকদের গ্রাম-প্রধানদের মত কুৎসা কলহ বা অলস ধনী ধনপতির কামদুর্বল সংসারধর্ম জীবন্ত, সরস এবং উপভোগ্য। কারণ এরা কবির অভিজ্ঞতার 'সীমার বাইরে নয়। ব্যাধজীবনের সঙ্গে সাধারণ পরিচিতি কবির ছিল, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়েছে; কিন্তু খুঁটিনাটি ব্যাপার কবির

অভিজ্ঞতার বিষয় ছিল না, কারণ অন্ত্যজ ব্যাধশ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাব। বাধ্য হয়ে যখনই তিনি সামান্য কল্পনারও আশ্রয় নিয়েছেন, সেখানেই সাহিত্যিক সাফল্য স্থলিত হয়েছে, রচনায় অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যেতে পারে, বাস্তব ঘটনাকে তিনি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিসাধনার আদর্শে পরিমার্জিত করিয়া লইয়াছেন। দ্বিজ মাধবে কালকেতুর বিবাহ-ব্যাপারে বরের পিতা সোজাসুজি কন্যার পিতার নিকট গিয়া তাহার নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে ও ব্যাধসুলভ সরলতার সহিত পণ নিধারণ করিয়াছে। মুকুন্দরামে কিন্তু এই সমস্ত দরদস্তুর ঘটকের মাধ্যমে সংঘটিত হইয়াছে, উচ্চবর্ণের রীতিনীতি তিনি নির্বিচারে নীচবর্ণে আ-রাপ করিয়াছেন। দ্বিজ মাধবে ধর্মকেতুর মৃত্যু ঘটিয়াছে সচরাচর বন্যপশুশিকারে নিযুক্ত ব্যাধের যেরূপভাবে ঘটিয়া থাকে—সিংহের আক্রমণে; অবশ্য নিদয়া উচ্চবর্ণসুলভ হিন্দু-আদর্শ অনুসরণে স্বামীর চিতায় পুড়িয়া সহমরণে গিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতিপুষ্ট মুকুন্দরাম কিন্তু এরূপ প্রাকৃত মৃত্যুতে সন্তুষ্ট না হইয়া নিজ কাব্যের আভিজাত্য বজায় রাখিতে ধর্মকেতু-নিদয়াকে বৃদ্ধবয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া কাশী পাঠাইয়াছেন। জাতকর্ম বা বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানেও তিনি ব্যাধ-পরিবারে ভদ্রঘরের শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের আড়ম্বর, শাসনের নিখুঁত ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছেন।" কিন্তু কেন? এর একটি কারণ নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ। কিন্তু অপর একটি কারণ ব্যাধসমাজের খুঁটিনাটি রীতিনীতি সম্পর্কে কবির অভিজ্ঞতার অভাব।

ব্যাধের শিকার সম্বন্ধেও কবির স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। কালকেতুর শিকার ব্যাপারটি তাই বাস্তব বর্ণনা না হয়ে তার শক্তির অমানুষী আতিশয্যের অসম্ভব কথায় পরিণত হয়েছে। শিকার-প্রসঙ্গের বেশির ভাগই পশুদের মধ্যে মানবভাব আরোপ করায় স্বতন্ত্র রসের আকর হয়ে উঠেছে। কবি আপনার অভিজ্ঞতার স্বল্পতা এভাবে পূরণ করতে চেয়েছেন। কল্পনার দ্বারা আপন অভিজ্ঞতার বাইরে সম্ভাব্য সত্যকে বিদ্ধ করতে পারেননি। কালকেতু রাজা হল। ব্যাধের রাজা হওয়া শুধু মুকুন্দরামের কেন সকলেরই

অভিজ্ঞতার বাইরে। কবি সদ্যরাজ্যপ্রাপ্ত ব্যাধের রাজকার্যের মধ্যে বড় প্রবেশ করতে চাননি। রাজা কালকেতু মুকুন্দরামের রচনায় কোন স্পষ্ট মূর্তি ধরেনি।

মুকুন্দরাম যে কয়জন রাজার কথা বলেছেন আচার-আচরণে আড়রার রঘুনাথ জমিদারের চেয়ে তারা উচ্চস্তরের ব্যক্তি নন। কবি আপনার পরিচিত জমিদারি কর্মতৎপরতার বাইরে পা বাড়াতে চাননি।

বারবার তাঁর কাব্যে কবির জীবনের সবচেয়ে উত্তেজিত ঘটনার প্রতিরূপ সৃষ্ট হয়েছে। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের স্থানে কখনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কখনো ব্যক্তিগত অত্যাচার দেখা দিয়েছে, এই মাত্র।

চরিত্র-চিত্রণে কবি একান্ত পরিচিত সামাজিক টাইপকেই আশ্রয় করেছেন, তাতেই নৈপুণ্য দেখিয়েছেন; কোন অসাধারণ, অভিনব উপকরণের সন্ধান করেননি। জীবন-ঘটনায়ও পূর্বপরিচিত পরিবারজীবনের চিত্রাঙ্কনেই তিনি অসামান্য রসনিবেদন করেছেন।

মুকুন্দরামের বাস্তবতা অভিজ্ঞতা দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং কল্পনায় দীন। এই অভিজ্ঞতা আবার স্তিমিতগতি, ঘটনাবিরল, সামান্যতা-সর্বস্ব। কিন্তু কবির দৃষ্টিতে গভীরতা ছিল। পর্যবেক্ষণের সেই শক্তি, এবং যে-কোন পরিস্থিতির মধ্য থেকে স্নিগ্ধ কৌতুক বের করার ক্ষমতা তাঁকে অনন্য সাফল্য দিয়েছে। কবির রচনা তাই নিত্যকার পরিচিত মানুষ ও সংসারও কিঞ্চিৎ নূতন এবং অনেকখানি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

২. মুকুন্দরামের অভিজ্ঞতা প্রধানত পরিবারজীবনের নানা ঘটনায় সীমাবদ্ধ। এই পরিবারজীবন চিত্রণেই কবির সাফল্য। বাঙালি পরিবারে ঘটনার বাহুল্য থাকে না। ভাবাবেগের উত্তেজনা অথবা সুতীব্র দুরাকাঙা, বিচিত্র দুঃসাহসিক কমাভিযান কিংবা বণাঢ্য পটভূমির সন্ধান সেখানে মিলবে না। কবি ঐ জাতীয় রসের রসিক নন, আমরা আগেই দেখেছি। কোন, কোন বাস্তববাদী শিল্পী হয়তো জীবনের এইরূপ সব উঁচু সুরের চায়ই মুক্তি পান। বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর (অবশ্য তাঁর শেষদিকের রচনাবলীতে আদর্শবাদের সুর বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিল) কাহার-বাউরিদের জীবনের

প্রগলভ প্রবৃত্তিতাড়না হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় কিংবা সাপুড়েদের উন্মাদনাপূর্ণ জীবন-রোমাঞ্চ 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে অথবা কবিওয়ালার জীবনের বর্ণবহুল অভিজ্ঞতা কবি'তে রূপায়িত করেছেন। মুকুন্দরাম জীবনের এই ধরনের রূপ পরিহারের পক্ষপাতী। বিপরীত প্রান্তে তাঁর বাস্তববাদী মনের স্থিতি। দীনবন্ধুর মত বাস্তববাদী নাট্যকার নিস্তরঙ্গ জীবনের ছবি আঁকায় তেমন আগ্রহী নন। পারিবারিক পরিবেশে সাধারণ নরনারীর চরিত্র প্রাণবন্ত করে তা েলার চেয়ে বক্র, বিকৃত এবং দুর্ধর্ষ মানুষের দিকেই তাঁর আকর্ষণ বেশি। মুকুন্দরামের বাস্তবতা মূলত পরিবারজীবনের নিস্তরঙ্গ প্রাত্যহিকের চিত্রাঙ্কনেই উদ্বুদ্ধ। এই জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নিত্যদৃষ্ট পাত্রপাত্রী তাঁর শিল্পীমনের মানুষ। চণ্ডীমঙ্গলের তিনটি অংশ। দেবখণ্ডে দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগ, পাবর্তী উমার সঙ্গে শিবের বিবাহ প্রভৃতি পুরাণাশ্রিত ঘটনা বিবৃত হয়েছে। উমা-মহেশ্বরের বিবাহ-কাহিনী কালিদাসের মত মহাকবিও উপকরণ হিসেবে অবলম্বন করেছেন। ঐ একই উপকরণ নিয়ে মুকুন্দ কিন্তু বাঙালি-পরিবারের একটি খণ্ডচিত্র নৈপুণ্যের সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের দাম্পত্য জীবন, শ্বশুরালয়ে আশ্রিত মেয়ের লাঞ্ছনা, পারিবারিক কলহ প্রভৃতির একটি রসোজ্জ্বল ছবি পৌরাণিক পটভূমির মধ্যে কবির মৌলিক প্রবণতার পরিচয় বহন করছে। দারিদ্রই এখানে প্রধান সমস্যা। ধনপতির কাহিনীতে দুই সতীনের দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে একটা গোটা পরিবারের দুই পুরুষের ইতিহাস ধরা পড়েছে। ধনপতি ধনাঢ্য ব্যক্তি, তার সমস্যা তাই স্বতন্ত্র। এই দুইটি কাহিনী যুক্তভাবে ধরলে উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দুর পরিবারজীবনের পূর্ণ ছবিই শুধু প্রকাশ পাচ্ছে না, সমকালীন পরিবার-সমস্যার কেন্দ্রটিও যেন স্পর্শ করা যাচ্ছে।

চণ্ডীমঙ্গলের অপর কাহিনীটি অন্ত্যজ ব্যাধসমাজের। সমাজের নিম্নশ্রেণীর বর্বর জীবনউল্লাসের প্রতিকবির কোন বিশেষ আকর্ষণ যে ছিল না, তা আগে নানা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। কবি নিজের ইচ্ছানুসারে এই কাহিনী নির্বাচন করেননি। মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যানুমোদিত কাহিনীতে আখটিক বৃত্তান্তটি অপরিহার্য। মুকুন্দরাম প্রসন্নচিত্তেই ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন। অন্ত্যজ সমাজে কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে উচ্চবর্ণ হিন্দুসমাজের সঙ্গে তার পার্থক্য কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। ব্যাধদের পরিবার-

জীবনের স্বাতন্ত্র্য কবির দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবি অবশ্য কখনো ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ব্যাধজীবনের উপর আরোপ করে ফেলেছেন, আবার কখনো আজবি কল্পনাকে (কালকেতু শক্তির আতিশয্যে যেভাবে পশুহনন করছে তা সম্ভবের সীমা ছাড়িয়েছে, আর পশুপক্ষীদের উপরে মানবাচরণের আরোপ আপাতদৃষ্টিতে আজগুবির পর্যয়ভুক্ত) প্রশ্রয় দিয়েছেন। কবির অনভিজ্ঞতাই এর জন্য যে অনেকখানি দায়ী, কবি মুকুন্দরাম আগে তা বলেছি। অন্ত্যজ এইসব শ্রেণীর সঙ্গে যে-পরিচয় কবির ছিল তা কিছুটা বাইরের হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই ব্যাধ-জীবনের চিত্রাঙ্কনে কোন অভ্যন্তরীণ ছবি কিংবা কেন্দ্রীয় সমস্যার সন্ধান মেলে না

৩. বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে বলেছিলেন যে তিনি যুগপৎ রিয়ালিস্ট এবং স্যাটায়ারিস্ট। তার তাৎপর্য নিশ্চয়ই এই নয় যে রিয়ালিস্ট মাত্রই স্যাটায়ারিস্ট। বাস্তববাদী শিল্পী গহন। গভীর জীবনবোধের অধিকারী হতে পারেন। এইরূপ অনেক সাহিত্যিই মহৎ পদবাচ্য হয়েছেন। কোন কোন বাস্তববাদী অবশ্য জীবনের অরঞ্জিত পূর্ণচিত্রের দ্রষ্টা বলেই তার দুর্বলতা সম্পর্কে মোহমুক্ত। তাদের দৃষ্টিতে বিদ্রুপ ক্ষরিত হয়। মুকুন্দরামকে স্যাটায়ারিস্ট বলা চলে না। জীবন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বিরূপতা না থাকলে বিপরস প্রকাশ পায় না। মুকুন্দরামের চোখে বক্রতা নেই, সমাজসংস্কারের বাসনা নেই, দুঃখের অভিজ্ঞতাও জীবনকে বিবর্ণ ও অর্থহীন করে দেয়নি। মুকুন্দরামের হাস্য প্রসন্ন এবং স্মিত। প্রগর্ভ ভাঁড়ামিতে তাঁর উৎসাহ নেই। মুকুন্দরামের হাস্য স্থূল দৈহিক প্রক্রিয়া নয় বলেই বুদ্ধির উত্তাপ এর মধ্যে লক্ষণীয়, তবে বুদ্ধির অসিক্রীড়ায় কবির বড় আসক্তি নেই।

মুকুন্দরাম জীবনকে সমগ্রত দেখতে চেয়েছেন। জীবনস্রোতে আবেগে উল্লাসে ভাসমান তিনি নন। জীবনলীলায় তরঙ্গিত না হয়ে তার একপ্রান্তে দর্শকের ভূমিকা তিনি নিয়েছিলেন। সম্ভবত বয়স কবিকে এই দৃষ্টির অধিকারী হতে সাহায্য করেছিল। অবশ্য কবির ব্যক্তি-চিত্তের নিরাসক্ত জীবনবোধই এর মুখ্য নিয়ন্তা। বাস্তবতার সঙ্গে এই নিরাসক্তির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তাঁর কৌতুকের ভিত্তিতে এই আসক্তিহীনতা সক্রিয়। অবশ্য মুকুন্দরামের এই মনোভাব সন্ন্যাসী-সুলভ জীবনবিবিক্ত নয়। মুকুন্দরাম জীবনকে

ভালোবেসেও আবেগে ও ভোগে তার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে যাননি যাতে জীবনরসের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। মুকুন্দরাম ভোগী নন, রসিক। ভোগী যে সে জীবনে নিমজ্জিত; রসিক জীবন থেকে ততটুকু দূরের, যতটুকুতে বিষয় ও বিষয়ীর স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। এই দূরত্ব ছাড়া আস্বাদন সম্ভব নয়। মুকুন্দরামের কৌতুকের উৎস এই নৈব্যক্তিক দূরত্বে। জীবনের এই স্মিতমুখ দর্শক হাস্যের আলো বিকীর্ণ করে প্রাত্যহিকের তুচ্ছতাকে উজ্জ্বল করেছেন, নির্জীব ঘটনা-বিবরণকে সরস করে তুলেছেন, গতি দিয়েছেন।

মুকুন্দরামকে এক সময়ে দুঃখবাদী বলে চিহ্নিত করা হত। তিনি সুখের কথায় বড় নন, দুঃখের কথায়ই তাঁর সৃষ্টি, কৃতিত্ব—এমন মত প্রচলিত ছিল। মুকুন্দরামের কাহিনীতে দুঃখের কথা আছে। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগে শিবের শোকবিহ্বলতার ক্ষণস্থায়ী উল্লেখের পরেই যজ্ঞধ্বংসের ভৌতিক ক্রিয়াকলাপের কিঞ্চিৎ বীভৎস কিঞ্চিৎ সরস বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। কবি এখানে পুরাণানুগ, শুধু সরস মন্তব্যে ব্রাহ্মণদের প্রতি কটাক্ষে

ব্রাহ্মণে না মার ব্রাহ্মণে না মার

পৈতা দেখাইয়া কান্দে।

তাঁর মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে। শিবগৌরীর দাম্পত্য জীবনের প্রসঙ্গে কবি তাদের দারিদ্র্য-দুঃখের কথা বারবার বলেছেন। কিন্তু দারিদ্র্যজনিত দুঃখের কথা কোথাও বড় হয়ে ওঠেনি। বি এই দারিদ্র্যের বাস্তবতা অস্বীকার করেননি, একে মায়া বলে উড়িয়ে দেননি, কিন্তু এই দুঃখের বর্ণনায় পাঠকচিত্তে করুণরস উদ্রেক করার কিছুমাত্র চেষ্টা নেই! কবি শিবের দারিদ্র্যের পটভূমিতে তার ভোজনরসিকতা, স্বামী-স্ত্রীর কলহ প্রভৃতি প্রসঙ্গের সরস বর্ণনা দিয়ে পাঠককে দুঃখ ভুলিয়েছেন।

কালকেতু-ফুল্লরার ব্যাধজীবনে অর্থাভাব ছিল, সম্ভবত অন্নকষ্টও কখনো দেখা দিত। কিন্তু কালকেতুর ভোজনের বহুলতা, শিকার-পদ্ধতি থেকে শুরু করে সব আচার-

আচরণের মধ্যেই এমন একটা অভব্য অসঙ্গতি, সরলতা ও বর্বরতার এমন এক ধরনের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, যার কৌতুককরতা অবশ্য উপভোগ্য। ফুল্লরার বারমাস্যার নীরস দুঃখবর্ণনায় যে বেদনারস কিছুমাত্র প্রকাশ পায়নি এ-সত্য দৃষ্টি এড়াবার নয়। আসলে সপত্নীভীতির আশঙ্কা এই দুঃখবর্ণনাকে একটি সরস স্বাদুতা দিয়েছে।

চরিত্রচিত্রণেও মুকুন্দরাম কৌতুকরসকে একটি সাধারণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বলা উচিত, ব্যক্তিগত কিংবা টাইপগত স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও কবির কৌতুকদৃষ্টিপাতে প্রায় সব কটি উল্লেখ্য পাত্রপাত্রীতে সরসতা একটা অতিরিক্ত স্বাদের কারণ হয়েছে। ভাড়ুর ভিলেনি, মুরারির শাঠ্য, কালকেতু বা ফুল্লরার স্বল্পবুদ্ধি অন্ত্যজ আচরণ, শিবের ভোজনলোলুপতা তথা কর্মে অনিচ্ছা—সকলই কবির কৌতুকের অংশীদার হয়েছে। এমন-কি বনের ভালুক পর্যন্ত এই কৌতুক প্রসারিত।

গুজরাটে নবাগত বৈদ্যসম্প্রদায়ের বর্ণনায় তীক্ষ্ণ সমাজদৃষ্টির পরিচয় আছে, সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ব্যঙ্গবোধের স্পর্শও লেগেছে।

কারু দেখি সাধ্য রোগ। ঔষধ করয়ে যোগ

বুকে ঘা মারয়ে সর্বদায়।

অসাধ্য দেখিয়া রোগ পলাইতে করে যোগ,

নানা ছলে মাগয়ে বিদায়।

কপূর পাঁচন করি। তবে জীয়াইতে পারি

কপূরের করহ সন্ধান।

রোগী সবিনয়ে বলে কপূর আনিতে ছলে

সেই পথে বৈদ্যের প্রয়াণ।

পরের চরণে এসেছে ক্লাইম্যাক্স,

বৈদ্যজনের পাশে অগ্রদানীগণ বসে।

বৈদ্যদের চিকিৎসা-বিদ্যার প্রতি কটাক্ষ এখানে বেশ তীব্র। বৈদ্যরা রোগনিরাময়ে ব্যর্থ হলেই শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ অগ্রদানীরা দায়িত্ব নেবেন। তবে সাধারণত মুকুন্দ ব্যঙ্গরসের রসিক নন। কটু এবং তিক্ত রসে আস্থা নেই তাঁর। মুসলমানদের প্রসঙ্গে ভিন্ন আচরণের দৃষ্টিকোণ থেকে কৌতুকই বর্ষিত হয়েছে, আঘাত নয়

আপন টোপর নিয়া বসিল অনেক মিঞা

ভুঞ্জিয় কাপড়ে পোঁছে হাতে।

আপন তরফ নিয়া বসিল অনেক মিঞা

কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।

মাল্লো পড়ায়ে নিকা দান পায় সিকা সিকা

দোয়া করে কলমা পড়িয়া ।।...

করে ধরি খর ছুরি মুরগী জবাই করি

দশগুণ্ডা দান পায় কড়ি।

অবশ্য মোল্লার নিকা পড়ানো এবং মুরগী জবাই করাকে একই সঙ্গে উল্লেখ করার পেছনে কবির কোন কটাক্ষ ছিল কিনা সঠিক বলা যায় না। তবে ধর্মবিদ্বেষজনিত মনোভাব প্রকাশ পায়নি। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে এদের আচার-আচরণ দেখেছেন, আপনার অভ্যস্ত জীবনধারার সঙ্গে এর পার্থক্য দেখে যে মৃদু কৌতুক অনুভব করেছেন তাকেই বর্ণনার ভাষায় ধরে রেখেছেন। স্বশ্রেণীর প্রতিও কবির ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে—

মূখ বিপ্র বৈসে পুরো নগরে যাজন করে,

শিখিয়া পূজার অনুষ্ঠান।

চন্দন তিলক পরে দেবপূজা ঘরে ঘরে।

চাউলের কোচড়া বান্ধে টান ।।

ধনপতির কাহিনীতে দুঃখের ও বেদনার প্রসঙ্গ বার বার এসেছে। কারণ কাহিনীর নিজস্ব ধারাটি কবিকে অনুসরণ করতে হয়েছে। কিন্তু করুণ-রস সৃষ্টি করার দিকে কবি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন বা খুব যত্ন নিয়েছেন এরূপ মনে হয় না। ধনপতির দ্বিতীয় বার বিবাহে লহনা যতটা দুঃখ পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি দেখা দিয়েছে ঈর্ষার জ্বালা। যৌবন-অতিক্রমের বেদনা লহনা-চরিত্রের ভিত্তিতে থাকলেও দুই সতীনের কলহ ও মারামারির হাস্যকরতার পেছনে তা সুপ্ত থেকেছে। খুল্লনায় প্রণয়-রোমান্টিক রূপের যে সম্ভাবনা ছিল কলহপ্রবণতায় তা লুপ্ত হয়েছে। ধনপতি ও শ্রীপতির বাণিজ্য ও তৎসংক্রান্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং খুল্লনার অগ্নিপরীক্ষার কথায় মুকুন্দরামের মৌলিকতা প্রকাশের অবকাশ ঘটেনি। কাহিনীর প্রথানুসরণের চেয়ে বেশি কিছু কবি করতে পারেননি। কিন্তু বণিকদের বংশমর্যাদার বড়াইয়ে যোড়শ শতকের বাণিজ্যগৌরবহীন এই সমাজের অবনতি ও ক্ষুদ্রতার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত কবির।

মুকুন্দরামের কবিতার স্বরূপ উদঘাটন করে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধারণ মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য, 'অতিপল্লবিত, অহেতুক বিস্তারের স্থলে মিতভাষিতা ও তীব্র ভাস্বরতা, নির্বিচার প্রথানুবর্তনের স্থলে বাস্তব স্বীকৃতির প্রখর মৌলিকতা, অর্ধান্ত্রিক পূর্বরোমন্থনের স্থলে নূতন অনুভূতির দীপ্ত ঝলক—এই সমস্তই তাঁহার রচনারীতির বৈশিষ্ট্য। তাঁহার রচনার উপর এক সচেতন, সমগ্রপ্রসারিত মননশক্তির পরিচয় দীপ্যমান। তাঁহার শিল্পবোধ মার্জিত, জীবনবাদসম্ভত রসকিতা তাঁহার পূর্ববর্তীদের গ্রাম্য ভাঁড়ামো হইতে স্বতন্ত্র জাতীয়। তাঁহার কৌতুকরস কেবল কথায় সীমাবদ্ধ নহে, তাঁহার বঙ্কিম কটাক্ষ, মন্তব্য ও সমগ্র মনোভাব ও জীবনদর্শনের বহুমুখী বিস্তার হইতে তির্যক রেখায় ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে।

মুকুন্দরামের রসিকতা কবির সমগ্র জীবনদৃষ্টি অথাৎ বাস্তবতা-বোধ থেকে উদ্ভূত, একথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বিশিষ্ট নৈর্ব্যক্তিকতাই এই কৌতুকে বহু ধারায় প্রতিফলিত। জীবনের অপরাপর উপলব্ধির সঙ্গে এই রসিকতার কোন বিরোধ নেই, সহজ সামঞ্জস্য আছে।

কৌতুকসৃষ্টিতে মুকুন্দরামের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে পুরাতন বাংলার অপর কয়েকজন কবির সঙ্গে তুলনার বিচারে। মধ্যযুগের বাংলাদেশের অন্তত চারজনের নাম করা যায় যাঁরা মূলত কৌতুকপ্রণ, প্রাসঙ্গিকভাবে মাত্র হাস্যরস সৃষ্টি করেননি। বড় চণ্ডীদাস, বিজয় গুপ্ত, মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্র সত্যকার সরস-দৃষ্টির অধিকারী। এই দৃষ্টির আলোতেই জগৎ এবং জীবনের সত্য তাঁদের কাছে ধরা পড়েছে। অথচ মধ্যযুগের প্রথানুগত্যের জন্য এঁরা কেউই সম্পূর্ণত, কৌতুকরসাত্মক কাব্য রচনা করেননি। তবে ধর্ম ও ভক্তিপ্লাবিত মঙ্গলকাব্য কিংবা আদিরস-উচ্ছ্বসিত কৃষ্ণকাহিনী বা বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানে ব্যঙ্গ ও রঙ্গের বর্ণসম্পাত বেশ। গভীরভাবেই লেগেছ এবং কাব্যকেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিতও করেছে।

বড় চণ্ডীদারে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'আদিরসই মুখ্য স্বাদ, রাধার চরিত্র-বিবর্তনে মনস্তাত্তিকর প্রয়োগই এর প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু কৌতুকহাস্যের বিচিত্র পথ পরিক্রমা করেই কবি প্রেমবোধের তথা চরিত্রজিজ্ঞাসার সিদ্ধিতে পৌঁছেছেন। লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষের মূল্য এখানে কম নয়। এ কাব্যের নারদের ভাঁড়ামো স্থূল হাস্যের উপরকরণ জুগিয়েছে। নারদ-চরিত্রের এই জাতীয় ভূমিকা বাংলার লৌকিক সংস্কারের অঙ্গরূপে দীর্ঘকাল আদৃত হয়ে আসছে। অবশ্য বড়র হাস্যরস সৃষ্টির উন্নততর প্রকাশ রাধাকৃষ্ণের রসকলহে। কৃষ্ণচরিত্র কল্পনায়ও বড় হাস্যরসকে অন্যতম মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণের দেহলোলুপ গ্রাম্য কামুকতা ও তজ্জাত অশ্লীলতা হাস্যসিঞ্চনে আবৃত হয়েছে, সমুন্নতও হয়েছে। ঘোড়াচুলা কাহ্নাই' প্রেয়সী নারীকে বশীভূত করতে তার ভার বহন করেছে, মাথায় ছত্র ধরেছে। আবার মেরে ফেলব, বেঁধে রাখব' বলে মাঝে মাঝে বীর ও রৌদ্ররস প্রকাশ করেছে। মারণ-উচাটন-বশীকরণের আশ্রয় নিতেও ঘুড়েনি। অবশেষে ছলে বলে কৌশলে, জোরজবরদস্তিতে রাধাকে বশীভূত করে নীতিবাক্য উচ্চারণ করেছে বেশ গম্ভীরভাবেই-

তোরে বোঁলো চন্দ্রাবলী আহ্মে দেব বনমালী

কেহ্নে বল হেন পাপবাণী।

মা যশোদা মোর মামা আইহন ল

তোহ্মে মোর সোদর মাউলানী।।

বিজয় গুপ্তে শিবের মধ্যেও ব্যক্তিচরিত্রের কতকগুলি কৌতুককর বৈশিষ্ট্য হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। বালা সাহিত্যে শিবের স্থানটি একটু বিশিষ্ট। শিব নারদ নয়া যথেষ্ট কৌতুক রসের উৎস হচ্ছে তাকে ভাঁড় হিসেবে আদৌ কল্পনা করা হয়নি। কবিহৃদয়ের সহানুভূতির স্পর্শে চরিত্র-পরিকল্পনা অন্তত বিজয় গুপ্তের কাব্যে হিউমারের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। শিব দরিদ্র গৃহস্থ। পল্লবশ হলেও বেশ খানিকটা শিথিলতা তার মধ্যে আছে। বালকের সারল্য এবং চিন্তামুক্ত সদাপ্রফুল্লতা তার ব্যক্তিত্বের চারপাশে একটা লঘু পরিমণ্ডল রচনা করেছে। খেয়া পেরিয়ে ৰে কড়ি দেয় না। বলদকে বিনা পয়সায় পার করার মতলবে বলে, আমার বলদের গায়ে তুলা হেন ভার। মেয়ের বিয়ে নিখরচায় সম্পন্ন করার যে অতিবিচিত্র পরিকল্পনা সে কর,

হাসি কহে শূলপাণি এয়ো ভাঁড়াইতে আমি জানি

মধ্যে দাঁড়াইব নেংটা হৈয়া।

তা কিঞ্চিৎ অশ্লীল হলেও হাস্যগর্ভ।

চাঁদসদাগরের বাণিজ্য-বর্ণনায় যে হাস্যরসের কিছু উপকরণ আছে মনসামঙ্গলের অনেক কবি তা লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু বিজয় গুপ্ত সচেতন ব্যঙ্গদৃষ্টির সাহায্যে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। অবশ্য রঙ্গের আধিক্যে ব্যঙ্গ চাপা পড়েছে, আজগুবির প্রাধান্য উচ্চহাস্যের জন্ম দিয়েছে। বিজয় গুপ্তের যুগে বাঙালির বহির্বাণিজ্য স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছিল। চাঁদসদাগরের পসরায় তাই মূলো, পান প্রভৃতিরই প্রাচুর্য। অবশ্য তার প্রধান পণ্য বাকচাতুর্য। মসলিনের বদলে তখন চটের থানেরই জয়গান। আর অভিনব ফ্যাসান-লোলুপতা সেকালেও বোধ হয় ছিল একালের মতই প্রবল। এরই মিশ্রণে চটের বসন প্রসঙ্গে যে হাস্যরস তাঁর কাব্যে উদ্বেল হয়ে উঠেছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তা প্রায় একক।

মন্তব্য

ভারতচন্দ্রের কবিতায় ব্যঙ্গের অতিতীক্ষ্ণতা লক্ষণীয়। অষ্টাদশ শতকের সমাজ-অবক্ষয়, আদর্শ-বিচ্যুতি ও জীবন-অস্থিরতার পরিবেশ এবং ভারতচন্দ্রে ব্যক্তিজীবন এবং কবিসত্তার বিশিষ্টতার সমন্বয়ে এই ব্যঙ্গদৃষ্টি গঠিত। বুদ্ধির মার্জিত বিচ্ছুরণ এবং ভাষার উজ্জ্বল বক্রতা তাঁর ব্যঙ্গের স্বাদে বিচিত্রতা এনেছে। ভারতচন্দ্র জগৎ ও জীবনের স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ও আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। মধ্যযুগের ধর্মচেতনা ও ভক্তিপ্লাবন তাঁকে আপ্লুত করতে পারেনি। মঙ্গলকাব্যের আদ্যাশক্তি দেবতাকে তিনি নিযুক্ত করেছেন অবৈধ দেহমিলনের অন্যায়কে আবৃত করতে। শিব তাঁর কাছে দেখা দিয়েছে বেদের বেশ ধরে। বেদব্যাসকে নিয়ে তিনি সরব বিদ্রূপ এবং সরস কৌতুক করেছেন দ্বিধাহীন চিত্তে। নারীরূপ বর্ণনায় প্রাচীন কাব্যের পদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করেই তিনি তাঁর নায়িকার কটিদেশকে চুলের সঙ্গে এবং বক্ষদেশকে পর্বতশৃঙ্গের সঙ্গে উপমিত করেছেন। কাব্যের আদ্যন্ত সমাজব্যঙ্গের কটাক্ষপাত ঘটেছে। দক্ষসভায় যজ্ঞ বিনষ্ট হবার প্রচণ্ড দুর্ঘটনা ও জীবন-রক্ষার আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত ব্রাহ্মণদের ‘কেহ কেহ ভজ্যবস্তু সারিছে’ দেখে তিনি উচ্চহাস্য করেছেন।

এই তিন প্রধানের সঙ্গে মুকুন্দরামের পার্থক্য যেমন স্পষ্ট তেমনি অপরাপর মধ্যযুগীয় কবিদের হাস্যরসসৃষ্টির বিভিন্ন জনপ্রিয় পদ্ধতির তুলনায় তাঁর স্বাতন্ত্র্যও লক্ষ্য করবার মত। তা হল-

১. মুকুন্দরামের রচনায় চিৎ ব্যঙ্গ প্রকাশ পেলেও মূলত ব্যঙ্গদৃষ্টির অধিকারী তিনি। নন।।

২. মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রকাশিত হাস্যরস সৃষ্টির প্রচলিত এবং অতিব্যবহৃত পদ্ধতিগুলি একান্ত স্থূল বিবেচনায় তিনি পরিত্যাগ করেছেন। নারীগণে পতিনিন্দা বা বণিকপ্রধানের বিপর্যয়ে বাঙাল মাঝিদের ক্রন্দন এরূপ দুটি জনপ্রিয় বিষয়। নারীগণের পতিনিন্দা প্রসঙ্গে অশ্লীলতা, দৈহিক বিকৃতি, নির্লজ্জ কামুকতা এবং বাঙাল মাঝিদের উচ্চারণ-বৈক্রব্য কবিরা উপকরণ রূপে ব্যবহার করেছেন। মুকুন্দরামে এদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে মাত্র। কবির মার্জিতরুচি এরূপ বিষয়ের চচায় আনন্দ পায়নি।

৩. আজগুবি ঘটনার সমাবেশে রঙ্গরস তাঁর রচনায় বড় উদ্বল হয়ে ওঠেনি। শুধু পশুপক্ষীদের মানবাচরণে আজগুবি কল্পনার স্পর্শ আছে।

৪. কবি ভাষার মারপ্যাঁচে বুদ্ধিদৃপ্ত কৌতুকের জন্ম দেননি। অবশ্য কচিৎ কোথাও শব্দপ্র-য়াগের লীলাবিলাসিতা দেখা গিয়েছে। কিন্তু তাও অনুচ্চ এবং মৃদুবর্ণ।

৫. ঘটনাসন্ধি বা সিচুয়েশনসৃষ্টির কৌশলে হাস্যরস সৃষ্টি করেননি মুকুন্দরাম। ঘটনাবিরল এবং পরিবারজীবনের প্রাত্যহিক সামান্য কথায় পূর্ণ চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতে অনুরূপ ঘটনাবিন্যাসের সুযোগও ছিল না।

৬. ঘটনাগত তুচ্ছতা মুকুন্দরামের কৌতুকদৃষ্টির স্পর্শে সরস হয়ে উঠেছে। বিশেষ । করে চরিত্রসৃষ্টির সঙ্গে কৌতককে মিশিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন কবি। সামান্য দৈনন্দিন ঘটনাও নানা পাত্রপাত্রীর আচরণরূপেই প্রধানত হাস্যের বাহন হয়েছে। ঘটনার মধ্যে এমন কিছু প্রগম্ভ কলরোল নেই, অসঙ্গত উত্থানপতন বা আজগুবি উপকরণ নেই যাতে হাস্যরস দানা বাঁধতে পারে। বাগবিন্যাসের মধ্যেও এমন শাণিত বক্রতা নেই যা উইটের জন্ম দিতে পারে। বহুব্যবহৃত স্কুল বিকৃত উপাদানও প্রায় বর্জিত হয়েছে। চরিত্রভাবনায় বিকৃতি, মুদ্রাদোষ বা অসংলগ্নতা হাস্যের কারণ হয়ে থাকে। মুকুন্দরাম এক্ষেত্রেও বহুপদপাতে বিবর্ণ পথ ধরে চলেননি। তাঁর বেশির ভাগ পাত্রপাত্রীই সাধারণ স্তরের মানুষ অথচ এদের অধিকাংশকে আশ্রয় করেই কবির কৌতুক প্রকাশ পেয়েছে। এখানেই মুকুন্দরামের বৈশিষ্ট্য।

৮.৬ নির্বাচিত প্রশ্ন

- চন্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি মুকুন্দের 'আত্মবিবরনী' অংশে সমকালীন সমাজ জীবনের পরিচয় দাও ।
- চন্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি মুকুন্দের কাহিনী নির্বাচন ও শিল্পীমনের পরিচয় দাও ।
- চন্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি মুকুন্দের বাস্তবতার বিশিষ্টতা নির্বাচন কর ।

৮.৭ সহায়ক গ্রন্থ

চন্ডীমঙ্গল পরিক্রমা - সুখময় মুখোপাধ্যায়

মন্তব্য

কবি মুকুন্দ রাম - ক্ষেত্রগুপ্ত।

চন্ডীমঙ্গল -এস, ব্যানার্জী

বাংলা মঙ্গল কাব্যর ইতিহাস - আশুতোষ ভট্টাচার্য

একক ৯- চন্ডীমঙ্গলের কাহিনীবৃতান্ত

বিন্যাস ক্রম

৯.১ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'আখেটিক খণ্ডে'র কাহিনীসার

৯.২ কাহিনীবৃত্ত : ধনপতির আখ্যান(বণিকখন্ড)

৯.৩ কাহিনী-আভাস : শিব-চণ্ডী বৃত্তান্ত

৯.৪ নির্বাচিত প্রশ্ন

৯.৫ সহায়ক গ্রন্থ

৯.১ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'আখেটিক খণ্ডে'র কাহিনীসার

মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃত পরিমণ্ডলে সবথেকে বেশী আলোচিত কবি হলেন মুকুন্দরাম চক্রবতী। তিনিই কবিকঙ্কণ নামে পরিচিত। গল্পাশের চিরপরিচিত গণ্ডীর বাইরে গিয়ে এই কাব্যে তিনিই একমাত্র বাস্তব দৃষ্টি সমন্বিত জীবনবাধে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন "নৌতুন মঙ্গল' বা 'নতুন মঙ্গল'। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় 'অভয়া মঙ্গল'। মঙ্গলকাব্য মূলতঃ দেব-দেবীর মাহাত্ম্যসূচক আখ্যান কাব্য। দেব কিংবা দেবীর নিজস্ব আবাসস্থলের কাহিনী নিয়ে রচিত হয় 'দেবখণ্ড' আর তাঁদের মর্ত আগমনকে কেন্দ্র করে মানুষ-মানষীর গল্প হল নরখণ্ড। মূল গ্রন্থটি দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি 'আখেটি খণ্ড' কালকেতু ফুল্লরার কাহিনী, অন্যটি বণিকখণ্ড ধনপতি লছনা-খুল্লনা ও শ্রীমন্ত সওদাগরের কাহিনী। এই দুই খণ্ডের ব্যক্তিদের সুখে দুঃখে দেবী চণ্ডীর রোষ এবং কৃপা বর্ণনা করেছেন মুকুন্দরাম। চণ্ডীদেবী নিজের পজা প্রচারের জন্য আখেটিক খণ্ডে' কেন কালকেতুকে নির্বাচিত করলেন তা জানতে হলে দেখণ্ডের কাহিনীবস্ত, এবং কালকেতুর জীবনকথা জানার

প্রয়োজন। আর এই দুইয়ের সমন্বয়ে দেব ও নরের যুগ্ম কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ‘আখেটিক খণ্ডে।

প্রথম পর্ব হরগৌরী সংবাদ :

গ্রন্থের প্রথমেই বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রথানুযায়ী স্তুতি ও বন্দনার পর গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বলতে গিয়ে মুকুন্দরাম একটি বিবরণী দিয়েছেন। মনিসিংহের সুবেদারির সময়ে ডিহিদার মামুদ-শরীফের আচার আচরণ ও প্রজা নিপীড়ণে আশঙ্কিত কবি বাস্তভিটে ত্যাগ করে, আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে ব্রাক্ষ্মণভূমি আরড়ায় উপস্থিত হন ও বাঁকুড়া রায়ের খাস তালুকে আশ্রয় পান। পথের দুঃখ-ক্লেশে মা চণ্ডীর স্বপ্নাবির্ভাব ও কবিকে চডীমঙ্গল লেখার আদেশ দানের কথা বলে কবি কাহিনী শুরু করেছেন।

বাংলা লোক-কথার সব থেকে আকর্ষণীয় চরিত্র শিব এবং তার ঘরণী গৌরীকে নিয়ে চণ্ডীমঙ্গলের দেবখন্ডের কাহিনী পরিবৃত। গল্পের মেজাজে পুরোপুরি মানবমহিমা দৈবী উচ্চতা ও আভিজাত থেকে দেব দেবীর মানবায়ণ ঘটিয়েছে। মানুষের অহংকার, ক্রোধ তুষ্টি, আহাদ সবই দেবতাদের ওপর আরোপিত।

শিবের ‘শ্বশুর দক্ষ কোন এক সভায় শিবের আচরণে নিজেকে অনাদৃত, অসম্মানিত মনে করেন। অহমিকার প্রাবল্যে তিনি নিজেই এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেন, আর নিমন্ত্রণ করতে ভোলেন স্বয়ং জামাতা শিবকে। এ অপমান ইচ্ছাকৃত ; কিন্তু শিবের গহিনী গৌরী শিবের নিষেধ সত্বেও পিত্রালয়ে আসেন। যজ্ঞকুঞ্জে পতি নিন্দা সহ্য করতে না পেরে গৌরীর আত্মদান ; আবার জন্মলা ‘উমা’ রপে হিমালয়ের আত্মজা হয়ে।

এই উমাই প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে মনে মনে শিবকে পতি রপে চাইলেন। নারদের দেওয়া সংবাদে, হিমালয়ে, তপস্যার জন্য উপস্থিত শিবের কাছে গেলেন স্বয়ং হিমালয়। শিবের আগমনে তিনি ধন্য ; তাঁর কন্যা যেন নিত্য দিন “ফল-পুষ্প জল” দিতে পারেন এই অভিপ্রায়। শিবও রাজী হয়ে গেলেন। কোন ভক্তকেই তিনি ফেরান না। তপস্যারত মহাদেবের যোগী মতি দেখে ভয় পেয়ে গেলেন দেবতারা। তারা জানেন স্বর্গে যে

অসুরের অত্যাচার চলছে, এর নিবারণ হতে পারে একমাত্র শিবের পুত্রের দ্বারা। অথচ যোগী শিব তপস্যারত বিবাহ-বিমুখ। দেবতারা একত্রিত হয়ে নানারকম পরামর্শ করে, ঠিক করলেন শিবের তপভঙ্গ করতে হবে। মোহিনী নারীর বেশে স্বয়ং দেবী, আর সঙ্গে পঞ্চশর হাতে মদন পেছিলেন তপস্থলে। ধ্যান ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমের বাণে বিদ্ধ করতে হবে, মহাদেবের তপঃক্লিষ্ট হৃদয়।

দুজনেই প্রস্তুত। ধ্যান ভাঙ্গল শিবের ; ঘটে গেল মদনের বাণ । শিবের তৃতীয় নেত্র থেকে ছুটে এল অগ্নি দটি ; ভস্ম হলেন মদন। শিব আবার অন্যত্র ধ্যানে নিমগ্ন। এবার পাবতীর কৃচ্ছসাধন শর হল—সাধনায় কি না হয়। তপস্যার একাগ্রতা মহাদেবকে স্পর্শ করল। তিনি পার্বতীকে স্ত্রী রপে গ্রহণ করলেন। এ কাহিনী বাংলা সাহিত্যের সর্বত্র নানারুপে এসেছে পরবর্তীকালে।

শিব বিবাহের পর থেকে গেলেন হিমালয়েরই আশ্রয়ে। পার্থিব সমাজে শ্বশুরের আশ্রয়ে থাকা অসম্মানের, নিন্দনীয়। শিবের হুশ নেই। ইতিমধ্যে দুটি সন্তান কার্তিক ও গণেশের জননী হয়েছেন পার্বতী বা উমা। সংসার বড় হচ্ছে, চেতনা নেই শিবের। তিনি তার সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছেন পরমানন্দে। শাশুড়ী মেনকার কাছে এ স্বেচ্ছাচার মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তিনি তিরস্কার করলেন কন্যাকে--‘ধরজামাই রাখি। পুষিব কতকাল’, গৌরীও মুখরা নারীর মত যুক্তি শোনালেন, জানালেন জামাতাকে যে ভূমি যৌতুক দেওয়া হয়েছিল; সেখানে উৎপাদিত ফসল সবার ভোগেই ব্যয় হচ্ছে। তার ঘরকন্নার কাজের জন্য যদি সত্যিই কষ্ট হয় তবে-“আজ হতে তোমার দুয়ারে পড়লো কাটা।” রাগ করে স্বামী পুত্র সহ ঘর ছাড়লেন উমা। এবারে বাসভূমি কৈলাস। কিন্তু ঘরে নিত্য অন্নাভাব। বাধ্য হয়ে ভিখারীবেশে দুয়ারে দুয়ারে ফিরতে লাগলেন মহাদেব। অল্পে তুষ্ট স্বভাবযোগী মহাদেবের ভিক্ষা-সঞ্চয় সংসার চালানোর জন্য যথেষ্ট নয়। দাম্পত্য কলহ নিত্যদিন। গৌরী বললেন ত্রিশল বন্ধক রেখে চাল জোগাড় করার কথা। কারণ মহাদেবের নিজের বলতে এই ত্রিশলই সম্বল। ক্ষিপ্ত মহাদেব গৃহত্যাগে উদ্যোগী হলেন। মহাদেবকে বুঝিয়ে উমাই ঘর ছাড়তে চাইলেন। সখী পদ্মা অত্যন্ত মূল্যবান পরামর্শ দিলেন গৌরীকে। স্বামীগহ ত্যাগ করলে বিবাহিতা রমণীর অন্য কোন

আশ্রয় নেই ; তাই ভগবতী মতলোকে পূজা প্রচারের জন্য চেষ্টা করুন। পূজা উপাচারে আর অভাব থাকবে না। ভগবতী-উমা এই পরামর্শ মেনে নিয়ে, মহাদেবকে অনুরোধ করলেন তার পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে ইদ্রপুত নীলাঘর ও তার স্ত্রী ছায়াকে শাপগ্রস্ত করে মর্ত্যে পাঠাতে। অবশেষে মহাদেব অত্যন্ত কূট-কৌশলে নীলাম্বর ও ছায়াকে স্বর্গষ্ট করলেন। মর্তলোকে তাদের জন্ম হল ব্যাধসন্তান কালকেতু এবং তার স্ত্রী ফুল্লরা রপে।

এবারে দ্বিতীয় পর্ব

নরখণ্ড-কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনী। দেবী চণ্ডী পূজা-প্রচারের উদ্দেশ্যে মর্ত্যে এসে প্রথম পূজা পেলেন কলিঙ্গরাজের। তুষ্টা দেবী ফেরার পথে শিকারীদের হাত থেকে বনের পশুদের রক্ষা করার দায়িত্ব নিলেনপশুদের পূজা গ্রহণ করে, সিংহকে করে দিলেন পশরাজ। শিকারী বা ব্যাধের উদ্যত মতবাণ থেকে এদের বাঁচানোর অভয়বাণী দিয়ে তার প্রস্থান। দেবীর আর এক নাম হল ‘অভয়া।

এদিকে মতে ধর্মকেতু ব্যাধের পত্র কালকেতু রপে নীলাম্বর অমিত-বিক্রম হয়ে উঠল। যথাকালে সঞ্জয়কেতু ব্যাধের কন্যা ফুল্লরার সঙ্গে তার বিবাহ নিষ্পন্ন হল। ধর্মকেতু পত্নী নিদয়াকে নিয়ে কাশীবাসী হলেন। সংসারে স্বচ্ছলতার জন্য কালকেতুর অব্যর্থ শিকারে মারা পড়তে লাগল বনের পশুপাখী। কালকেতু শিকার করে ; আর সেই মাংস বেচে ফুল্লরা। এই যৌথ পরিশ্রমে কালকেতু ফুল্লরার দাম্পত্য জীবন সুখের হয়ে উঠল। পশুরা দেবী অভয়ার কাছে কালকেতুর নামে নালিশ জানাল। কালকেতুকে নিরস্ত্র করতে না পারলে তাদের পক্ষে জীবন ধারণ করাই সভব নয়। ছোটবড় সকল প্রাণীরই কালকেতুর নামে অভিযোগ। হরিণের জবানীতে এক আশ্চর্য ছবি ফুটে উঠেছে-“কেন হেন জন্ম বিধি কৈল পাশ বংশে। জগৎ হৈ বৈরী আপনার মাংসে। পশদের এই ক্রন্দনে, দেবীকে নেমে আসতে হল, তার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে। দেবী পশুদের নিঃশঙ্ক করলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্বর্ণগোধিকার রপ ধারণ করলেন—“সেইখানে সব গোধিকার হৈলা।"

উদ্যমী কালকেতু প্রতিদিনের মত শিকার করতে বেরিয়েছে। জঙ্গলে প্রবেশের মুখেই নিরীহ সুবর্ণগোধিকা'কে দেখতে পেয়ে ওটিকে বেধে রাখল কালকেতু। তাদের বিশ্বাস স্বর্ণগোধিকা অযাত্রা। সারাদিন বথাই গেল কালকেতুর। বনের পশুরা যেন মায়াবলে কোথাও লুকিয়েছে। কোন শিকার নেই। কান্ত, ব্যর্থ কালকেতু ফেরার পথে সবর্ণগোধিকাকে ধনুকের ছিলায় বেধে বাড়ী নিয়ে এলো।শিকার না জোটায় বাসি মাংস বিক্রীর উদ্দেশ্যে হাটে গিয়ে, কালকেতু ফুল্লরাকে খুদ সংগ্রহের জন্য পাঠিয়ে দিল। সখীগৃহে খুদ সের করিয়া উধার বাড়ী ফিরল ফুল্লরা।

প্রবেশের মুখেই চমক। তাদের কড়ে ঘর আলো করে বসে আছে এক 'বামা। চন্দ্রমুখী'। সপত্নীর আশঙ্কায় ভয়ার্ত ফুল্লরা রমণীকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই সেই রমণী ফুল্লরার কাছে আশ্রয় চাইল 'এই স্থানে কয় দিন করিব বসতি। আরও জানাল ইশাবত দেশের এই ব্রাহ্মণী নিজের ইচ্ছেয় এখানে আসেনি-"আনিল তোমার স্বামী বাধি নিজগণে।" যন্ত্রণায় দগ্ধ ফল্লুরা স্বামীর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য গোলা হাটে গেল কালক্ষেপ না করে। কালকেতু ফল্লরাকে ভালবাসে এ কথা সত্য। সে ফুল্লরার কান্নারঙা চোখ দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করল

"শাশুড়ী-ননদী নাহি নাহি তোর সতী

কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু করিস রাতা।"

এ প্রশ্নের অন্তনিহিত প্রেম অনুভব করার ক্ষমতা ফুল্লরার নেই। সে তখন ঈর্ষার আগুনে জলছে

"পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে

কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে।"

কিছুই বুঝতে না পেরে রেগে উঠল কালকেতু। তীব্র বচসার মধ্যে দুজনে বাড়ী ফিরে এল। তখনও রমণী আভায় "ভাঙ্গা কড়া ঘরখানি করে ঝলমল।" কালকেত এই নারীকে তাদের গহ ত্যাগ করতে বললে রমণী উত্তর দিলো তা আর হয় না, সূর্য সাক্ষী

করে কালকেতু তাকে শরে বেধেছেন! “ভানু সাক্ষী করি বীর জুলেক শর” নাকাল কালকেতু যখন অজ্ঞতায় অধৈর্য হয়ে পড়েছে তখন দেবী। আত্ম পরিচয় দিলেন

“আইন, পার্বতী আমি তোরে দিতে বর

বর মাগ কালকেতু ত্যজ ধনঃশর।”

দেবীর কথায় কালকেতু তাকে অনুরোধ করলেন চণ্ডীমতি ধারণ করতে, যে বেশে আশ্বিন মাসে তিনি সর্বজন আরাধ্য হন।-

“আশ্বিনে যেমন বেশে পুজা নিল সর্বদেশে

দেখাইয়া পর মোর সাধ।”

মহিষ মদিনী চণ্ডী অষ্টমতি ধারণ করলেন । দেবীর এই মতি দেখে মছিত হয়ে পড়ল কালকেতু ফুল্লরা। দেবী ওদের উতি করলেন—-“বিনাশ করিব দুঃখ, তোরে করি দয়া।” অবশেষে সাত ঘড়া ধন দান। দেবী কিন্তু বিনিময়ে চান তার পূজা প্রচার।

পুজিবে মঙ্গলবারে পাতাইতে জাত

গুজরাট গল্পের তুমি হবে নাথ।

স্থাপিয়া আমার বারি করিও পুজন

নিযুক্ত করিও তাহে উত্তম ব্রাহ্মণ ॥”

দেবী অহিত হলেন ; কালকেতুর জনা রেখে গেলেন এক বিপুল ঐশ্বর্য। দেবীর দেওয়া মাণিক্যের আংটি ভাঙ্গাতে গেলেন কালকেতু স্বর্ণকার মুরারীশীলের গৃহে। অনভিজ্ঞ কালকেতুকে ছলনা করা ধুত মরারীর কাছে কোন কঠিন কাজ ছি না। সে কালকেতুকে ঠকাতে চেয়ে বলে বসল--

“সোনা রুপা নহে বাপা এ বেঙা পিতল

ঘষিয়া মাজিয়া বাপ করেছ উজ্বল।”

পরে, দৈবাদেশ পেয়ে মরারীশীল মাণিক্যের অঙ্গুরীর যোগ্য মূল্য দিল। দেবীর দেওয়া ধনে বন কেটে নতুন গুজরাট নগরের পত্তন করে কালকেতু তার রাজা হয়ে বসল। কিন্তু নিষাদ রাজের রাজ্যে প্রজা নেই । দেবীর উদ্যোগে ও অন্যান্য দেবতাদের সহায়তায় কলিঙ্গ রাজ্যে ঝড়-বৃষ্টি বন্যায় বহ, মানুষ আশ্রয়চ্যুত হন। কালকেতুর দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে তুষ্ট হয়ে এই সব মানুষ গুজরাটে বসতি স্থাপন করল। জমে উঠল গুজরাট। অর্থ সম্পদে, জন সম্পদে। ব্রাহ্মণ-শুদ্র-ধনী-দরিদ্র নানা লোকের সম্যগমে গমগম করতে লাগল কালকেতুর নতুন নগরী গুজরাট। গুজরাটের পশ্চিমে অবস্থিত হাসান হাটিতে বসতি স্থাপন করল মুসলমানেরাও। এত জনগণের মধ্যে একজন স্বার্থবেষী শঠও এল ভাগ্য পরিবর্তনের আশায়। তাও নাম ভাঁড়দত্ত। মিষ্টি কথার জাদুতে সে কালকেতুকে বশীভূত করে ফেলল। প্রজাদের মুখ্য নেতা বুলান মণ্ডলের নামে লাগানি-ভাঙানি শর করল। রাজার কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়ে, হাটে বাজারে সে নিরীহ প্রজাদের অত্যাচার করতে শুরু করল নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য। কালকেতু যখন এসব ব্যাপার জানতে পারল, তখনই সে অপমান করে তাড়িয়ে দিল ভুড়িদত্তকে। ভাড়ুদত্তের ভেতরকার খল শক্তি এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তৈরী। সে কলিঙ্গে গিয়ে কলিঙ্গরাজকে কথায় মুগ্ধ করে তার বিশ্বাস ভাজন অবশেষে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি। কলিঙ্গরাজকে কালকেতুর নামে মিথে অভিযোগ করে, একদিন সে কালকেতুর বিশ্বে যাত্রায় আয়োজন করল।

যুদ্ধে কলিঙ্গরাজের সৈন্যরা পরাজিত হল। কালকেতু যখন বিজয় উৎসব করবে তখনই ভাড়ুর অনুপ্রেরণায় ফিরে এল আবার কলিঙ্গ সৈন্য। কালকেতু, বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে ধান্যগহ মতান্তরে ধনগহে আশ্রয় নিলো। ভাঁড়ু, ফুল্লরার শুভার্থী সেজে, কায়দা করে জেনে নিল কালকেতুর গোপন বাসস্থান। বন্দী হল কালকেতু। কলিঙ্গরাজ তার প্রাণদণ্ড দিলেন। মশানে শূলে চড়াবার আগে কালকেতু, চণ্ডীর স্তব শুরু, করতেই, দেবী চন্ডী আবির্ভূত হলেন। চন্ডীর আদেশে কলিঙ্গরাজ মুক্তি দিলেন কালকেতুকে। কালকেতু, ফিরে এসে, পুষ্পকেতুকে রাজ্যভার দিয়ে, ভাড়ুদত্তের মস্তক মুণ্ডন করে তাকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। ফুল্লরাসহ যাত্রা করলেন স্বর্গে। দেবীর অপার মহিমা উপলদ্ধি করে

জনগণ দেবী-পুজা, দেবীর মাহাত্ম প্রচারে উদ্যোগী হয়ে উঠল। চণ্ডী ঘরে ঘরে পূজিতা হতে লাগলেন।

৯.২ কাহিনীবৃত্ত: ধনপতির আখ্যান(বণিকখন্ড)

কাহিনীগঠনের নানা পদ্ধতি গল্পসাহিত্যে প্রচলিত। তার মধ্যে প্রাচীন কাল থেকেই দুটি পদ্ধতি সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত। একটি কেন্দ্রে যেখানে কাহিনীটি সম্বন্ধ গ্রন্থনে নিবিড় ঐক্য প্রত্যাশিত। দ্বিতীয় রীতিতে একটি ব্যক্তির কীর্তি বা চরিত্র-বিকাশের সূত্রে নানা কাহিনীতে গল্প শাখায়িত। ব্যক্তিত্বের ঐক্যে সেখানে কাহিনীর ঐক্য। পবর্তী কালে কথাসাহিত্যে আরও নানাবিধ রূপরীতি দেখা দিয়েছে। গল্প-কথনের নূতন নূতন ভঙ্গি অনুসন্ধানে লেখকদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের বিচারে একান্ত নবীন পন্থাগুলির প্রসঙ্গ অবান্তর। কাজেই আদিম দুটি রীতির পটভূমিতে ফিরে আসা যাক।

দেখাযাক, চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীগঠনকে দ্বিতীয় রীতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা। যদি চণ্ডীদেবীরমহিমাজ্ঞাপনকে কাব্যের কাণ্ডরূপে ধরে তিনটি কাহিনীকে তিনটি শাখারূপে গ্রহণ করি, বহুশাখা বিস্তারেও যেখানে বৃক্ষত্বের ঐক্য-সেজাতীয় ঐক্যের সন্ধান করি, তাহলে কোন সার্থক ফল মিলবে কি? আগেই দেখেছি সে ধরনের কোনরূপ সম্বন্ধ এই তিনটি কাহিনীর মধ্যে নেই। চণ্ডীর কোন সুসঙ্গত চরিত্র, চারিত্রিক ক্রমবিকাশ কাহিনীগুলির মধ্য দিয়ে প্রকশ পায়নি; মঙ্গলকাব্যের ভক্তি-প্রচারবাসনা ছাড়া অন্য কোন সূত্র নেই।

কিন্তু কালকেতু কাহিনীকে কালকেতুর ব্যক্তিত্বের শাখায়িত বিস্তার বলে গ্রহণ করার কোন যুক্তি আছে কি? কালকেতুর মধ্যে কাহিনীর বিভিন্ন অংশে আত্মবিস্তারমূলক বহুলতা নেই। এ কাহিনীর এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ আছে, যেখানে কালকেতুর উপস্থিতি গৌণ প্রাসঙ্গিক মাত্র—সক্রিয় নয়। ফুল্লরা-চণ্ডী-সংবাদ, ভাঁড় দত্তের চরিত্র-আচরণ, কলিঙ্গে ঝড়বন্যা এবং নগরের নানা শ্রেণীর নাগরিকের পরিচয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ঠিক একইভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ধনপতির আখ্যানেও ধনপতির সক্রিয় ব্যক্তিত্ব বহুস্থানেই মৌন । লহনা-খুল্লনা-সংবাদে ধনপতি পরোক্ষ কারণমাত্র,

ঘটনাংশে ভূমিকাহীন। আবার কাহিনীর শেষভাগে শ্রীপতির আবির্ভাব থেকে কাহিনীর মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রীপতি, ধনপতি তখন থেকে একেবারেই গৌণ।

কাহিনীগুলিকে গল্পকথনের প্রথম পদ্ধতির আদর্শে বিচার করাই বিধেয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে যে মনসামঙ্গলে কেন্দ্রানুগ বৃত্তাকার গল্পগঠনের রীতি অনুসৃত। চাঁদ এবং মনসার বিপরীতমুখী আদর্শ এবং ভিন্নধর্মী ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষই এই বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু। চাঁদের মনসাপূজায় অস্বীকৃতি থেকে এর উদ্ভব। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে চাঁদের মনসাপূজায় এর সমাপ্তি। নানা ঘটনাও দানা বেঁধে এখানে তাই একটিই ঘটনা। সদাগর মনসাকে পূজা করতে রাজি নয়, মনসা তার মূল্যবান সম্পদ 'গুয়াবাড়ি' ধ্বংস করেছে। চাঁদের বন্ধু ধন্বন্তরি গুয়াবাড়ি বাঁচিয়ে তুলেছে মন্ত্রবলে। মনসা তাই ধন্বন্তরিকে কৌশলে হত্যা করেছে। কিন্তু চাঁদ স্বয়ং মহাজ্ঞানের অধিকারী। মনসা নটীবেশে চাঁদের প্রবৃত্তিতাড়নার সুযােগে মহাজ্ঞান হরণ করেছে! মহাশক্তিধর বন্ধুর সহায়তা এবং নিজের মন্ত্রশক্তি হারিয়ে চাঁদ শুধু আপনার ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের শক্তিতে সংগ্রাম করতে লাগল মনসার বিরুদ্ধে। মনসা তার ছয় পুত্রকে বিষভাত খাইয়ে হত্যা করল। বাণিজ্যে সংগৃহীত প্রভূত সম্পদ-সহ তার চৌদ্দ ডিঙা সমুদ্রে ডুবল মনসার ষড়যন্ত্রে। অনেক দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনা সহ্য করে চাঁদ প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরে এল। অবশেষে তার বেশি বয়সের সন্তান লখিন্দরের প্রাণরক্ষার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে মনসার সর্পাঘাত নেমে এল। কিন্তু তাতেও চাঁদ সদাগর অটল রইল। অবশেষে পুত্রবধূর সাধনায় যখন সব হারানো ধন ফিরে এল, চাঁদ মনসাকে পুজো করে সকলের দাবি মেনে নিল। নিজের ব্যক্তিত্বকে নির্জিত করল, পৌরুষকে বিক্ষত করল। তার মৌন হাহাকারের ট্র্যাজেডি অবশ্য দেবপূজার ধূপধূমে অনেক পরিমাণে আচ্ছন্ন হয়ে গেল কাব্যের সমাপ্তিতে।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনীগঠনে অন্য রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। যদিও লাউসেন-মহামদ সংঘাত এই কাহিনীর ভিত্তি রচনা করেছে, কিন্তু এর অন্তর্গত উপাখ্যানগুলি স্বতন্ত্রভাবেই পূর্ণদেহ হয়ে উঠেছে। লাউসেনের বিচিত্র বীরত্বপূর্ণ ঘটনা, বলা যায় নানবিধ অ্যাডভেঞ্চারের বিবরণে এই কাব্যটি পূর্ণ! সুরীক্ষার প্রলোভন-জয় বা মহামদের

দেওয়া মিথ্যা চুরি-অপবাদ অবশ্য পূর্ণাঙ্গ কাহিনী নয়, ক্ষুদ্র উপকাহিনী রূপেই গ্রাহ্য। কিন্তু কামরূপ-বিজয় এবং কলিঙ্গ বিবাহ, লৌহগণ্ডার বধ করে কানাড়া লাভ বা ইছাই ঘোষকে নিহত করে ঢেকুর জয় প্রভৃতি স্বতন্ত্র ও পূণাঙ্গ কাহিনীরূপে গণ্য হতে পারে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী-সজ্জার পেছনে শিল্পবোধ ছিল। কঠিন থেকে কঠিনতর বীরত্বের পরীক্ষা, উত্তেজনা থেকে গভীরতর উত্তেজনার দিকে পাঠককে নিয়ে যায়। ঢেকুর জয়ে তা চরমে ওঠে। কিন্তু এর পরেও লাউসেনের কর্মতৎপরতার অবসান ঘটেনি। হাক-সাধন করে সে পূর্বের সূর্যকে পশ্চিমে উঠিয়েছে। এই বীরত্ব বাইরের নয়, অন্তরের। ধর্মমঙ্গলের এই কাহিনীকে সর্বশেষে স্থান দিয়ে সাহিত্যরুচিরই পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনীগুলি স্বতন্ত্র। কিন্তু ঐক্যের সূত্রটিও বেশ শক্তিশালী। ফলে সমগ্র-কাহিনীরসের দিক থেকে বিঘ্ন দেখা দেয়নি। তাছাড়া এই খণ্ডকাহিনীগুলির মধ্যে সবত্রই। সংঘর্ষের ভাবটি বজায় আছে। কৌতুহল তাই প্রায় কোথাও শিথিল হয়ে পড়ে না। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে ধর্মমঙ্গলের পদ্ধতি গৃহীত হয়নি, আগেই দেখেছি। মনসামঙ্গলের রীতি অনুসৃত হয়েছে কিনা তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এ-জাতীয় কাহিনীতে ঘটনাগত ঐক্যই থাকে লক্ষ্য। প্রাচীনেরা বলেছেন 'action one and complete'। ঘটনা একটিই—এই বক্তব্যটি নানাভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে। খুল্লনা-ধনপতির যে সাক্ষাতে প্রণয়ের সূত্রপাত সেটি একটি ঘটনা। কিন্তু সে-ঘটনাকে পূর্ণাঙ্গ বলা যায় না, কারণ এখানে পরবর্তী ঘটনার প্রান্তটি উন্মুক্ত। এই ঘটনা পাঠককে পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে কৌতূহলী করে তোলে। ১. খুল্লনা-ধনপতি-প্রণয়, ২. লহনার সম্মতি আদায়, ৩. ধনপতি-খুল্লনা বিবাহ, ৪. ধনপতির। বিদেশ-গমন, ৫, লহনা-খুল্লনার কলহ, ৬. খুল্লনার দুভোগ, ৭. ধনপতির প্রত্যাবর্তনে খুল্লনার দুঃখের অবসান ও স্বামীর সঙ্গে সুখ-সম্মিলন। অনেকগুলি ঘটনা দানা বেঁধে একটি পূর্ণ কাহিনী হয়ে উঠেছে। খুল্লনা-ধনপতির সাক্ষাৎ ও প্রণয়ের পূর্বপ্রান্ত বন্ধ, অর্থাৎ এর আগে, এ ঘটনার কোন সূত্র নেই। কিন্তু এ ঘটনার উত্তর প্রান্ত খোলা, নতুন ঘটনার দিকে সেই খোলা দরজা আমন্ত্রণ জানায়, অপর-সব ঘটনার দুটি দিকই খোলা পূর্বপ্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে উত্তর প্রান্ত ধরে নতুন ঘটনার দিকে বেরিয়ে যাবার জন্য। শুধু শেষে ঘটনাটির (অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে সুখমিলন ও দুঃখাবসান) পূর্বপ্রান্তই শুধু খোলা, উত্তরপ্রান্ত বন্ধ। এই

টুকরো ঘটনাগুলির স্বাতন্ত্র্য থাকলেও পূর্ণতা নেই। সব টুকরো মিলে একটি পূর্ণদেহ বড় ঘটনা। একেই বন্ধ ঐক্যবদ্ধ একটি কাহিনী। টুকরো ঘটনাগুলি কি মন্ত্রে এই ঐক্য পেল?

ঘটনার খণ্ডগুলি একটি কাহিনীতে সংবদ্ধ হল একটি সমস্যার ঐক্যে। একটি সমস্যার আরম্ভ, বিকাশ ও পরিসমাপ্তি সুচিত করছে ঘটনাগুলি। সমস্যার কেন্দ্রে সংবদ্ধ বলেই এরা বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন হয়ে পড়েনি। বিবাহিত ধনপতি যখন খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হল, তাকে বিবাহ করতে চাইল, তখন থেকেই এই সমস্যার উদ্ভব। প্রথমা পত্নীকে নানা উপায়ে খুশি করে সে বিবাহের ব্যবস্থা করল। বিবাহ হয়ে গেল। আপাতদৃষ্টিতে লহনার মনোগত বাধার উত্তরণ ঘটল। প্রকৃত বিরুদ্ধতা ছিল তার ব্যক্তিত্বের গোড়ায়, এবং ধনপতি-কর্তৃক তার নারীত্বের অবমাননা ও অস্বীকৃতিতে। কাজেই ধনপতির অবর্তমানে খুল্লনার উপরে চলল প্রতিশোধ। খুল্লনার দুর্ভাগ্য এবং দুঃখের প্রয়োজনীয় বর্ণনা কবি দিয়েছেন। এখানে সমস্যা উঠেছে চরমে। বিরোধী শক্তির প্রবল প্রতিষ্ঠিত। নায়িকার উদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই যেন দেখা যাচ্ছে না। এই অংশকে বলা চলে কাহিনীর ক্লাইম্যাক্স। তারপরে ধনপতির প্রত্যাগমনে তার অবসান ঘটল; খুল্লনা পুত্রবতী হবার সম্ভাবনায়, সমস্যারূপিণী লহনাকে মনের ঈর্ষা মনে পোষণ করে দ্বন্দ্ব থেকে প্রতিনিবৃত্ত হতে হল। তার নিশ্চিত পরাজয় ঘটল! খুল্লনা-ধনপতির দিক থেকে দেখলে বাধা অপসারিত হল। সমস্যার সমাধান হল। কাহিনী পূর্ণতা পেল।

এ কাহনী পূর্ণাঙ্গ, ঐক্যবদ্ধ। কারণ একটির সমস্যার আরম্ভে এর আরম্ভ, সমস্যার গভীরতায় এর climax, এবং সমাধানে কাহিনীর সমাপ্তি। ধনপতির কাহিনী থেকে আমরা গল্প-গঠনরতির একটি মুখ্য পদ্ধতির উদাহরণ নেবার চেষ্টা করলাম।

এই বাহিনী আরও কিছুটা অনুসরণ করা যাক।

ধনপতি-খুল্লনার সমন্বিত দাম্পত্য জীবনে একটি নূতন সমস্যা দেখা দিল। ধনপতির অনুপস্থিতিতে যদি খুনা-লহনার সপত্নীদ্বন্দ্ব আবার তীব্র হয়ে উঠত, তাহলে সমস্যা একই। ধরনের হওয়ায় দুটি কাহিনী একটি কাহিনীতে পরিণত হত। অবশ্য পুনরুক্তি-

দোষে তার । গল্পরস যে অনেক পরিমাণে শিথিল হয়ে পড়ত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মুকুন্দরাম যেসমস্যার দ্বার রুদ্ধ করে সমাপ্তি টেনেছেন, তার যবনিকা আবার তুলে ধরেননি। ধনপতির সিংহলগমন একটি নূতন সমস্যা নিয়ে এল। ধনপতি খুল্লনার পূজিতা চণ্ডীদেবীর ঘটে পদাঘাত করে বসল।

লক্ষণীয়, এর পেছনে লহনার সপত্নী-দ্বেষ কিছুটা ইন্ধন জুগিয়েছিল। কিন্তু তবুও এ কাহিনীর সমস্যা সপত্নী-বিদ্বেষ নয়। লহনার চরিত্র আশ্রয় করে এই বৃত্তি কাহিনীর পরবর্তী অংশে বারবার দেখা দিলেও তা গৌণ প্রশ্ন হয়েই থেকেছে, খুল্লনার গৌরবকে ধূলিসাৎ করতে পারেনি। ঘটনার টুকরোগুলো এ-রকম—

১. ধনপতি চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করে বিপদ ডেকে এনেছে। ধনপতি চণ্ডীকে অপমানিত করে ক্রুদ্ধ করে তুলল।

২. চণ্ডীর কোপে তার নৌকোগুলি সমুদ্র-মোহনায় বিপর্যস্ত হল। একটি মাত্র বাণিজ্যতরী নিয়ে সে সিংহলে পৌঁছল।

৩. আবার চণ্ডীর ছলনা কমলে কামিনীর রূপ ধারণ করে দেখা দিল।

৪. এই ছলনার ফল ধনপতির বন্দিত্ব। ধনপতি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলে চণ্ডীর দেওয়া শাস্তি চরমে পৌঁছল বলা যেতে পারে। এই কাহিনীর এখানেই ক্লাইম্যাক্স। চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করে ধনপতি যে-সমস্যার সূত্রপাত করেছিল এখানে তা চরমে উঠল। এক্ষেত্রেও প্রতিটি ঘটনাই পরবর্তী ঘটনার দিকে কাহিনীকে এগিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ধনপতির ঘটে পদাঘাত একেবারে নূতন ব্যাপার, আগের কোন ইঙ্গিতই এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের একবারও সচকিত করে তোলে না। এ ঘটনার পূর্বপ্রান্ত তাই রুদ্ধ, উত্তরপ্রান্ত উন্মুক্ত। এই কাহিনী কিছুকাল স্থগিত থেকে শেষ ঘটনায় পৌঁছল।

৫. শ্রীপতির সঙ্গে মিলনে ও কারা থেকে উদ্ধারে। কাজেই এ একেবারেই নূতন কাহিনী। কিন্তু ক্লাইম্যাক্সে এসে এ-কাহিনীকে কিছুক্ষণ স্থগিত রেখেছেন। কবি। দেশে ধনপতির পুত্র হয়েছে, তাকে ঘিরে বাৎসল্য-রসের উৎসব চলেছে। অবশেষে শ্রীপতি বড় হয়েছে, পাঠশালায় লাঞ্ছিত হয়ে পিতৃসন্ধানে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। ধনপতির

কাহিনীও উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু শ্রীপতির সিংহলযাত্রা, পথের বিপদ-অভিজ্ঞতা, কমলেকামিনী দর্শন, রাজরোষ- সব মিলে ধনপতির অভিজ্ঞতার একেবারে পুনরুক্তি। এই পুনরুক্তি কাব্য-সৌন্দর্যের হানি ঘটিয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু কাহিনী-গঠনের দিক থেকে এর পেছনে কবির সচেতন পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায় । যে-অভিজ্ঞতার ফলে ধনপতি কারাগারে প্রেরিত হল, দীর্ঘকাল দুঃখভোগ করতে বাধ্য হল, সেই একই জাতীয় ঘটনার ফলে কিন্তু শ্রীপতি পিতাকে কারামুক্ত করল, রাজকন্যা বিবাহ করে সগৌরবে দেশে ফিরে এল। চণ্ডীর অকৃপা ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা মন্থন করে বিষ তুলেছিল, শ্রীপতির বাণিজ্যযাত্রা চণ্ডীর কৃপায় অমৃত হয়ে উঠল। শ্রীপতির এই কাহিনী বহু ঘটনার সমন্বয়ে গঠিত।

শ্রীপতির পিতা ধনপতি বহু বৎসর বাণিজ্যযাত্রায় বেরিয়ে নিখোঁজ। বালক একটু বড় হল, পিতৃপরিচয় প্রসঙ্গে পাঠশালায় অপমানিত হল। পিতার সন্ধানে বাণিজ্যযাত্রা করল। তার যাত্রাপথের বিবরণ থেকে সিংহল-রাজকন্যাকে বিবাহ, পিতার উদ্ধার, দেশে প্রত্যাবর্তন, উজ্জয়িনীর রাজকন্যা-বিবাহ, সূব মিলে একটি পূর্ণদেহ কাহিনী-গঠন মনে করা যেতে পারে। পূর্ণাঙ্গ কাহিনীর প্রায় সব লক্ষণই এর মধ্যে আছে।

কিন্তু ধনপতির কারাবাস এবং তার উদ্ধারসাধনের মূল প্রয়োজনের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় একে উপকাহিনীই বলব। শ্রীপতির উপকাহিনী ধনপতির মূল কাহিনীর একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। অবশ্য সুবিস্তৃত উপকাহিনী হিসেবে প্রয়োজনের বাইরেও এর কিছুটা স্বতন্ত্র বিকাশ আছে। কাব্য কাহিনীর ঐক্যের দিক থেকে তা কিছু ক্ষতিকর নয়। নাটকে নিবিড়তর ঐক্যের প্রয়োজন। এ ধনপতির আখ্যানকে গঠনরীতির দিক থেকে বিশ্লেষণ করে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা চলে।

১. ধনপতির আখ্যানে আসলে দুটি কাহিনী। একই ব্যক্তি ধনপতির জীবনের দুটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে দুটি পূর্ণ কাহিনীবৃত্ত রচিত হয়েছে। প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির সমস্যাগত বা ঘটনাগত কোন যোগসূত্র নেই। দুটিই ধনপতির জীবন-ঘটনা এবং দুটির মধ্য দিয়েই চণ্ডীমাহাত্ম্য বিজ্ঞাপিত হয়েছে। চণ্ডীর মাহাত্ম্য ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যাক কাহিনীর মধ্য দিয়ে। প্রচারিত হতে পারে। তাতে এদের মধ্যে কাহিনীগত ঐক্য স্থাপিত

হয় না। ধনপতির জীবনঘটনারূপে অঙ্কিত হলেও দুটি সমস্যাই তার চরিত্রের মৌলবৃত্তি থেকে উৎসারিত নয়। ধনপতির দুর্বলচিত্তের রূপমোহ প্রথম সমস্যার জন্ম দিয়েছিল। দ্বিতীয় সমস্যার ভিত্তিতে আছে তার ধর্মভাবনাসম্পর্কিত দৃঢ় পুরুষোচিত প্রতিজ্ঞা। কিন্তু এই বৃত্তিটি তার চরিত্রের কোথাও ছিল না, কোথাও সত্য হয়ে ওঠেনি।

২. ধনপতির দ্বিতীয় কাহিনীটির মূলে মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের কাহিনীর অনুসরণ আছে কিন্তু চাঁদকে কেন্দ্র করে মনসামঙ্গলের মুখ্য কবিরা যে ঘনীভূত গল্পরস উপহার দিয়েছেন তার সামান্য প্রতিধ্বনিও এখানে নেই। ধনপতির চরিত্রের সঙ্গে তার আচরণের মিল নেই। কাহিনীর কেন্দ্রে যে দ্বন্দ্ব জীবন্ত ও তীব্র থাকলে গল্প দানা বাঁধে, এখানে তার অভাব। চণ্ডী অত্যাচারী, ধনপতি অত্যাচারিত। চণ্ডী সক্রিয়, ধনপতি নিষ্ক্রিয়। দুই পক্ষ পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে কর্মতৎপরতা দেখাবে, ঘটনার উপরে নিজের অসপত্ন অধিকার বিস্তৃত করতে চাইবে; এমনকি যে-পক্ষ তুলনায় দুর্বল সে-ও অধিকতর শক্তিমানের প্রভুত্ব। মানতে চাইবে না। এভাবে সংঘর্ষণ হলেই কাহিনী আকর্ষণীয় হয়। সেই আকর্ষণ ধনপতিচণ্ডীর কাহ্নীটিতে নেই। তবে ধনপতি-খুল্লনার কাহিনী এদিক থেকে আকর্ষণীয়। লহনা খুল্লনার সংঘাত আদ্যন্ত এক কৌতুহল জাগিয়ে রেখেছে। ধনপতির চরিত্রের কোথাও চণ্ডীবিরুদ্ধতার গভীর অঙ্কুর নেই। বাইরে থেকে উড়ে এসে এই বিরোধের বীজ পড়েছে। কিন্তু অনুকূল জনির অভাবে জীবন্ত গাছ জন্মায়নি। কবি যা গড়ে তুলেছেন তাতে প্রাণের সাড়া নেই। মনসামঙ্গল কাহিনীর কেন্দ্রেও আছে এই সমস্যা। এই সমস্যাই সেই কাহিনীর প্রাণ। চণ্ডীমঙ্গলে তার শুধু কৃত্রিম অনুকরণ।

৩. শ্রীপতির উপকাহিনীটি পুনরুক্তিদোষে দুষ্ট। ঠিক যে ঘটনা ও বর্ণনা আমরা ধনপতির সঙ্গে পাই, তার হুবহু অনুসরণ দেখি শ্রীপতির কাহিনীতে। ধনপতির বাণিজ্যযাত্রায় পন্ধের যে- বর্ণনা কবি করেছেন—একই ভাষায় একই পথের বিবরণ মিলেছে। শ্রীপতির মুদ্র-যাত্রা প্রসঙ্গে। মগরায় দুজনের নৌকোই চণ্ডীর মায়ায় বিপদগ্রস্ত। দুইবারই একই ভাষয় ঝড়-বৃষ্টির বর্ণনা করা হয়েছে। পিতা-পুত্র একই ধরনের পথের বিপদ ভোগ করেছে, এই রূপ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। উভয়ে কমলে-

কামিনী দেখেছে, একই ধারায় বিস্ময় অনুভব করেছে। কবিও যেন পরিশ্রম করে বর্ণনায় কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করতে চাননি। সিংহলের ঘাটে পৌঁছে পিতা-পুত্র দুজনেই কোটালের সঙ্গে একই ভাষায় কলহ করেছে। দ্রব্য-বিনিময়ও হয়েছে একেবারে একই পদ্ধতিতে। উভয় ক্ষেত্রেই অগ্নিশর্মা পুরোহিতের আগমনে বণিকের পথের বিবরণ এসে পড়েছে, কমলে-কামিনীর কথা উঠেছে এবং ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটেছে। এর পরে অবশ্য কাহিনীর গতি ভিন্নমুখী হয়েছে। কিন্তু এতদূর পর্যন্ত একই ভাষায় একই বর্ণনা কাহিনী-রসের দিক থেকে যে কি পরিমাণ বিরক্তির সৃষ্টি করে তা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। হয়ত সেকালের শ্রোতা-পাঠকের কাছে পুনরুক্তি এতটা দোষের হত না। কিন্তু একালের পাঠকের কথাই বলছি। মুকুন্দের কাব্য এখন কেমন তার বিশ্লেষণই আমার লক্ষ্য। মুকুন্দরামের মত শিল্প প্রাণ ব্যক্তির রচনায় এ জাতীয় আলস্য-জাত দুর্বলতা কঠিন সমালোচনার যোগ্য সন্দেহ নেই। ধনপতির দ্বিতীয় আখ্যানটিতে কৃত্রিমতা ও দুর্বলতা এর ফলে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে।

৪. আখ্যান-কাব্যে কাহিনীগঠন চরিত্রের ক্রমবিকাশের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। ঘটনা ও চরিত্র যতটা অন্যোন্য হয়ে ওঠে রচনার মূল্য ততই বেড়ে যায়। ধনপতির দ্বিতীয় আখ্যানটি ঘটনাসর্বস্ব, চরিত্রসাপেক্ষ নয়। ধনপতির প্রথম কাহিনীতে ঘটনা ও চরিত্র নিপুণভাবে টানাপোড়েনে বুনট হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে দৈবী শক্তির স্বেচ্ছাচারিতা ও অঙ্গুলি-সঙ্কেতে ঘটনার পরে ঘটনা সাজিয়ে তোলা হয়েছে। ফলে এই অংশের পাত্রীগুলি দাবা-বড়ের ছকের মত ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ব কাহিনীতে তাদের যে-পরিচয় পেয়েছিলাম বর্তমান কাহিনী আরম্ভ হতে হতেই তার উপরে ছেদ পড়েছে, তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। নৃতন কাহিনীতে সেইসব চিত্তবৃত্তি ভুমিকাহীন। কিন্তু মানুষগুলির কোন নূতন চরিত্রপরিচিতিই সত্য হয়ে ওঠেনি যাতে এই স্বতন্ত্র ঘটনার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক আবিষ্কার করা চলে।

ধনপতির আখ্যানের প্রশংসা কমই হয়েছে। কিন্তু বণিক-খণ্ডে দুটি স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী আছে। দ্বিতীয় কাহিনীটির নানা ত্রুটি থাকলেও প্রথম কাহিনীর সুনিপুণ গঠনকৌশলকে উচ্চ মূল্য দিতেই হবে।

৯.৩ কাহিনী-আভাস: শিব-চণ্ডী বৃত্তান্ত

দেবখণ্ডে শিব-চণ্ডীকে আশ্রয় করে মুকুন্দরাম একটি কাহিনী গড়ে তুলেছেন। এ কাহিনীর অনেকটাই অবশ্য সঙ্কলন, কিছু মৌলিক উদ্ভাবনও আছে। শিবপুরাণগুলিতে দক্ষযজ্ঞের কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে। পুরাণগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যাচ্ছে এই কাহিনীটিই। মুকুন্দরাম অনেক পুরাণ বিচার করে চণ্ডীমঙ্গল লিখেছেন, পুরাণ থেকেই তিনি দক্ষযজ্ঞের প্রসঙ্গ গ্রহণ করেছেন। দক্ষযজ্ঞের তাণ্ডব নিবৃত্ত হবার পরে শিব তপস্যায় বসেছে এবং শেষ পর্যন্ত তপস্যাভঙ্গে পার্বতী-উমাকে বিবাহ করেছে। এই কাহিনীও পৌরাণিক। কিন্তু এক্ষেত্রে মুকুন্দরাম কালিদাসের কুমারসম্ভবের আদর্শটি সামনে ধরে রেখেছেন। শিব-বিবাহের পরবর্তী পারিবারিক অংশটি মুন্দেরামের মৌলিক ভাবনা। অবশ্য এই ভাবনার পেছনে বাংলা দেশের লৌকিক বিশ্বাস খুবই কার্যকর ছিল মনে হয়। এই কাহিনী সর্বপ্রথম কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেই বলা হল। মুকুন্দরামের আগে শিব-পার্বতীর প্রসঙ্গ পাচ্ছি বিজয়গুপ্ত এবং বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে। দুই কবির স্বর্গখণ্ডের কাহিনীতে আংশিক মিল আছে। বিপ্রদাসের শিব-প্রসঙ্গের সঙ্গে ধর্মঠাকুর সম্পর্কিত। এই দুজনই শিব-পার্বতীর দাম্পত্যজীবনের ছবি এঁকেছেন। তাতে নিশ্চিত অপৌরাণিকতা বর্তেছে, মাটির স্পর্শ লেগেছে। কিন্তু শিবের চরিত্রশৈথিল্য দুটি গ্রন্থেই প্রাধান্য পেয়েছে। মুকুন্দরামে শিবের কামুকতা একেবারেই গৌণ হয়ে পড়েছে। দরিদ্র ভিখারি শিবের পারিবারিক জীবনচিত্রই এ কাব্যে মুকুন্দরামের বিশিষ্ট প্রবণতার সাক্ষ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। শিবের পরিবার-কথা বাঙালির লৌকিক-ভাবনায় ধরা পড়েছিল অনেক আগে থেকেই। গ্রাম্য ছড়ায় ও গল্পে হয়ত এর সংক্ষিপ্ত অমার্জিত রূপের প্রচলনও ছিল। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে,অনুদামঙ্গল ও কবিকঙ্কণের কবি যদিচ রাজসভা ধনিসভার কবি, যদিচ তাহারা উভয়ে পণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য বিশারদ, তথাপি দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে বেশিদূর ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই।....কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা, সমস্তই গ্রাম্যকাহিনী অবলম্বনে রচিত। সেই গ্রাম্য ছড়াগুলির পরিচয় পাইলে তবেই ভারতচন্দ্রমুকুন্দরাম-রচিত কাব্যের যথার্থ

পরিচয় পাইবার পথ হয়। কিন্তু লোকসূত্র থেকেকাহিনী-মূল গ্রহণ করলেও ভাষারূপে, বিন্যাসে কবি একে নতুন করে গড়েছেন। এর মৌলিকতা মেনে নিতে হয়।

মৌলিক কাহিনী-অংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মানবতা। বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দেবতাকে মানুষে পরিণত করেছেন কবি অনায়াসেই। এ বিষয়ে কবির সংশয়মাত্র ছিল না। অন্যত্র সমুচ্চ তার ব্রাহ্মণ্যসংস্কার এই বিষয়ে মাথা উঁচু করতে পারেনি। কিন্তু একান্ত মানবরসপুষ্ট এই অংশের সঙ্গে পুরাণানুসারী দক্ষযজ্ঞ এবং কালিদাসের দ্বারা প্রভাবিত শিকতপস্যাকে কবি মেলালেন কোন মন্ত্রে?

দক্ষযজ্ঞের কাহিনীতে পুরাণানুমোদিত উত্তেজিত ঘটনাবর্ত প্রকাশিত। মুকুন্দরামের কবি-প্রাণের সঙ্গে এই জাতীয় উচ্চকণ্ঠ ঘটনা-বিবরণের সহজ সম্পর্ক নেই। যজ্ঞস্থানে দক্ষের শিবনিন্দা, প্রত্যুত্তরে সতীর উদাত্ত সুরে শিবমহিমা জ্ঞাপন, এবং যোগমগ্ন অবস্থায় প্রাণত্যাগ, শিরসেনা কর্তৃক যজ্ঞধ্বংসের তাণ্ডব-সব কিছুই গৌরবে, বর্ণনায় অত্যুজ্জ্বল বর্ণপাতে মহাকাব্যিক সৃষ্টিরূপে গণ্য হবার যোগ্য। মুকুন্দরামের মত বড় কবি এক্ষেত্রে যে দায়সারাগোছের স্বল্পবর্ণ ক্ষীণপ্রাণ সফলতা দেখিয়েছেন তার প্রধান কারণ এই সুরে তার মনোবীণা ঠিক বাজে না। আরও লক্ষণীয়, এর মধ্যেই কবি পরিবার-রসের সঞ্চার করতে চেয়েছেন। বিনা নিমন্ত্রণেও পিতৃগৃহে যাবার জন্য সতীর ব্যাকুলতায় আগমনী গানের পূর্বাভাস শুনতে পাই।

পর্বত কাননে　　　　নাহিক পাড়াপড়সী
সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখী।
একতিল কোথা যাই　　　　জুড়াইতে নাহি ঠাই
বিধি মোরে কৈল জন্মদুঃখী।

তার মনের একান্ত সাধ মায়ের বন্ধনে খাব ভাত। শিব অনুমতি না দেওয়ায় সে রেগে জোর করে একাই বাপের বাড়ি চলল। বাধ্য হয়ে সন্ত্রস্ত শিব সঙ্গী ও সঙ্গতি জোগাল। আবার সতী হারিয়ে শিবের বালকের মত মাটিতে লুটিয়ে কান্নার বর্ণনা দিয়েছেন কবি।

সে কান্নায় গৃহের সুর বেজেছে, রুদ্রের বিশ্বনৃত্যের তাল নেই। দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস হল। শিব কিন্তু পত্নীবিহনে অস্থির হয়ে পড়ল।

এই যজ্ঞে সতী দেবী ছাড়িল শরীর।

তাহা বিনা সর্বদেব হইল অস্থির।

গৃহী শিবের গৃহিণীর ব্যবস্থা হল। সতী নবজন্ম লাভ করল হিমালয়ের কন্যারূপে। দক্ষযজ্ঞের কাহিনীর মধ্যে উমা-বিবাহের বীজ ছিল। সতীর অভাবে অস্থির শিবের গৃহিণী প্রয়োজন। সতী উমারূপে নবজন্ম গ্রহণ করল। দুটি অংশের মধ্যে অলৌকিকতার সেতুবন্ধন রচিত হল। সেটিও এক ধরনের গ্রন্থি। তাই কাহিনীর দুটি অংশ অসংশ্লিষ্ট থাকেনি। এ মুকুন্দরামের শিবের তপস্যা-ব্যাপারটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়, ব্রাহ্মণ গৃহীর সন্ধ্যাহ্নিকের চেয়ে গম্ভীর মাহাত্ম্যসূচকও নয়। দুটি চরণেই তাই বর্ণনার শেষে-

এমত সময় শিব তপস্যা কারণে।

গঙ্গার নিকটে গেলা হিমালয়-বনে।।

তপস্যাভঙ্গকেও কোনরূপ গুরুত্ব দেননি কবি—তপোভঙ্গ হৈলে শিব গেলা অন্যস্থান। এই তো তপস্যা! এরই ফাঁকে কবি কালিদাসের অনুসরণে তপোবন বসন্তসমাগম, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, উমা-তপস্যা প্রভৃতি বিষয় সন্নিবিষ্ট করেছেন। এর দ্বারা শিব-পার্বতীর গল্পে কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য কবির ছিল। কিন্তু মৌলিক গল্পাংশের সঙ্গে এর কিছুমাত্র সুরসঙ্গতি ঘটেনি। এই গল্পাংশের মধ্যে কোথাও শিব-উমার প্রণয়উন্মেষের ইঙ্গিত করা হয়নি। শিব-উমার বিবাহের ও দাম্পত্যজীবনের কাহিনীর সঙ্গে এর কোনরূপ সম্পক স্থাপিত করতে পারেননি কবি। শিব-পার্বতীর এই কাহিনী-বিচারে শেষ পর্যন্ত বলা চলে--

১. কালিদাসের অনুসরণে যে-অংশ কাব্যমধ্যে সংশ্লিষ্ট হয়েছে তার কাহিনীগত উপযোগিতা বিধান করা যায়নি।

২. দক্ষযজ্ঞের পৌরাণিক অংশের বর্ণনায় ব্যর্থ হলেও, শিব-পার্বতীর বিবাহ ও দাম্পত্যজীবনের সঙ্গে পৌরাণিক প্রসঙ্গের সংযোগ সাধিত হয়েছে।

৩. দক্ষযজ্ঞের মধ্যে সামান্যত হলেও একটি পরিবাররসের সুর প্রকাশ করতে চেয়েছেন মুকুন্দরাম। মৌলিক অংশে তাই-ই প্রধান হয়ে উঠেছে।

৪. এই সংযোগসূত্র সত্ত্বেও সমগ্রত দক্ষযজ্ঞ এবং শিবপার্বতীর দাম্পত্যজীবনকে এক কাহিনীতে বাঁধা যায় না। এদের রূপ ও রস একেবারে আলাদা। পুনর্জন্মের অলৌকিকতাকে মেনে নিলেও দুই অংশের মধ্যের এই যোগসূত্র অতি ক্ষীণ। পূর্ব কাহিনার প্রভাব উত্তরাংশে পড়েনি, তার স্মৃতিও লুপ্ত। এই ভিন্নতাকে মেলাতে পারেননি কবি, মেলানো সম্ভব হয়নি।

মৌলিক অংশটুকুর বিশ্লেষণেও চিত্রের প্রাধান্য দেখা যাবে। ঐক্যবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ কাহিনীরূপে তারা ঘনীভূত হতে পারেনি। অবশ্য কাহিনী গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন। ঘটনাংশগুলি সাজানো যাক—

১. শিব-পার্বতীর বিবাহ হল। বরের দারিদ্র্য ও বার্ধক্যের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে এই অংশে। বার্ধক্যের প্রসঙ্গ কোন সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি এই কাহিনীতে। কিন্তু গোড়া থেকেই দারিদ্র্য কেন্দ্রীয় সমস্যারূপে এই গল্পে স্থান পেয়েছে। শিবের দারিদ্র্য এবং কর্মবিমুখতাই এই গল্পে ঘটনাবর্ত সৃষ্টি করেছে।

২. শিবের শ্বশুরালয়ে বাস, মাতা-কন্যার কলহের দৃশ্য। এর অন্তরালে শিবের ব্যক্তিচরিত্রই সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

৩. মায়ের সঙ্গে কলহ করে পার্বতী পতিগৃহে চলে গেল।

৪. অভাবের সংসার। বাধ্য হয়ে শিবের ভিক্ষায় বেরুতে হল। শিবের ভিক্ষা, ভিক্ষান্তে। গৃহে প্রত্যাবর্তন। ভিক্ষার ধনে পত্নী-পুত্রসহ শিবের আনন্দ—পরিবার-রসের সুন্দর আলেখ্য। যেমন জীবন্ত তেমনি বাস্তব। কৌতুক-রসের মিশ্রণে উপভোগ্যও। পরের দিন প্রভাতে অলসস্বভাব ভোজনলোলুপ গৃহকর্তাটি আর ভিক্ষায় যেতে চাইল না। আগের দিনের ভিক্ষাজাত দ্রব্যে চর্ষ্যচুষ্যের এক বিপুল আয়োজনের দিবাস্বপ্ন দেখতে লাগল।

গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে কলহ তাই অনিবার্য। বিবৃত প্রসঙ্গগুলি স্বতন্ত্র চিত্র হিসাবে আস্বাদ্য, আবার পরস্পর সংলগ্নও। প্রতি ঘটনাচিত্র পরেরটির অনিবার্য কারণ। ফলে শিব-বিবাহ থেকে শিবপার্বতী-কলহ পর্যন্ত কার্য-কারণের একটি সুসম্বদ্ধ মালা। কেন্দ্রীয় সমস্যাটিও আদ্যন্ত স্পষ্ট। শিবের দারিদ্র্য। কিন্তু এই সমস্যা কোন কেন্দ্রীয় সংঘাতের সৃষ্টি করেনি। তবুও মাতা-কন্যার এবং স্বামী-স্ত্রীর কলহে দ্বন্দ্বরস বজায় থেকেছে। কাহিনীকে আকর্ষণীয় করে রেখেছে। তবুও এটি কোন পূর্ণদেহ ঘটনা হয়ে ওঠেনি। কারণ এ গল্পের শেষ নেই। এর উত্তর প্রান্ত একেবারেই ভোলা। সংসারের দারিদ্র ঘোচাতে পার্বতী মতে পূজা প্রচার করতেচাইলেন—এই সূত্র ধরে কাহিনী দেবখণ্ড থেকে নরলীলায় নেমে এসেছে বটে। মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্য ও প্যাটার্ন পুরোই রক্ষিত হয়েছে; কিন্তু শিব-পার্বতীর কাহিনী, মধ্যপথে অকস্মাৎ খণ্ডিত হয়েছে। এই খণ্ড-কাহিনীতে ঘটনা ও চরিত্রের সাযুজ্য ঘটেছিল, তবুও এই একটিমাত্র ত্রুটির জন্য পূর্ণ গল্পের মর্যাদা একে কিছুতেই দেওয়া চলে না।

৯.৪ নির্বাচিত প্রশ্ন

- চন্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি মুকুন্দের কাহিনী বর্ননায় মৌলিকতার পরিচয় দাও ।
- চন্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি মুকুন্দের কাহিনী বর্ননায় শিব-চন্ডীর বৃত্তান্তের করিতে ।
- চন্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি মুকুন্দের ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে কি না আলোচনা কর ।

৯.৫ সহায়ক গ্রন্থ

চন্ডীমঙ্গল পরিক্রমা - সুখময় মুখোপাধ্যায়

কবি মুকুন্দ রাম - ক্ষেত্রগুপ্ত।

চন্ডীমঙ্গল -এস, ব্যানার্জী

বাংলা মঙ্গল কাব্যর ইতিহাস - আশুতোষ ভট্টাচার্য

একক ১০- চন্ডীমঙ্গলের পুরাণকথা

বিন্যাস ক্রম

১০.১ পৌরাণিক প্রসঙ্গ

১০.২ অলৌকিকতা

১০.৩ উপন্যাসের লক্ষণ

১০.৪ হাস্যরস

১০.৫ নির্বাচিত প্রশ্ন

১০.৬ সহায়ক গ্রন্থ

১০.১ পৌরাণিক প্রসঙ্গ

দেবখন্ডের মধ্যে পৌরাণিক বিষয় কহিনীর প্রত্যক্ষ অংশ--

১. দেবীর কঞ্চুলী চিত্রণ। প্রধানত দশাবতার বর্ণনা এবং কৃষ্ণের ব্রজলীলার বীরত্ব

২. চণ্ডীর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ। সীতার বনবাস, পরশুরামের মাতৃহত্যা।

৩. পুনর্বার ফুল্লরার উপদেশ। সাবিত্রী-উপাখ্যান।

৪. চণ্ডীর প্রতি কালকেতুর উপদেশ। সীতার লোকাপবাদ।

৫. কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ। বালী-সুগ্রীব-যুদ্ধ।

ধনপতি-খুল্লনা-লহনা-আখ্যান।

১. সারীশুকের উপদেশ। শিবিরাজার উপাখ্যান।

২. রাজার সঙ্গে শুকের কথোপকথন। প্রধানত শ্রীবৎস-কাহিনী।

৩. হরিবংশ-কথা।

৪: ধনপির প্রতি রামায়ণের দৃষ্টান্ত।

ধনপতি-শ্রীপতির বাণিজ্য-কথা।

১. শ্রীমন্তের বাল্যক্রীড়া, বৎসহরণ-ক্রীড়া, প্রলম্ব-বধ-ক্রীড়া।

২. গঙ্গার উৎপত্তি কথন।

৩. সগরবংশের উপাখ্যান, ভগীরথের গঙ্গা আনয়নে যাত্রা, গঙ্গা আনয়ন, সগরবংশ উদ্ধার।

৪. ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার উপাখ্যান।

৫. সেতুবন্ধ-উপাখ্যান, সেতুভঙ্গ-বিবরণ।

তিনটি কাহিনীতে মোট চোদ্দটি আখ্যান বিবৃত হয়েছে। কতকগুলি ক্ষেত্রে।

ভ্রমণবৃত্তান্তের বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য স্থানমাহাত্মজ্ঞাপক পুরাণ-কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

মুকুন্দরাম এই আখ্যানগুলি সংযোজন করে কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছেন তা ভাববার মত। সম্ভবত জনসাধারণকে চণ্ডীর কাহিনী শোনাতে গিয়ে পৌরাণিক শিক্ষামূলক আরও কিছু আখ্যান শুনিয়ে পূণ্যলাভের সহায়তা করবার ইচ্ছা মুকুন্দরামের ছিল। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সেইজন্যও এই জাতীয় উপাখ্যানের প্রতি কবি বিশেষ আকর্ষণ দেখিয়েছেন। এইগুলি ধর্মীয় কারণ। কিছু কাব্যিক কারণও ছিল। মুকুন্দরাম পৌরাণিক স্বতন্ত্র রসের সহায়তায় তার ঘটনাবিরল গল্পে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। সাহিত্য হিসেবে আমাদের বিচার্য এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যে কবি কতটা সফল হয়েছেন। " কালকেতুর উপাখ্যানে কাচুলি-নির্মাণের ব্যাপারটি মঙ্গলকাব্যের একটা মামুলি প্রথানুগত্য। এর সঙ্গে কাহিনী বা পাত্র-পাত্রীর কোন সম্পর্ক নেই। কাঁচুলি অলঙ্করণে বহু মঙ্গল-কবিইপুরাণ-কাহিনীর চিত্রায়নের কথা বলেছেন। এখানে মুকুন্দরামের বিশিষ্টতা কিছু নেই। ব্যাধখণ্ডের অপর চারটি পৌরাণিক প্রসঙ্গ উপদেশের উদাহরণ। চারটিই

ফুল্লরাকালকেতুর মুখে বসানো হয়েছে। পৌরাণিক সংস্কারের আতিশয্য কবিকে প্রকৃত রসবোধ থেকে চ্যুত করেছে। কালকেতু ফুল্লরার মত অনার্য-সংস্কারের মানুষের মুখে কথায় কথায় এরূপ পুরাণ-প্রসঙ্গ স্বাভাবিক নয়, কবির ব্যক্তিভাবনার আরোপ বলেই গ্রাহ্য। লক্ষণীয়, এর মধ্যে ফুল্লরার পৌরাণিক উদাহরণ দেবার ঝোকটাই বেশি। বক্তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অসঙ্গত হলেও উপদেশের উদাহরণ হিসেবে কাহিনীগুলি সুনির্বাচিত। নারীর সামাজিক অবস্থানের ন্যূনতা, সতীত্বের মূল্য, লোকাপবাদের বিভীষিকা প্রভৃতির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কয়েকটি কাহিনীর মাধ্যমে। উদ্দেশ্য অজ্ঞাতপরিচয় সুন্দরী রমণীকে (অর্থাৎ চণ্ডী) বুঝিয়ে নিজগৃহে পাঠিয়ে দেওয়া। সেদিক থেকে উদাহরণগুলি সুপ্রযুক্ত। বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধের গল্প বলে ফুল্লরা কালকেতুকে সংগ্রাম থেকে নিবৃত্ত হতে বলেছে। এক্ষেত্রে ফুল্লরার সিদ্ধান্তটি জোর করে করা, উদাহরণে এর কোন ইঙ্গিত ছিল না।

ধনপতি-খুল্লনা-লহনার আখ্যানে সারীশুকের কাহিনীর প্রাসঙ্গিকতা বিশেষ নেই। তাদের মুখ দিয়ে শিবিরাজা ও শ্রীবৎসের যে উপাখ্যান-দুটি শোনানো হয়েছে মূল কাহিনীর দিক থেকে তার কোন তাৎপর্য নেই। খুল্লনার সতীত্ব প্রসঙ্গে সমাগত বণিকেরা হরিবংশ এবং রামায়ণ থেকে দৃষ্টান্ত দিয়েছে। বিষয় হিসেবে এরা তাৎপর্যপূর্ণ ও সুসঙ্গত।

ধনপতি-শ্রীপতির বাণিজ্য কথায় শ্রীপতির বাল্যলীলার বর্ণনায় কৃষ্ণের কাহিনী আসেনি; শ্রীপতি স্বয়ং কৃষ্ণের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে। ভাগবতে কথিত কৃষ্ণের বাল্যক্রীড়া ও অসুর-সংহারের কথাই এখানেও বলা হয়েছে, তবে নায়ক কৃষ্ণ নয়, শ্রীপতি। সুপ্রাচীন কাল বাংলাদেশের জননী আপন সন্তানের মধ্যে কৃষ্ণকে দেখতে পেয়েছেন। এই সব কাহিনী-কল্পনায় যে-ভাবনা ক্রিয়াশীল রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তার পরিচয় দেওয়া যায়, যখন দেখিয়াছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাজে ভাজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে।

এই আখ্যানের অপর পুরাণ-বৃত্তান্তগুলি শ্রীপতির ভ্রমণ উপলক্ষে কাব্যমধ্যে স্থান। পেয়েছে। গঙ্গা নদী ধরে শ্রীপতির যাত্রা শুরু হলে প্রথমে বিষ্ণুপদে গঙ্গার জন্মকথা শোনানো হয়েছে। গঙ্গার মোহনায় সগরবংশ ধ্বংস এবং গঙ্গার মর্ত্যাবতরণে তাদের মুক্তির কাহিনী স্থান পেয়েছে। পুরীতে সদাগর পৌছলে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার প্রসঙ্গ স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে। তবে গল্পের চেয়ে স্থানমাহাত্ম্যই এই প্রসঙ্গে প্রাধান্য পেয়েছে। রামেশ্বর সেতুবন্ধ দিয়ে যাত্রাকালে রাম-কর্তৃক সেতুবন্ধন এবং অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন-কালে সেতুভঙ্গের কাহিনী—এক কথায় গোটা রামায়ণের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়েছে। ভ্রমণপথের সঙ্গে যুক্ত এই পুরাণ-কাহিনীগুলির বিবরণ শ্রীপতির সমুদ্র-ভ্রমণকে ধনপতির বাণিজ্য-যাত্রা থেকে স্বাতন্ত্র দিয়েছে। ধনপতিও ঠিক একই পথ দিয়ে একই ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সিংহলে পৌঁছেছে। দুটি ক্ষেত্রে কবির বর্ণনায়ও ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। মাত্র এই পুরাণ বিবরণ শ্রীপতির ভ্রমণকে স্বাতন্ত্র দিয়েছে।

পুরাণ-কাহিনীগুলির সংযাোজনে ও বিন্যাসে সর্বত্র না হলেও কোথাও কোথাও কবি গঠন-কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনীর নিজস্ব রস—দ্রুততাল | জীবনের প্রবলতা, শক্তির আতিশয্য, প্রবৃত্তির প্রগলভতা, সঙ্গীতের উচ্চকণ্ঠ তীব্রতা-সব মিলে একটা মহান গাম্ভীর্যমুকুন্দরামের রচনায় প্রকাশ পায়নি। গল্পগুলি বিবরণ-সর্বস্ব এবং কঙ্কালসার হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে কৌশল আছে ঠিকই, কিন্তু শিল্পসিদ্ধি নেই।

১০.২ অলৌকিকতা

পুরাতন গল্পগ্রন্থনে অলৌকিকতা ছিল একটি প্রধান উপাদান। কারণ সেকালে ভক্তি আর ধর্মর্ভব ছিল সর্বজনীন। সাধারণের ভক্তি আর ধর্মভাব দার্শনিক বোধের স্তরে স্থিত ছিল না। লৌকিক স্কুল বিশ্বাসকেই আশ্রয় করত। এই বিশ্বাস-মতে অসম্ভব সম্ভব না হলে দেবমাহাত্ম্য কোথায়? সর্বপ্রিয় কাহিনী কাব্যে এই উপাদানটিকে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়েছে, কখনো গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেবতার কৃপায় অসাধ্যসাধন হতে পারে। সাধনার বলেও অবিশ্বাস্য ক্ষমতা লাভ করা যায়। এ ছাড়া ভৌতিক প্রসঙ্গ এই রসই পুষ্ট করে তুলত।

আধুনিক কালেও সাহিত্যে অলৌকিকের প্রবেশ নিষেধ হয়ে যায়নি। তবে প্রয়োগপদ্ধতি আর বিশ্বাসের মূল বদলে গিয়েছে। একালে অলৌকিক উপাদান সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যানের উপর নির্ভর করে ব্যঞ্জনায় রহস্যমরীচিকা সৃষ্টি করেছে। অথবা কৌতুক হাস্যের। গম্ভীর রসের রোমান্টিক গল্প মানবমনের পাপবোধ, বিবেক-দংশন কিংবা চরিত্র-দৌর্বল্যের সূত্রে অলৌকিকের স্বাদ দেয়। ভৌতিক কিছু থাকলে স্থূল বস্তুরূপে নেই, আছে ভীরুর কল্পনায় এবং অবচেতনায়। অর্থাৎ ভয় থাকতে পারেমানুষের মনে; ভয়ের কিছু নেই। এটাই আধুনিক সিদ্ধান্ত। এ-যুগের serious সাহিত্যে দেবতার এবং ভূতের স্থান নেই। ভক্তি বা সাধনার জোরে মানুষের অবিশ্বাস্য কার্যকলাপে বিশ্বাসের অবকাশ নেই।

মধ্যযুগের কাহিনী-কাব্যগুলিতে অল্লাধিক অলৌকিক উপাদান প্রায় সর্বত্র আছে। তবে তা গল্পবিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ বা মানব-রসের চ্যুতি ঘটায়নি; একটা পরিমণ্ডল মাত্র রচনা করেছে। মনসামঙ্গলে বেহুলার জীবজগৎ থেকে স্বর্গপুরী যাবার কাহিনী আছে। কিন্তু রূপে-রসে-ভাবে এই দুই লোকের এপাড়া-ওপাড়া ব্যবধান। অবশ্য মৃত লখীন্দরের জীবনলাভের ব্যাপারটি অলৌকিক সন্দেহ নেই। আর এই পুনর্জীবন-প্রাপ্তির অতিপ্রাকৃত দিয়ে চাঁদের পার্থিব দৃঢ়তাকে ভাঙতে হয়েছে কবিদের। অন্য কোন উপায় তারা পাননি। ধর্মমঙ্গলে লোহার গণ্ডার বলি দেওয়া, শালে ভর দিয়ে পুত্রবরলাভ প্রভৃতি দু-চারটি অনুল্লেখ্য ছোটখাট অলৌকিক ব্যাপার আছে। কিন্তু সাধনাবলে সূর্যকে পশ্চিমে ওঠানো নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যদিও ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর কবিরা এই অসম্ভব ঘটনার একটিমাত্র সাক্ষী রেখে বাস্তব পরিবেশ নষ্ট হতে দেননি।

নাথপন্থীদের কাহিনী-দুটিতে কিন্তু অতিপ্রাকৃতের অতিরিক্ত সমাবেশ ঘটেছে। মানববসের সঙ্গে এর সহজ ভারসাম্য গড়ে তোলা যায়নি। গোপীচন্দ্রের গানে ময়নামতী গোদাযমকে যেভাবে তাড়না করছে তাতে কৌতুহল, বিস্ময় এবং অপরিচয়ের জগৎ জড়িয়ে গিয়েছে। হাড়িপা যেভাবে তার অষ্টসিদ্ধি প্রয়োগ করেছে, তাতে ভোজবাজীর আমোদ বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু কাব্যিক আনন্দ কিছু স্বতন্ত্র বস্তু। গভীরতর ললাকে তার স্থিতি। অতিলৌকিক সেখানে ভার হয়ে উঠেছে, রস হয়ে দাঁড়ায়নি।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতে অলৌকিক উপাদান বেশি নেই। যা আছে—চণ্ডীর দেবমাহাত্ম জ্ঞাপনের সূত্র ধরে এসেছে। মুকুন্দরাম এই উপাদান ব্যবহার করেছেন প্রথানুবর্তনের মনোভাব নিয়ে। অলৌকিক রসের সহযোগে কোন অভিনব স্বাদ সৃষ্টি করতে চাননি তিনি। এবং কোথাও-মধ্যযুগে যতটা সম্ভব, বাস্তব ও যুক্তিবোধ্য। ব্যাখ্যানের মাধ্যমে অতিপ্রাকৃতকে প্রাকৃতলোকে নামিয়ে আনবার চেষ্টা করেছেন। এ কাব্যের দেবখণ্ডে পুরাণানুসরণে অর্থাৎ দক্ষযজ্ঞ প্রসঙ্গে কিছু কিছু অতিপ্রাকৃত উপাদান স্থান পেয়েছে। তা অনুকরণজাত। শিব-দুর্গার দাম্পত্য জীবনের যে মৌল চিত্র এঁকেছেন কবি তাতে অমর্ত্য রসের স্পর্শমাত্র নেই।

কালকেতুর কাহিনীতে অলৌকিক উপাদানকে বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবরূপ দিয়েছেন কবি। প্রথা থেকে প্রাপ্ত কাহিনীতে ব্যাধকে রাতারাতি রাজা করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে ছিল শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য সেখানে নৃতন নগর বসেছে। রাজ্যপাটের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। সবই দেবীর কৃপা। কবি দেবীর কৃপাটুকু রেখেছেন, কিন্তু পার্থিব কার্যকারণের যুক্তিবিদ্ধ সূত্রে অলৌকিকের বিষটুকু হরণ করেছেন।

মুকুন্দরামের চণ্ডীর অতিপ্রাকৃত শক্তি আছে। তিনি গোধার রূপ ধরতে পারেন, গোধা থেকে মুহূর্তে যোড়শীতে রূপান্তরিত হয়ে ব্যাধ-দম্পতিকে বিভ্রান্ত করতে পারেন। তাদের সংশয়হীন করবার জন্য মহিষমর্দিনীর বেশ ধরতেও তার আপত্তি নেই। কিন্তু নিষ্ঠুর ব্যাধের হাত থেকে বনের পশুদের রক্ষা করবার জন্য প্রাকৃত কুয়াশার দৃষ্টিরোধী শক্তিই একমাত্র ভরসা।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী ব্যাধকে রাজা করার অসাধ্য সাধন করলেন। কিন্তু রূপকথায় ভিখারি যেমন ঘুম ভেঙে নিজেকে সোনার সিংহাসনে দেখতে পায়, কালকেতুর ভাগ্যে ব্যাপারটি অত সহজসাধ্য হল না। মূল্যবান গুপ্তধনের সন্ধান এবং অতি মূল্যবান আঙুটি দান করেই দেবীকে নিবৃত্ত হতে হল। এ-জাতীয় ধনসম্পত্তি লাভ দুর্লভ হলেও অলৌকিক নয়।

কালকেতুকে মাণিক্য অঙ্গুরীয় ভাঙাতে হয়েছে শঠেদের সঙ্গে দরদস্তুর করে। দৈববাণী তাকে সামান্যই সাহায্য করেছে। তার নিজের চেষ্টায় যা প্রায় সম্ভব হয়ে আসছিল, দৈবোক্তি তাকে কিঞ্চিৎ ত্বরান্বিত করেছে মাত্র।

প্রাপ্ত ধনভাণ্ডার নিয়ে কালকেতুকে একান্ত লৌকিক গোলাহাটে নগরপত্তনের উপকরণ কিনতে হয়েছে। বন কেটে বসাতে হয়েছে জনপদ। বাঘ-সাপ মেরে, কঠিন পরিশ্রমে রাজ স্থাপিত হয়েছে। নূতন রাজ্যে লোক নেই। দেবীর অলৌকিক সাহায্য ব্যর্থ হল। 'স্বপনে কহেন মাতা কেহ নাহি শুনে'। লৌকিক কারণে কিন্তু জনহীন গুজরাট লোকজনে ভরে উঠল। ঝড়ে বন্যায় সব ভেসে গেল, জোতজমি, খেতের ফসল হেজে গেল। কলিঙ্গের লোক গুজরাটে উঠে গেল। কবি ঝড়বন্যা ঘটিয়ে তুলবার জন্য চণ্ডীর। তৎপরতার কথা বলেছেন। কিন্তু আসল ব্যাপারটি যে একেবারেই পার্থিব তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ধনপতির উপাখ্যানে কমলে-কামিনীর প্রসঙ্গটি নিঃসন্দেহে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার। কোন সমালোচক একে 'ocean mirage' বলে একটি বস্তুধর্মী ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। অন্তত মুকুন্দরামের কাছে ব্যাপারটি একটি অতিপ্রাকৃত বিভ্রমই ছিল। গোটা চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে যদি অতিলৌকিক রস কোথাও দানা বেঁধে থাকে তবে এই প্রসঙ্গটিকে অবলম্বন করে। এর চারপাশে একটা নিগুঢ় বিস্ময়রস বিকীর্ণ হয়েছে। তবে পুনরুক্তিতে সে-রহস্যরস বেশিক্ষণ বেঁচে থাকেনি।

ডাকিনী-যোগিনীসহ চণ্ডীর মশানযুদ্ধ বিষয় হিসেবে অতিপ্রাকৃত কিন্তু বীভৎস রসের গ্লানিতেই এর পর্যবসান।

মুকুন্দরাম অতিলৌকিকের কবি নন। মধ্যযুগের সর্বমান্য প্রথা থেকে যেটুকু এসেছে তার অনেকটাই পার্থিব সত্যবোধের পেছনে চাপা পড়েছে। পার্থিব বাস্তব-চেতনায়ই কবিকঙ্কণের শিল্পীচিত্তের মুক্তি কোন অপার্থিব রসরহস্যের সন্ধানে নয়।

১০.৩ উপন্যাসের লক্ষণ

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের জন্মপূর্ব-ইতিহাস অনুসরণ করে। বলেছেন, বঙ্গদেশের লৌকিক ধর্মসাহিত্য, ইহার চণ্ডী ও মনসার কাব্যে, বাস্তব চিত্রগুলি আরও ফুট ও প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে; অলৌকিক আখ্যানগুলি ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া কাব্যের অপ্রধান অংশে পরিণত হইয়াছে, ও কেবল অতীত ধারার সহিত যোগসূত্র অক্ষুন্ন রাখিবার উপায়মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। দেবতা মানুষের অধীন হইয়াছেন— দেবকীর্তি বর্ণনা-উজ্জ্বল বাস্তব-চিত্রের নিকট নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। এই শ্রেণীর প্রধান কাব্য মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডী'তে ফুটোজ্জ্বল বাস্তবচিত্রে, দক্ষ চরিত্রাঙ্কনে, কুশল ঘটনাসন্নিবেশে, ও সর্বোপরি, আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপনে, আমরা ভবিষ্যৎ কালের উপন্যাসের বেশ সুপষ্ট পূর্বাভাস পাইয়া থাকি। মুকুন্দরাম কেবল সময়ের প্রভাব অতিক্রম করিতে, অতীত প্রথার সহিত আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিতে, অলৌকিকতার হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।

মুকুন্দরামের কাব্যে ঔপন্যাসিক লক্ষণ প্রথমত স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তবচিত্রে; দ্বিতীয়ত, দক্ষ চরিত্রাঙ্কনে; তৃতীয়ত, কুশল ঘটনাসন্নিবেশে; চতুর্থত, আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপনে। প্রথম দুটি অন্য প্রসঙ্গে অললাচে। ঘটনাসন্নিবেশে কুশলতা তথা বিশেষ প্রবণতার কথা বর্তমান অধ্যায়েই অন্যত্র বলেছি।

কিন্তু চরিত্রচিত্রণ এবং বাস্তবরসের জোরে কবিকঙ্কণ চণ্ডী সামগ্রিকভাবেই উপন্যাসরীতির নিকটের। বিশেষ করে বাংলা পারিবারিক উপন্যাসের যে-রূপ গত শতকের তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং আরও অনেকের মধ্যে মিলেছে অস্পষ্ট হলেও তার পূর্বাভাস মুকুন্দরামের পরিবার-রসপুষ্ট কাহিনীগুলিতে আছে। আর ধনপতির প্রথম আখ্যান উপন্যাস-সাহিত্যের একেবারে দরজায় পৌঁছেছে।

কিন্তু আখ্যান ও চরিত্রের মধ্যে সম্পর্কটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই অন্য সব জাতের কাহিনী থেকে উপন্যাসের স্বাতন্ত্র; বলা চলে এখানেই উপন্যাসের প্রথম নিশ্চিত লক্ষণ। ঘটনার উপরে ঘটনা চাপিয়ে কাহিনী গড়ে তোলার পদ্ধতিটি পুরাতন। গল্পসাহিত্যের প্রথম যুগে ঘটনাগত পারম্পর্যই ছিল চরম লক্ষ্য, উপাখ্যানের ভিত্তিতে যে সমস্যা, পরিণতিতে তার সমাধান-কৌতুহলকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং তৃপ্ত করতে তাই-ই ছিল পর্যাপ্ত। মানুষের ভূমিকা ছিল, তবে ঘটনার ছকে দাবার খুঁটির চেয়ে বেশি কিছু নয়। মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হত। ব্যথা থাকত। আনন্দও। কিন্তু একটা পুরো ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের সেই তীক্ষ্নতা ছিল না যাতে তাকে বলা যায় অনন্য।

উপন্যাসের জন্ম হল সেদিনই অনন্য লোকদের কথা যখন কাহিনীর লক্ষ্য হল। শুধু গল্প নয়—ঘটনার পরে ঘটনার ইট সাজাননা নয়। স্বতন্ত্র মানুষকে প্রকাশ করা। আখ্যানে আর ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যে জড়িয়ে মিশে একাকার হয়ে গড়ে উঠল উপন্যাসের কাহিনী। পাত্রনিরপেক্ষ ঘটনার মালা নয়, একটি পাত্র বা পাত্রীর পরিবর্তন ঘটানোর ধারাও আর পূর্বপথগামী থকবে না।

কাব্যকাহিনী লিখতে গিয়েও চরিত্রে আর আখ্যানে নিগুঢ় সম্পর্কের এই রহস্যটি মধ্যযুগেই আবিষ্কার করেছিলেন মুকুন্দরাম।বিশেষ করে ধনপতি-উপাখ্যানের প্রথম কাহিনীতে এই যোগাযোগ হয়ে উঠেছে নিবিড়। ধনপতি-খুল্লনা-লহনা, এমন কি ঝি দুর্বলা—যে কারুর চরিত্রে অন্যরূপ ঘটলে কাহিনীর রূপ আর স্বাদ ঠিক পালটে যেত। ধনপতির যে ইন্দ্রিয়ালু চরিত্র-শৈথিল্য নবযুবতী খুল্লনার প্রতি তাকে আকৃষ্ট করেছিল, উজ্জয়িনীতে গিয়ে গৃহ ভুলে থাকায়ও তাই-ই তাকে প্ররোচিত করেছে। রাজার আদেশে উজ্জয়িনী যেতে হয়েছে ধনপতিকে। ঘটনা বহিরাগত চরিত্রজাত নয়। কিন্তু দীর্ঘকাল পত্মী আর সংসার ভুলে দূত আর কামক্রীড়ায় তার মগ্ন হয়ে থাকার উল্লেখ করেছেন কবি স্বল্প ইঙ্গিতে। তা ছাড়া লহনার নারীত্বের অপমান, ঈর্ষার জ্বালা, অপগত যৌবনের যন্ত্রণা পরিবার-জীবনকে সতীন কলহে দুঃসহ করে তুলেছিল। কিন্তু লহনার চরিত্রে যা ছিল তাকে জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে সদাগরের দীর্ঘস্থায়ী অনুপস্থিতি, দুর্বলার পরামর্শ। খুল্লনার মনোভঙ্গিরও যে এ বিষয়ে দায়িত্ব নেই তা বলা চলে না। ধনপতির

'খুল্লনা-দর্শন' থেকে উজ্জয়িনী-প্রত্যাবৃত্ত খুল্লনাধনপতির মিলন পর্যন্ত যে নিটোল কাহিনী গ্রন্থিত হয়েছে, তার সৌন্দর্য শুধু ঘটনাবিন্যাসের নিপুণতায় নয়, ব্যক্তি-স্বভাব আর আখ্যানের সাযুজ্য-বিধানে।

ধনপির দ্বিতীয় উপাখ্যানে গল্পবন্ধে নিবিড় নৈপুণ্য নেই, কারণ ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের উপন্যাসোচিত সংসক্তি নেই।

কালকেতু-আখ্যানের রূপটি পৃথক। কতকটা পথের মতো। সহজ মানুষের সরল রেখার মতো জীবন। মাঝে মাঝে ঘটনার আবর্তে সামান্য চাঞ্চল্য আছে। কিন্তু উপাখ্যান আর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের নিশ্চিন্দ্র বুনট রচিত হয় নি। কালকেতুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তীব্র নয় বরং অস্বচ্ছ। ফুল্লরারও। তাদের ভাগ্যের পরিবর্তনও দৈবের দান। ঘটনা সেখানে দৈবাদিষ্ট পথে চলেছে, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের উপরে তাকে নির্ভর করতে হয়নি। তাই উপন্যাসোপম গঠনভঙ্গি কালকেতুর গল্পে মিলবে না।

এই ঘটনা বর্ণনা ও সংলাপ। আখ্যান-কাব্যের গঠনভঙ্গির একটি প্রধান সমস্যা ঘটনা, বর্ণনা ও সংলাপের সামঞ্জস্য বিধান। এই তিনটি উপাদানই অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু একটা আনুপাতিক মিলন ঘটা চাই। সে-অনুপাত গাণিতিক নয় বলে সূত্র নির্দেশ করা যায় না।

আখ্যান আছে, তাই ঘটনা চাই। কাব্য বলে বর্ণনা ছাড়া সে অচল। আখ্যানকে ঘটমান (action) দেখানো এবং বিবরণের (narration) সহযোগে তাতে প্রাণসঞ্চার প্রয়োজন। আবার এ ঘটনা মানুষের বলেই নানা জনের পারস্পরিক কথোপকথন কাহিনীকে বিবরণসর্বস্ব হতে দেয় না। প্রত্যক্ষের বিভ্রম আনে। মানুষের সংলাপ ঘটনার বিবরণের চেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত।

গল্প বলার আদি যুগে শুধু ঘটনার বিবরণ ছিল। সংলাপের সঙ্গতি ছাড়া তা কত বিবর্ণ কত শীতল। ঘটনায় আর সংলাপের মিলনে গল্পবলা প্রথম আর্ট-এর পর্যায়ে উঠল। বড় শিল্পী জানেন তিনি কতটুকু নিজে বলবেন, কোথায় গল্পের মানুষদের বলতে দেবেন। এ বর্ণনার গুরুত্ব এসেছে কাব্যত্ব থেকে। আখ্যানকাব্যে গল্প বলা হলেও তা কাব্য।

ছন্দোবদ্ধ ভাষায় গদ্যের পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা-প্রাধান্য, বিশ্লেষণ তথা বস্তুনিষ্ঠা থাকা সম্ভব নয়। গদ্যের পক্ষেও তেমনি সহজ নয় কাব্যোচিত বর্ণনা, চিত্ররচনা, বর্ণসঞ্চার, ভাবাবেগের অতিরেক। সঙ্গতও নয়। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। কাদম্বরী গদ্যে লেখা। কিন্তু সে-গদ্যে কাব্যের চাল-চলন দুইই আছে। ভারতীয় সাহিত্যে আখ্যানকাব্যে বর্ণনার স্থান প্রশস্ত। বর্ণনা ঘটনার গতি মন্থর করে দেয়। ঘটনায় থাকে দ্রুততার ঝোক, বর্ণনায় মন্থরতার।

বিপরীতকে সামঞ্জস্যে বাঁধবার মন্ত্র যাঁর জানা আখ্যানকাব্যে তার সাফল্য। এখানেও নেই কোন সুনির্দিষ্ট পূর্বসূত্র। বিচিত্র পদ্ধতিতেই এই অদ্বয় রূপ লভ্য।

কবিকঙ্কণের কাব্য ঘটনাপ্রধান, বর্ণনামুখ্য নয়। এটিও প্রথা। মঙ্গলকাব্যের কবিরা ভাষাচিত্র-রচনাকে গুরুত্ব দেননি। চরিত্রের পাত্রে ভাবাবেগ অবশ্য নিবেদন করেছেন। দুঃখে-শোকে লাচাড়িতে ক্রন্দন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। বর্ণনার সুযোগ কিছু এসেছে। রূপরচনায় তাদের ব্যর্থতা প্রমাণ করে কবিদের এ ব্যাপারে আসক্তি ছিল না। আর ঘটনার তুলনায় বর্ণনার পরিমাণ সামান্য। বর্ণনার বদলে সামাজিক-পারিবারিক বিবরণ দিতে তারা অনেক বেশি উৎসাহ বোধ করেছেন। মুকুন্দরামও এ দলের একেবারে বাইরে। নন। অনেকের তুলনায় তার চিত্ররচনায় নিপুণতার ছাপ আছে। কিন্তু এ কাব্যেও বর্ণনাংশ। অল্পই। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ঘটনাই প্রধান। তবে মুকুন্দরাম প্রাত্যহিক ঘটনাসূত্রেই বেশি উৎসাহ পেতেন। ঘটনায় প্রবল তরঙ্গ-ভঙ্গের অভাব ছিল। সেকথা আগেই বলেছি। ঘটনাক্রম দ্রুত নয়। বলা যেতে পারে বেশ মন্থর। মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ দ্রুতভঙ্গি উত্তেজনা-স্তব্ধ হয়ে উঠেছে। যেমন লহনা-খুল্লনার কোন্দলে, বন্যপশুদের সঙ্গে কালকেতুর বিরোধে, মশানে চণ্ডী-কর্তৃক শ্রীপতির প্রাণরক্ষায়। কিন্তু তা স্বল্পস্থায়ী। মুহূর্তের চাঞ্চল্য ক্ষীণস্রোত দৈনন্দিনের পথ ধরেছে। এই মন্থরতা চিত্র প্রাচুর্যের ফল নয়, ঘটনা-নির্বাচনের বিশিষ্টতা থেকে এসেছে।

বিশেষ করে পুরাণ কাহিনীর বিবরণ (মাঝে মাঝে বেশ দীর্ঘ) সন্নিবিষ্ট হয়ে, তাদের। ভাষা ও বাচনভঙ্গির একান্ত বিবর্ণ শীতলতার জন্য গল্পের গতিকে আরও ধীর করে তুলেছে।

বর্ণনার সুযোগ কাব্যে বেশ কয়েকবার এসেছে। কালকেতুর নগরপত্তন, কলিঙ্গে ঝড়বৃষ্টি-বন্যা, ধনপতি-শ্রীপতির সমুদ্রযাত্রার নানান অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে, আর মশানে সঙ্গিনীসহ চণ্ডীর আবির্ভাবে। কোথাও সে-বর্ণনায় সাফল্য আছে, কোথাও নেই। কিন্তু কোথাও ক্লবি। মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত প্রাণস্পর্শহীন পদ্ধতিতে কোন উন্নয়ন সূচিত করেননি। বর্ণনা আর। ঘটনার মধ্যে কোন সাযুজ্য গড়ে তুলতে পারেননি। চণ্ডীকাব্যের মামুলি প্রচলিত পথেই তাকে চলতে হয়েছে।

কিন্তু সংলাপ রচনায় এবং সংস্থানে কবির কৃতিত্ব প্রশংসা দাবি করতে পারে। ঘটনার বিবরণ-ক্রমে যখনই দুই চরিত্রে বিরোধের ভাব এসেছে কবি তাদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে সংলাপের সূত্রে বেঁধেছেন। প্রত্যক্ষ কথাবার্তায় বিরোধের সুরটি বেজেছে, বিবরণের একঘেয়েমিতে বৈচিত্র্য এসেছে, সংঘাতের উত্তেজনায় নাট্যরস জমেছে। এরূপ পরিস্থিতি অনেকগুলিই গড়ে তুলেছেন কবি।

দেবখণ্ড ।। দক্ষ-সতীর বিতর্ক শিবের মাহাত্ম্য নিয়ে। মেনকা-গৌরীর কলহ ঘরে জামাই-মেয়ে পোষা প্রসঙ্গে। শিব-গৌরীর বিবাদ দারিদ্র্যের জন্য।

ব্যাধখণ্ড ।। কালকেতু-ফুল্লরার বিতর্ক গৃহে সুন্দরী নারী দেখে। আঙটি ভাঙাতে গিয়ে প্রথমে বেনে-পত্নী, পরে বেনে মুরারির সঙ্গে কালকেতুর বিবাদ। কলিঙ্গে বন্যাসৃষ্টি করার । ব্যাপারে গঙ্গা-চণ্ডী কলহ। ভাড়ু-কালকেতুর সংক্ষিপ্ত বিতর্ক, হাটুরেদের উপরে ভাড়ুর অত্যাচারের ব্যাপারে। বন্দী কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গরাজের কথোপকথন।

বণিকখণ্ড। খুনা-লহনার কলহ ধনপতির অনুপস্থিতিতে। ধনপতির উপস্থিতিতে তাদের আবার কলহ! বণিকদের কলহ। সদাগর-কোটালের বিবাদ সিংহলের ঘাটে। শ্রীপতির প্রসঙ্গে এর পুনরুক্তি।

মুকুন্দরাম কাহিনী-বিন্যাসের এই কৌশলটি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এর ফলে নাট্যরসের সহযোগ তার প্রায়-নিস্তরঙ্গ কাহিনীকে কতটা উপভোগ্য করে তুলেছে আমরা তা দেখব।

নাট্যরস: গীতিরসী মুকুন্দরামের এই কাব্যে নাট্যরসের সুযোগ বেশি নেই। কারণ ঘটনার প্রবল উত্তেজনা এর কোন আখ্যানেই উতরোল হয়ে ওঠেনি। যেখানে কিঞ্চিৎ সুযোগ আছে সেখানেও কবি-প্রাণের উল্লাসে তা শিল্পরূপে ধন্য নয়।।

তিনটি কাহিনীর মধ্যে যথার্থ বিরোধ-কেন্দ্রিক বৃত্তাকার নাটকীয় সংহত রূপ আছে। ধনপতির প্রথম আখ্যানে। নাট্যোচিত দ্বন্দ্বে কেন্দ্রীভূত এই কাহিনীর সামগ্রিক স্বাদে যে। পূর্ণত, অপর দুটি আখ্যানে তার অভাব। কিন্তু সে-অভাব পূরণ করার চেষ্টাও আছে খণ্ড খণ্ড বিরোধমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বিবরণবিচ্যুত শুদ্ধ সংলাপমুখে তাকে স্ফরিত করায়।

আখ্যানকাব্যে, মহাকাব্যে বা একালের উপন্যাসে সংলাপ সর্বত্রই থাকে, কিন্তু লেখকের ব্যাখ্যান-বর্ণনার সঙ্গে জড়িত হয়ে। নাটকীয় সংলাপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ব্যক্তির মুখশ্রী সেখানে পূর্ণ প্রতিবিম্বিত। উপন্যাসের সংলাপের ভাষায়, সুরে এর কিছু থাকলে তা বাড়তি লাভ। কাব্যেও। মুকুন্দরাম সোজাসুজি বিরোধ-ঘটনার দুই ধারে দুই পক্ষকে দাঁড় করিয়ে নিজে সরে গিয়েছেন। এদের কথা ব্যাখ্যাবিদ্ধ থাকেনি। এ সংলাপ স্বয়ংপ্রকাশ।

বিরোধপ্রসঙ্গ ছাড়া অন্যত্র সংলাপে নাট্যভঙ্গির তীক্ষ প্রত্যক্ষতা নেই।

পারস্পরিক কথোপকথনের সুযোগটির ব্যবহারে দুটি ভিন্ন রীতি অনুসরণ করেছেন কবি। ফলও ভিন্ন। কয়েকটি ক্ষেত্রে পুরো একটি পদ—অর্থাৎ একটি গোটা কবিতা জুড়ে একজনেরই কথা। পরের একটি কবিতায় প্রতিপক্ষের জবাব। জবাব তথা অভিযোগও। কিন্তু বেশির ভাগই একটি কবিতায় দু-চার পংক্তি একের, পরের দু-চার পংক্তি অপরের কথা। প্রথম রীতি, দ্বিতীয়ের তুলনায় কিছুটা বিলম্বিত লয়ের। নাট্যরসের জগতে দ্বিতীয় পন্থার নিশ্চয়ই জয়।

দক্ষের শিবনিন্দা থেকে উদাহরণ নেওয়া যাক। সতী যজ্ঞপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করে দক্ষকে রূঢ় কণ্ঠে অভিযুক্ত করল শিবকে নিমন্ত্রণ না করার জন্য। সেই অভিযোগ বারো পংক্তিতে দীর্ঘায়িত।

শুন বাপা তোমারে এ করি অভিমান।

সতী ঝির প্রতি কেন টুটিল সম্মান ।।

ধর্ম আদি তোমার যতেক বন্ধুগণ।

সবারে আসিতে যজ্ঞে দিলা নিমন্ত্রণ ।।

শিবে নিমন্ত্রণ নাহি কর কি কারণে।

সম্পদে মাতিয়া বুঝি না দেখ নয়নে ।।

ব্রহ্মা যার সতত বাঞ্ছয়ে পদধূলি।

আপনি কমলাপতি করেন অঞ্জলি।।

অন্য জামাতারে দিলে বস্ত্র অলঙ্কার।

শিব প্রতি ভাল নহে তব ব্যবহার ।।

দারুণ দৈবের ফলে আমি তব ঝি।

না করিলে ভাল কর্ম নিবেদিব কি ।।

এ অভিযোগে বেদনা আছে, অভিমান আছে, চাপা উত্তাপ আছে। এখনও তা ক্রোধে বিস্ফোরিত নয়। দক্ষের কাছ থেকে স্পষ্ট ও বিস্তৃত উত্তরের অপেক্ষা আছে। দক্ষের উত্তরও দীর্ঘ। তাতে শিবের অভব্য আচরণ, অনার্য বেশবাসের কথা আছে, আর আছে ব্যক্তিগত অপমানের জ্বালা। চব্বিশ চরণ জুড়ে এই শিবনিন্দা চলেছে। পরের আঠারো চরণে সতীর উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ। উত্তাপ এবারে আর চাপা নেই, উত্তেজনায় ভেঙে পড়েছে। এবং এর পরিণতি সতীর তনুত্যাগ।

সতী এবং দক্ষের সংলাপ-বৈপরীত্যের ভিত্তিতে আছে সুকঠিন দ্বন্দ্ব। কিন্তু যেখানে দ্বন্দ্বের ভাব গুপ্ত, সেখানে দীর্ঘ বিতানিত কথাবার্তায় নাটকের সুরটি ঠিক বাজেনি। ফুল্লরা-চণ্ডীর কথোপকথনে কৌতুকরস আস্বাদ্য, সংঘাতজনিত নাট্যরস নয়। কারণ, এদের প্রত্যেকের সংলাপই দীর্ঘ এবং নিজ মনোভাবটি আবৃত করার চেষ্টায় ঠিক

আক্রমণোদ্যতও নয়। কিন্তু প্রত্যেকের সংলাপ যেখানে সংক্ষিপ্ত সেখানে দ্রুততাল সংঘাতের রস অনেক বেশি প্রকাশিত।

উনিশের শতকে নবীনচন্দ্র সেন তার একাধিক কাব্যে স্থানে স্থানে বর্ণনা-বিবৃতি বাদ দিয়ে পাত্রপাত্রীদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন সংলাপে। কিন্তু তার একটি কাব্যেও এই পদ্ধতি নাট্যরস সৃষ্টি করেনি। নবীনচন্দ্রের চরিত্রগুলি বক্তৃতা দিয়েছে, তত্ত্বকথা বলেছে। প্রবৃত্তির আলোড়ন বিপরীতমুখী মনোভাবের উত্তাপজাত নয় বলে তাদের সংলাপে বর্ণৌজ্জ্বল্য নেই, নাট্যতীক্ষ্ণতা নেই। মুকুন্দরামের সংলাপে চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব প্রাণবন্ত হয়ে আছে। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন বাস্তব জীবন থেকে বিন্দুমাত্র অনুরঞ্জন ছাড়াই কবি তাদের সাহিত্যের পাতায় স্থান দিয়েছেন, মায় তাদের মুখের ভাষা সমেত।

তবে গৌরী-মেনকার কলহ এবং হর-গৌরীর কোন্দলে সংলাপ অনেকটা রৈখিক। মেনকার ভৎর্সনা, গৌরীর উত্তরে প্রতি-ভৎসনা। অলস হরের ভোজনবিলাসিতা এবং উত্তরে গৌরীর অনুযোগ। এর চেয়েও নাট্যরস ঘনীভূত যেখানে দুয়ের সংলাপ পারস্পরিক।

১। কালকেতু।

শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা।

কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা।

ফুল্লরা।

সতাসতিন নাহি প্রভু তুমি মোর সতা।

ফুল্লরারে এবে হৈল বিমুখ বিধাতা।

কি দোষ দেখিলা মোর জাগ্রত স্বপনে।

দোষ না দেখিয়া কর অপমান কেনে।

কি লাগিয়া প্রভু তুমি পাপে দিলা মন।

যেই পাপে নষ্ট হৈল লঙ্কার রাবণ ।।

আজি হৈতে বিধাতা হইল মোরে বাম।

তুমি হৈলা রাবণ বিপক্ষ হৈল রাম।

পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।।

কাহার সোড়ষী কন্যা আনিয়াছ ঘরে।।

বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।

আখেটির ঘরে শোভা পাইবে উর্বশী।

শিয়রে কলিঙ্গ র বড়ই দুর্বার।

তোমারে বাধিয়া জাতি লইবে আমার।।

....

কালকেতু। পরস্ত্রী দেখিয়া যেন নিদয়া জননী।

সুব্যক্ত করিয়া বা কহ সত্য ভাষা।

মিথ্যা হৈলে চিয়াড়ে কাটিব তোর নাসা।

২। মুরারি।। সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।

ঘষিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল।

রতি প্রতি হইল বীর দশগণ্ডা দর।

দুধানের কড়ি আর পাঁচ গণ্ডা ধর।

অষ্টপণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।

মাংসের পিছিলা বাকী ধরি দেড় বুড়ি।

একুণে হৈল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি।

চাল ক্ষুদ কিছু লহ কিছু লহ কড়ি।

কালকেতু। [বীর বলে | কিবা আমি দেখেছি স্বপন।

অঙ্গুরী সমান মিথ্যা সাতঘড়া ধন ।।

[কালকেতু বলে] খুড়া মূল্য নাহি পাই।

যেজন অঙ্গুরী দিল দিব তার ঠাই।

মুরারি।। [বেণে বলে] দরে বাড়াইলাম পঞ্চবট।

আমার সঙ্গে সওদা কর না পাবে কপট ।।

ধর্মকেতু ভায়া সঙ্গে ছিল লেনাদেনা।

তাহা হৈতে দেখি বাপা বড়ই সেয়ানা।।

কালকেতু। [কালকেতু বলে] খুড়া না কর ঝগড়া।

অঙ্গুরী লইয়া আমি যাই অন্যপাড়া।

মুরারি। [বেণে বলে] দরে বাড়াইলাম আড়াই বুড়ি।

চাল ক্ষুদ না লইও গুণে লও কড়ি ।।

৩। চণ্ডী। সাধিতে আপন কাম আইনু তোমার ধাম

সহিবে আমার কিছু ভার।

প্রাণের বহিনী গঙ্গে চলহ আমার সঙ্গে

হাজাও রাজ্য কলিঙ্গ রাজার।

গঙ্গে সন্তাপ করহ মোর দূর।

হইয়া উন্মত্ত বেশ হাজাবে কলিঙ্গ দেশ

তবে বৈসে গুজরাটপুর।

গঙ্গা। হই গো বিষ্ণুর দাসী বিষ্ণুপদ হইতে আসি।

সেই প্রভু গতি সবাকার।।

হই গো বিষ্ণুর অংশা করে নাহি করি হিংস

কেন রাজ্য হাজাব রাজার।

দিদি পরপীড়া দেখি লাগে ভয়।।

পরের দেখিয়া দুঃখ হই আমি অশ্রুমুখ।

বড় হই সদয় হৃদয়।

চণ্ডী। কুম্ভীর মকরগণ প্রাণী হিংসে অনুক্ষণ ।

কি কারণে ধর তারে কোলে।

মহাপাপ যার গায় সে পাপী তোমাতে নায়

বৈষ্ণবী তোমারে কেবা বলে ।।

গঙ্গা গরব না কর মোর আগে।

আসিয়া তোমার নীরে বালিঘট করি মরে

সেই বধ তোমারে ত লাগে।

গঙ্গা। দুর্গা তার বধে মোর নাই দায়।

পূর্বের করম ফলে আসিয়া আমার জলে

প্রাণ ত্যজে আপন ইচ্ছায় ।।

ছাগল মহিষ মেষ খেয়ে কৈলা অবশেষ

নীচ পশু নাহি ছাড় বরা।

স্ত্রী হয়ে করিলা রণ মারিলা অসুরগণ

এ সমরে করিলা পান সুরা ।।

চণ্ডী। তোরে আমি ভাল জানি পিয়েছিল জহ্নুমুনি

তব জল নাহি করি পান।

কোন মড়া পোড়ে কূলে কোন মড়া ভাসে জলে

শ্মশানে তোমার অধিষ্ঠান ।

ছাড় গঙ্গা আপন বড়াই।

উচিত বলিব যদি তোমার সমান নদী।

ভুবনে তুলনা দিতে নাই।

৪। কলিঙ্গ নৃপতি।

কোন্ দেশে নিবাস বৈসহ কোন্ গ্রাম।

তোমার দেশের রাজা তার কিবা নাম।

কবা তথা মহাপাত্র কেবা অধিকারী।

এত তেজ ধর ব্যাধ কার আজ্ঞা ধরি।

আমারে না মান বেটা হইল প্রবল।

অচিরাতে পাবে তুমি তার প্রতিফল

কালকেতু। [বীর কহে] গুজরাটে নিবাস চণ্ডীপুর।

আমার দেশের রাজা মহেশ ঠাকুর।

আমি তথা মহাপাত্র চণ্ডী অধিকারী।

তার তেজ ধরি আমি তার আজ্ঞাকারী।

অবিচার করি রায় মোরে কর রোষ।।

পরিণামে জানিবা ব্যাধের নাহি দোষ।

এর পরে কলিঙ্গরাজ এবং কালকেতু এইরূপ ছয় চরণ করে প্রত্যেকে দুবার তর্কবিতর্ক করেছে।

চারটি কাব্যাংশের কিছু বিস্তারিত উদ্ধৃতি দেওয়া হল উদাহরণ হিসেবে। কারণ এদের বিশ্লেষণ করলে নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য মুকুন্দরাম কি ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

১নং উদাহরণ। স্বল্পভাষী কালকেতুর কঠিন পৌরুষ এবং কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের বিপরীতে স্থাপিত হয়েছে ফুল্লরার ভৎসনায়-অপমানবোধে-আতঙ্কে-প্রেমে ব্যাকুল ও উদ্বৃত -অশ্রু বাক্-বিন্যাস।

২নং উদাহরণ। এটি ভিন্ন জাতের। কালকেতুর কথায় সংক্ষিপ্ত ও একাগ্র প্রয়োজনমুখিতা এখানেও লক্ষ্য করবার মতো। সংলাপের এই বৈশিষ্ট্যে তার ব্যক্তিত্বই প্রতিবিম্বিত। কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক মুরারি শীলের কথার ভাব, ভাষা ও ভঙ্গি। কয়েকটি মাত্র কথায় তার চরিত্র সম্পূর্ণ ধরা পড়েছে। মুরারি কালকেতুকে যত ঠকাতে চায় ততই কাজের কথার চারপাশে ছলনাভরা পল্লবিত বাক্য যোজনা করে বেশি করে। তার বহুভণিতাযুক্ত ছলনা কালকেতুর অল্প কথার দৃঢ়তায় প্রতিহত হয়ে ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসতে থাকে। মুকুন্দরাম কৌতুকের সঙ্গে শঠ বণিকের ক্রম-সঙ্কুচিত সংলাপের ধারাটি লক্ষ্য করেছেন। সংলাপের এই আকারগত সঙ্কোচ তার শঠবুদ্ধির অতিবিস্তারের ক্রমিক পরাজয় সার্থকভাবে সূচিত করেছে।

৩নং উদাহরণ। একটি আদর্শবাদী বিতর্কে আরম্ভ হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের সন্ত্রাসবাদী দেবীর আদর্শ এবং গঙ্গার বৈষ্ণবী বোধে বিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু শুধু ধর্মাদর্শের বিরোধ হয়ে থাকলে এই কাব্যাংশ নেহাতই শুষ্ক ও প্রাণহীন হয়ে পড়ত। মুকুন্দরাম কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে একে পুরোপুরি অন্যের ব্যক্তিগত দোষ আবিষ্কারের গ্রাম্য কলহ এবং প্রায় উচ্চকণ্ঠ গালাগালির স্তরে নিয়ে গিয়েছেন।

৪নং উদাহরণ। এটি শিল্পচ্যুতির নিদর্শন। কালকেতুর মুখে যে মার্জিত বাক-বৈদগ্ধ্য প্রকাশ পেয়েছে কলিঙ্গরাজের অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে তা মোটেই চরিত্রানুগ হয়নি। ভারতচন্দ্র এই জাতীয় উত্তরকেই আরও বক্র, আরও প্রসাধিত করে রসান চড়িয়ে সুন্দরের মুখে বসিয়েছিলেন। সে তার যোগ্য স্থান। তবে মুকুন্দরামে এ জাতীয় ব্যর্থতার উদাহরণ বেশি নেই।

সংলাপে বিরোধী ভাব ও প্রবৃত্তির সংঘর্ষে নাট্যরস ঘনীভূত করে তোলায় মুকুন্দরাম মূলত সাফল্য লাভ করেছেন। মুকুন্দরামের নাট্যঘন সংঘাত-সংলাপ প্রায়ই পারিবারিক কলহের রূপ নিয়েছে। অন্তত পরিবারজীবনের নিকটে দ্বন্দ্বাত্মক পরিবেশ সৃষ্টি করতে গিয়েই কবি সার্থক হয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খুল্লনালহনার বাক-বিতণ্ডা। লহনার ছলনামূলক সহানুভূতি দেখানোয় এর আরম্ভ, দুই সতীনের মারামারিতে এর পরিণতি। দুজনের মনোভাবের স্বাতন্ত্র এবং পরিবর্তনের ক্রমটি কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই শুধু সংলাপে আশ্চর্য নিপুণতায় ধরে রেখেছেন কবি। নকল চিঠি নিয়ে লহনা প্রথম কপট কান্না জুড়ে দিল। খুল্লনা এই কান্নাকে আন্তরিক বলে জেনেছিল। চিঠির হস্তাক্ষর দেখে সে লহনাকেই নিশ্চিত করতে চাইল।

খুল্লনা।

খুল্লনা বলেন দিদি নাহি গো তরাস।

কে মোরে লিখিয়া পাতি করে উপহাস।

প্রভুর অক্ষর নহে দেখি ভিন্নছন্দ।

কেবা এ লিখিল পত্র করিয়া প্রবন্ধ।

কৌশল ধরা পড়েছে দেখে লহনা ছদ্ম আন্তরিকতার মুখোশ ছিড়ে ক্রমে বেরিয়ে এসেছে।

লহনা। প্রভুর আজ্ঞায় পত্র যদি লিখে আন।

তবে কি করিতে পারি আমি অল্পজ্ঞান।

কত কত জন আছে প্রভুর সকাশে।

আনিলেক এই পত্র প্রভুর আদেশে।

প্রভুর শাসন তোর এই আইল পাতি।

কাননে চরাহ ছেলি পর খুঞা ধুতি।

লহনা এখনও 'প্রভুর আদেশে'র অন্তরালে নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ আড়াল করে রেখেছে। কিন্তু খুল্লনা তীক্ষ্ণবুদ্ধি তরুণী। লহনার অভিসন্ধি বুঝতে তার বাকি রইল না। সে ভাবল, যে ধনপতি মাথার ময়ূরী করে তাকে এনেছে, সে বিনা অপরাধে তার শাস্তির ব্যবস্থা করবে কেন? তার গলার সুর বদলে গেল, এমন কি আর 'দিদি' সম্ভাষণও রইল না।

খুলনা। কতবা দেখাও মোরে এ গৃহিণীপনা

আপনা লইয়া তুমি থাক, লো লহনা।

লহনা। তুই অলক্ষণা লো খুল্লনা পাপিনী।

কোন পাপক্ষণে আইলি দারুণী।

সোজাসুজি ঝগড়া বেধে গেল এইবার। চিত্র হিসেবে এটি জীবন্ত। নাট্যচিত্র হিসেবেও। সংলাপের দ্বন্দ্ব ছাড়া, প্রত্যক্ষ ঘটনাগত সংঘাতের চিত্রও কিছু আছে। যুদ্ধ প্রসঙ্গগুলি রচনা হিসেবে সার্থক নয় বলেই নাট্যরসের দিক থেকে তাৎপর্যহীন। দক্ষযজ্ঞের প্রসঙ্গও পুরাণানুসরণ মাত্র। লহন-খুল্লনার মারপিটের চিত্রটিই উল্লেখযোগ্য, অবশ্য আরও বেশি করে কবির কৌতুকহাস্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে।

মুকুন্দরাম স্বভাবত গীতিধর্মী কবি ছিলেন না। কিন্তু কিছু গীতি-উপাদান চণ্ডীমঙ্গলে আছে। আখ্যানকাব্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি এর প্রধান উদ্দেশ্য হতে পারে। সাধারণভাবে বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের ভাবপরিমণ্ডলের প্রভাব রূপেও এই ব্যাপারটিকে গণ্য করা যায়। দ্বিজ মাধবও 'বিষ্ণুপদ' নাম দিয়ে কিছু কৃষ্ণ-বিষয়ক কবিতা যোগ করে আখ্যানকে বিশেষ স্বাদ দিতে চেয়েছিলেন। পরের যুগে ভারতচন্দ্রও প্রতি অধ্যায়ের

গোড়ায় ভক্তিরসাত্মক গান যোগ করে বোধ হয় একই লক্ষ্যভেদ করতে চেয়েছিলেন সুরবৈচিত্র্য। স্বাদ-বৈঠর লক্ষ্য। মুকুন্দরাম কাহিনীকাব্যের আঙ্গিকে বিচ্যুতি না ঘটিয়ে গীতিউপাদান। ব্যবহার করেছেন। দ্বিজ মাধব, ভারতচন্দ্রের কাব্যে গীতিকবিতাগুলি আখ্যানের অংশ হয়ে ওঠেনি। মুকুন্দরাম কিন্তু কবিতাগুলিকে কাব্যের ও চরিত্রের অচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তুলেছেন।

ধনপতির বিরহে বসন্ত-সমাগমে খুল্লনার কণ্ঠে এই গানগুলি কবি বসিয়েছেন। ছয় ঋতুর প্রায় প্রথামাফিক বর্ণনা দিতে দিতে বসন্তের অশোক-কিংশুক-পলাশ-কাঞ্চনের রক্তবর্ণ সমারোহে কাম-সেনাপতিকে দেখেছেন। এবং পাঁচটি গানে খুল্লনার বিরহ-বিধুর চিত্ত এ বিগলিত হয়ে পড়েছে। কবিতা পাঁচটি হল-

১. বসন্ত-আগমনে খুল্লনার খেদ।

২. সারীশুকের প্রতি খুল্লনা।

৩. তরুলতার খুল্লনা।

৪. কোকিলের প্রতি খুল্লনা।

৫. ভ্রমরের প্রতি খুল্লনা।

খুল্লনার যে-রূপ কাব্যারম্ভে দেখেছিলাম প্রেমকাহিনীর নায়িকা হিসেবে, সতীনএবং মাঠে-ঘাটে-বনে ছাগপাল নিয়ে ভ্রমণ করায় তার উপরে ঘন আবরণ পড়েছে। যে নারীরূপ প্রায় ভুলে যাবার মুখে, কয়েকটি প্রেম-বেদনার গানে তাকে জা তুলেছেন কবি। এই ‘লিরিক আবেদন কাব্যের স্বাদ বাড়িয়েছে, বৈচিত্র্য এনেছে সুমিত পরিমাণের জন্য আখ্যানঘটিত বিশিষ্ট আঙ্গিকের হানি করেনি।

নানা দিক থেকে কাব্যদেহ-গঠনে মুকুন্দরামের বৈশিষ্ট্যের যে-পরিচয় নেওয়া তাতে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে কবি প্রথাবদ্ধ একটি কাহিনী-রূপকে সতেচন শিল্পনৈ নবীন করে তুলেছেন। প্রথার আগাছা সরিয়ে সে-স্বাদ গ্রহণ করতে হয়।

১০.৪ হাস্যরস

হাসি মানবজীবনের এক দুর্লভ সম্পদ। যে মানুষ প্রাণ খুলে হাসতে পারে না তাকে সুস্থ্য পদবাচ্যে ভূষিত করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধ গ্রন্থে কৌতুক হাস্যের মাত্রা নির্ণয় করতে গিয়ে অসঙ্গতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আসলে মানুষের কার্য, আচরণ এবং চরিত্র সম্পর্কে আমাদের একটা স্বীকৃত ধারণা বা সংস্কার থাকে। যখনই সেই ধারণা বা সংস্কারের অন্যতম অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিক কিছু দেখি তখনই আমাদের স্নায়ুতন্ত্র কৌতুকের আবেগে আলোড়িত হয়। অন্যের বিকৃতি এমনকি সামান্য দুঃখ মনে হাসির উদ্রেক করে। সাধারণত হাসির কয়েকটি শ্রেণির পরিচয় আমরা পাই। যেমনWit, Satire, Irony, Huinour, Fun wit হল সূক্ষ্ম বুদ্ধি গ্রাহ্য হাস্যরস, Satire—হল নির্মল কৌতুক, Irony-হল তীব্র শ্লেষ, আর Humour—হল নির্মল হাসি, Fun ভাঁড়ামী বা স্থূল কৌতুক। Humour সৃষ্টির জন্য প্রতিভার প্রয়োজন হয়! হাস্যরসের উপরিউক্ত বিভাগগুলি মাথায় রেখে আমরা মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের হাস্যরস আলোচনা করব।

বন্দনাখণ্ডের হাস্যরস-- দেবতার মাহাত্ম কীর্তনের জন্য কাব্য রচিত বলে তার মধ্যে অলৌকিকতা তো থাকবেই তার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে এসে যায় সমাজ বাস্তবতার ছবি ও হাস্যরস। কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি এই ধরনেরই এক কাব্য। এই কাব্যের বিভিন্ন খণ্ডের তিনি সমাজ বাস্তবতার ছবি ও হাস্যরসের ধারাকে সমানভাবে প্রবাহিত করেছেন। প্রথমেই আসা যায় 'বন্দনা-খণ্ড'র কথায়। এই অংশে 'গণেশ বন্দনা', 'সূর্য বন্দনা', সরস্বতী বন্দনা, মহাদেব বন্দনা', লক্ষ্মী বন্দনা', 'শ্রীরাম বন্দনা, চণ্ডী বন্দনা', শুকদেব বন্দনা', 'শ্রীচৈতন্য বন্দনা, দিগ বন্দনা, ও প্রার্থনা আছে। হাস্যরসের তেমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

চণ্ডীমঙ্গলে কাব্যের দ্বিতীয় অংশ হল গ্রন্থেপত্তির কারণে কবি তাঁর দুঃখে হাসির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে জীবনের দুঃখকে লঘু করে দেখিয়েছেন। তিনি যখন তাঁর দেশ ছেড়ে চলে আসেন তখন রাস্তায় স্ত্রী ও শিশু সন্তানকে নিয়ে চরম কষ্টের মধ্যে পড়েছিলেন। শিশুর খাবার তিনি জোগাড় করতে পারেন। নি। তাই বলেন

"তৈল বিনা কৈল স্নান করিলু উদক পান

শিশু কাঁদে ওদনের তরে।"

আরও বলেছেন

'উজির হৈল রামজাদা পরিয়ে দেয় খেদা

ব্রাহ্মণ-বৈপবের হল্য অরি।।

মাপে কোনে দিয়া দড়া পনের কাঠায় কুড়া।

নাহি শুনে প্রজার গোহরি।।

সরকার হইল কাল খিলভূমি লেখে লাল

বিনা উপকারে পায় ধুতি।

পোদ্দার হইল যম টাকা আড়ই আনা কম

পাই লভ্যলয় দিন প্রতি।"

তিনি দেবী চণ্ডীর স্বপ্ন দেখে 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন—

"চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।

নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ব।

আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।"

দেখণ্ডের হাস্যরস – চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় অংশ হল 'দেবখণ্ড। এখানে দেব-দেবীদের জীবন চিত্র বর্ণিত হয়েছে। সতী পিতা দক্ষ তাঁর মত অনুষ্ঠানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আমন্ত্রণ জানালেও কন্যা সতী ও জামাতা শিবকে নিমন্ত্রণ জানান না। সতী এই খবর শুনে পিত্রালয়ে যেতে চায়, শিব প্রথমে অনুমতি না দিলেও শেষে অনুমতি দিলে সতী দক্ষালয়ে আসেন। এখানে তিনি পতি শিবের নিন্দা শুনে দেহত্যাগ করেন। এরপর তিনি পুনরায় পার্বতী রূপে হিমালয় ও মেনকার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন; এবং নারদের

প্রচেষ্টায় শিবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহ সভায় শিবের পোষাক হাস্যরসের সৃষ্টি করে--

“চরণে নূপুর সর্প সাপ কটিবন্ধ।।

অঙ্গদ রলয়া সাপ সাপের পই।

গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো।

•••••••••••••••••••••••••••••

শিবের রূপ ও বেশভূষা ও সঙ্গী সাথীদের দেখে ঘটক নারদকে মেনকা বলে—

“ওরে বুড়ো আঁটকুড়া নারদ অল্পেয়ে .

তব হেন বর কেমনে আনিলে চক্ষু খেয়ে।”

তারপর শিবের মোহন রূপ দেখে সমস্ত নারীগণ তাদের পতিদের নামে নিন্দা করে বলে ,

‘আর যুবতী বলে সখি মোর পতি কালা।

দিনে ঠারেঠোরে কহি কথা পতির সনে।

এ রন্ধনের তরে আমি যদি চাহি জল।

সব দড়ি ধরা এনে দেয় কালা মোর ছাগল

আর যুবতী বলে সখি মোর কথা শুন।

চিৎ হয়্যা শুতে নারে কুজের প্রকারে।

পার্বতীর স্বামীকে দেখে অন্যান্য নারীদের পতিদের ত্রুটি সম্পর্কে নিন্দা হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। বিবাহের পর পার্বতী হিমালয়েই থেকে যায়। জামাতা কিছু করে না। অথচ তাঁর এবং সঙ্গীসাথীদের উপদ্রবে মেনকা অতিষ্ট হয়ে বলে—

“দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘ ছাল!

প্রেত ভূত পিশাচ মিলিল তার সঙ্গ।

রান্ধি বাড়ি আমার কাকাল্যে হইল বাত।

লোক লাজে স্বামী মোর কিছু নাহি কয়।।

……………………

ঘরে জামাই রাখিয়া জোগাব কত ভাত।।”

এই কথা শুনে পার্বতী বলে—

“রান্ধিয়া বাড়িয়া মাতা কত দেহ খোটা।

আজি হইতে তোমার দুয়ারে দিনু কাঁটা।”

সংসারের অন্নাভাব অথচ খাবারের ফর্দ শুনে পার্বতী যে উত্তর দিয়েছে তা হাস্যরসের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়—

“রন্ধন করিতে ভাল বলিলে গোঁসাই।

প্রথমে যে দিব পাতে তাই ঘরে নাই।

আজিকার মত যদি বান্ধা দেহ শূল।

তবে যে আনিতে পারি প্রভু হে ভণ্ডুল।

এমন শুনিয়া শৈলিসুতার ভারতী।

রোষযুত হইয়া বলেন পশুপতি।।”

আবার, শিবের কটুক্তি শুনে পার্বতী বলেন—

“কি জানি তপের ফলে বর মিলেছে হর।

পাড়া পড়শী নাহি আসে দেখি দিগম্বর।

বাপের সাপে পোয়েব ময়ূর সদা করে কেলি।

গণার মুষায় কাটে ঝুলি আমি খাই গালি ।।

বাঘ বলদে দ্বন্দ্ব সদা নিবারিত কত।

অভাগীর কপাল দারুণ দৈবহত।।

ময়ূর মুষায় দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্বি সদাই কন্দল।

ওই নিমিত্তে সদা গালি মোর কর্ম ফল।”

পার্বতীর দুঃখ শুনে তার সখি পদ্মার উপদেশ শুনে মর্তে পূজা প্রচারের জন্য পাবর্তী উদ্যোগী হয়ে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে কালকেতু ও তাঁর পত্নী ছায়াকে ফুল্লরা রূপে অভিশাপ দিয়ে মর্ত্যে পাঠায়। এখান । থেকেই আখেটিক খণ্ডের শুরু।

আখেটিক খণ্ডের হাস্যরস --- সোমাই পণ্ডিতের ঘটকলিতে, ধর্মকেতুর পুত্র কালকেতুর সঙ্গে ফুল্লরার বিবাহ হয়। কালকেতুর যোগ্য পাত্রী পেয়ে ঘটক ফুল্লরার বাবাকে বলে—

“সেই বর যোগ্য কন্যা তোমার ফুল্লরা।

খুঁজিয়া পাইল যেন হাঁড়ির মত সরা।।”

কালকেতুর বিবাহ’সভায়ও হাস্যরস দেখতে পাওয়া যায় ।

“কেহ আগাইয়া বীরে গুড় চাউলী মারে।

গুয়া কাটায় হৈল গণ্ডগোল।

সমুখে দেউটি জ্বলে হাস্যকথা কুতুহলে

কহে যত বরযাত্রিগণ।”

ভোজন অংশে হাস্যরসের রূপটি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠেছে—

“মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বান্ধিলেন ঘাড়ে।

একশ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে।

চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ।

ছয় হাড়ি মুসুরী সুপ মিশ্যা তথি লাউ।

ঝুড়ি দুই-তিন খায় আলু ওল পোড়া।

কচুর সহিত খায় করঞ্জা আমড়া।”

কালকেতু শিকার করে আর ফুল্লরা সেই মাংস হাটে বিক্রি করে। দেবী চণ্ডী একদিন গোধিকার রূপ ধারণ করে কালকেতুর সঙ্গে তার বাড়িতে এসে হাজির হয়। ফুল্লরার স্বর্ণ গৃহে চণ্ডী অপরূপ সন্দুরী। রমণীর রূপ ধারণ করে আর তাকে দেখে ফুল্লরা স্বামীকে বলে—

“পিপীড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে।

কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে।।

বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।

আখেটির ঘরে তোমার পাইবে উর্বশী।”

এরপর চণ্ডী তার নিজ মূর্তি ধারণ করে কালকেতুর সততায় প্রফুল্ল হয়ে তাকে সাতঘড়া ধন ও একটি অঙ্গুরী দান করে। এই অঙ্গুরী দেখে ফুল্লরা কালকেতুকে বলে

“একটি অঙ্গুরী নিলে হবে কোন কাম।

সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম।

এই অঙ্গুরীর মূল্য সাত কোটি তঙ্কা।

ফুল্লরা শুনিয়া মূল্য মুখ কৈল বাঁকা ।।

এই উক্তি থেকে ফুল্লরার অর্থ সম্পর্কে বাস্তবিক জ্ঞান ফুটে উঠতে দেখা যায়। অঙ্গুরীনিয়ে কালকেতু মুরারী শীলের কাছে বিক্রি করতে গেলে মুরার শীল বলে। -

“সোনারূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।

ঘষিয়া মজিয়া বাপু করেছে উজ্জ্বল।

রতি প্রতি হৈল বীর দশ গণ্ডা দর

দুই যে ধানের কড়ি পাঁচ গণ্ডা ধর।

দেবী প্রদত্ত মাণিক্য অপরী বিক্রির জন্য বণিক মুরারী শীলের নিকট কালকেতুর আগমন,তার সাড়া পেয়ে মাংসের দাম বাবদ দেড়বুড়ি' দেনা শোধ করার ভয়ে মুরারী শীলের ঘরের ভিতর গিয়ে লুকিয়ে থাকা,মুরারী পত্নীর নানা মিথ্যা কথা বলে, শেষে কালকেতুর গহনা আছে জানতে পেরে মুরারী শীল খিড়কীর পথে বেরিয়ে আবার কালকেতুর সামনে আসা এবং তার প্রতি কপট স্নেহপূর্ণ কথা বলা, কালকেতুর মাণিক্য অঙ্গুরীকে ভাঙা পিতল বলা, মুখে মুখে তার দাম হিসাব করে সামান্য মূল্য ধার্য করা-- সব কিছুর 'অসঙ্গ তির মধ্যেই হাস্যরস সৃষ্টির উদাহরণ। কালকেতু দেবীর প্রদত্ত ধন নিয়ে গুজরাট নগর পত্তন করে। "গঙ্গার সহিত ভগবতীর কলহ' অংশে হাস্যরস দেখা যায় "তোমার না করি জল পান।"আখেটিক খণ্ডে' ভাঁড়ু দত্তের আবির্ভাব' অংশে সবথেকে বেশি হাস্যরস পাওয়া যায়। ভাঁড়ুর পোষাকও যেমন বিচিত্র তেমনি তার উপহারও বিচিত্র

"ভেট লয়্যা কাঁচকলা পশ্চাতে ভাড়ুর শালা ।

আগে ভাঁড়ু দত্তের পয়ান।

ভালে ফোঁটা মহাদম্ভ ছেঁড়া ধুতি কোঁচা লম্ব

শ্রবণে কলম খরশান।।"

আরও বলে-

"আমি পাত্র রাজা তুমি আগে পূজা পাব আমি

পরিণামে ভাঁড়ুরে জানিবে।"

কালকেতুর প্রতি ভাঁড়ু দত্ত' অংশে ভাঁড়ুদত্ত ব্যাঙ্গ করে কালকেতুকে বলে

"পরি দুপণের কাঁচা ভাণিত আমার ভাচা।

সেই বেটা হবে দেশমুখ!"

রাজ্যপত্তন করার পর সমস্ত জাতির মানুষ এসে বসবাস করতে আরম্ভ করে। ভাঁড়ু দত্ত রাজার নাম করে প্রজাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। তারা যা বলে তাও হাসির উদ্রেক করে

"হের দেখি পিঠে চুর্ণ ভাঁড়ু দত্ত করে খুন

সবে যাব বিদায় হইয়া ।।

জানে ভাড়ুনানা ছলা পরদ্বন্দ্বে ভরে ছলা।

টাকা সিকা নিত্য খায় ধুতি।"

রাজ্য থেকে ভাঁড়ুকে বের করে দিলে ভাঁড় কালকেতুকে দেখে নেবার হুমকি দিয়ে কলিঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কালকেতুকে পরাস্ত করেছে শুধু তাই নয় কালকেতু ভয়ে লুকিয়ে পড়লে ভাড় তাকে খুঁজতে যাবার জন্য বলে—

"রাজা দিয়াছেন পান তোমারে প্রসাদ।।

এবোল বলিয়া আম ভাস্তাই ব্যাধ ।।

হাতুড়ে ডাক্তার সে যুগেও প্রচুর ছিল। মুকুন্দরামের সরস বর্ণনায় বৈদ্যের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

"দেখিলে অসাধ্য রোগ। পালাইতে করে যোগ

নানা ছলে মগিয়ে বিদায়।

কপূর পাচনে করি তবে সে রাখিতে পারি

কপূরের কর সন্ধান।

রোগী সবিনয় বলে কপূর আনিতে চলে

সেই পথে বৈদ্যের পয়ান।”

বণিকমুরারী শীল ও ভাড় দত্তের ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে অনাবিল হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়েছে। দেবীদত্তও মাণিক্য অঙ্গুরী বিক্রির জন্য বণিক মুরারী শীলের নিকট কালকেতুর আগমন, তার সারা পেয়ে মাংসের দাম বাবদ দেড়বুড়ি’ দেনা শোধ করার ভয়ে মুরারী শীলের ঘরের ভিতর গিয়ে লুকিয়ে থাকা, মুরারী পত্নীর নানা মিথ্যা কথা বলা, শেষে কালকেতুর সামনে আছে জানতে পেরে মুরারী শীলের খিড়কীর পথে বেরিয়ে আবার কালকেতুর সামনে আসা এবং তার প্রতি কপট স্নেহপূর্ণ কথা বলা, কালকেতুর মাণিক্য অঙ্গুরীকে বাঙ্গা পিতল বলা, মুখে মুখে তার দাম হিসাব করে সামান্য মূল্য ধার্য করা সব কিছুই অসঙ্গতির মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টির উদাহরণ।

ভাঁড়ু দত্তের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকলাপ সবই কৌতুকরসের ধারা। ভাড়ুর প্রথম আবির্ভাবই পাঠক মনে অনর্গল কৌতুকরসের বন্যা বইয়ে দিয়েছে

“যতেক কায়স্থ দেখ ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ

কুলেশীলে মহত্ব বিচারে।

কহিছে আপন তত্ত্ব আমল হাড়ার দত্ত

তিনকুলে আমার মিলন।

দুই স্ত্রী,চারশালা, ছয়কন্যা, ছয় জামাই, বোন, শাশুড়ী নিয়ে ভাড়ুদত্তের সংসার। সে রাজা কালকের প্রধান ছাত্র হতে চেয়ে উপদেশ দেয়—

‘নফরের হাতে খাণ্ডা বহুড়ীর হাতে ভাণ্ডা।

এ পরিণামে দেই অতি দুঃখ।

‘গায়ে মানে না আপন মোড়ল’ হয়ে বসে ভাঁড়ু দত্ত হাটের লোকজনের উপর খুব অত্যাচার করায় কালকেতু তাকে তাড়িয়ে দিলে, প্রতিশোধ নেবার জন্য ভাড়ু কলিঙ্গ রাজের নিকট যাবে বলে ঠিক করে। রাজার নিকট ভেট বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পয়সা দিয়ে তোক ঠিক না করে সে তার বড় ভাইকেই ঠিক করে। তাকে ভেট বহনে

রাজী করতে ভাঁড়ু যে চাল চেলেছে, তাতে মুকুন্দরামের কৌতুকপ্রিয়তা অসাধারণউজ্জ্বলতায় বিকশিত

“ভাড়ু দত্তের জ্যেষ্ঠ ভাই নাম তার শিবা।

পৈতাল্লিশ বৎসর হৈল নাহি হয় বিভা।।

বিভা নাহিহয় তার দুই পায়ে গোদ।।

বলে ভাঁড়ু দত্ত দাদা দৃঢ় কর হিয়া।

এবার মণ্ডলী পাইলে আগে দিব বিয়া।”

ভাঁড়ু দত্তের কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গী ও ক্রিয়াকলাপ সবকিছুই হাস্যরসের উপাদান। কলিঙ্গ রাজের কাছে গিয়ে ভাঁড়ুর কালকেতুর নামে কুৎসা করা, কোটালকে নিয়ে ধানের গোলা থেকে কালকেতুকে খুঁজে বের করা, কলিঙ্গ রাজের কাছ থেকে সম্মান পেয়ে নিজ রাজ্য ফিরে পাবার পর ভাঁড়ুর পুনর্জন্ম, কালকেতুর কাছে মায়াকান্না, কালকেতু কর্তৃক দণ্ডদান প্রভৃতি ঘটনাবলীর মধ্যে, কৌতুকরস প্রবাহ নিরবিচ্ছিন্নভাবে বয়ে চলেছে। চতুরশঠ প্রবঞ্চক বিশ্বাসঘাতক ভাঁড়ুর দণ্ডদান হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে।

“দঢ়ায়্যা হুকুম পায় নাপিতের সুত।

ভাঁড়ুর ভিজায় মাথা দিয়া ঘোড়ার মুত।

চামড়া থাকিতে পদতলে ঘষে ক্ষুর।

দেখিয়া ভাঁড়ুর প্রাণ করে দুর দুর।।

দূরে শান শুনিয়া ক্ষুরের চড় চড়ি।

নাক সাড়া দিয়া তার উপাড়িল দাড়ি।”

ভাঁড়ু ক্ষমা চেয়েও এবার আর পার পেল না। তার আরও শাস্তির ব্যবস্থা করেছে

পাঁচ ঠাঞি ভাঁড়ুর মাথায় রাখেচুলি।

একগালে দিল চুন আর গালে কালি।।

আনিয়া ভাঙুরশিরে কেহ ঢালে ঘোল।

পিছে পিছে কোন জন বাজাইছে ঢোল।।

মুকুন্দরাম ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রকে পুরোপুরি ভিলেন চরিত্র না করে তাকে কৌতুকরসের মধ্যে জীবন্ত করে তুলেছেন।

তাই বলা যায় যে জীবন রসিক কবি মুকুন্দ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বন্দনা অংশ থেকে শুরু করে দেবখণ্ড এবং আখেটিক খণ্ড পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি কোন না কোন ভাবে হাসির উপাদান উপস্থাপন করে বাঙালী পাঠককে হাসিয়েছেন। দুঃখের পাশাপাশি হাস্যরস সৃষ্টি পাঠক চিত্তে একদিকে যেমন Dramatic Relife সৃষ্টি করেছেন অন্যদিকে তেমনি অঙ্গীরস হিসাবে হাস্যরস কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে।

১০.৫ নির্বাচিত প্রশ্ন

- চন্ডীমঙ্গল কাব্যে হাস্যরসিক কবি মুকুন্দের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা যথাযথ উদ্ধৃতি সহযোগে আলোচনা কর ।
- কবি মুকুন্দের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে উপন্যাসের কি কি লক্ষন ফুটে উঠেছে তা আলোচনা কর ।
- চন্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি মুকুন্দের অলৌকিকতার প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা কর ।

১০.৬ সহায়ক গ্রন্থ

চন্ডীমঙ্গল পরিক্রমা - সুখময় মুখোপাধ্যা

কবি মুকুন্দ রাম - ক্ষেত্রগুপ্ত।

চন্ডীমঙ্গল -এস, ব্যানার্জ

বাংলা মঙ্গল কাব্যর ইতিহাস - আশুতোষ ভট্টাচার্য

একক ১১- চণ্ডীমঙ্গলের ভাষা

বিন্যাস ক্রম

১১.১ মুকুন্দের কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব

১১.২ কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলেঃ সতীন সমস্যা

১১.৩ ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, প্রবাদ প্রবচন

১১.৪ নির্বাচিত প্রশ্ন

১১.৫ সহায়ক গ্রন্থ

১১.১ মুকুন্দের কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব

চৈতন্য সমসাময়িক ও তৎপরবর্তী বেশ কিছু কালের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের কবিদের পধে চৈতন্যদেবকে অস্বীকার করা বা তার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। অসাধারণ কবিত্বগুণ সমন্বিত ঐ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও তার ব্যতিক্রম নন্। যদিও মুকুন্দ চক্রবর্তীর ধর্ম্মমত সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত, কেউ তাকে। শৈব বলতে আগ্রহী, কেউ শাক্ত, কেউ বৈষ্ণব আবার কেউ কেউ বা সর্বধর্ম-সমন্বয়ের প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত করতেও পিছপা নন। কবি রচিত আত্মপরিচয় থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর পূর্বপুরুষেরা শিবেরই উপাসক ছিলেন কিন্তু পিতামহ জগন্নাথ মিশ্রের আমল থেকে বৈষ্ণবধর্মই তাদের গ্রাশ করে। মুকুন্দ রচিত: চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চৈতন্য, বন্দনায় আমরা তার উল্লেখ পাই। যথা

কয়ড়ি অনুজ-জাত মহামিশ্র জগন্নাথ একভাবে পূজিল গোপাল

বিনয়ে মাগিল বর জপি মন্ত্র দশাররমীন মাংস ত্যজি বহুকাল।

শ্রীকবিকঙ্কণ গায়, বিকাইনু রাঙ্গা পায় । আজি মোর সফল জীবন

গাইয়া তোমার আগে গোবিন্দ-ভকতি মাগেল চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।

কবির এই উল্লেখে একদিকে যেমন তার বৃদ্ধ পিতামহের চৈতন্য-সানিধ্যের প্রমাণ মেলে তেমনই অন্যদিকে স্বয়ং কবিও যে তার প্রথম জীবনে চৈতন্যদর্শনের সুযোগ পেয়ে থাকতে পারেন

- এরকম ইঙ্গিত উক্ত উক্তির সূত্র ধরে আবিস্কার করা যেতে পারে। তবে সে প্রসঙ্গ এখন থাক, পরে অন্য কোন আলোচনায় আমরা সে সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর চেষ্টা করতে পারি।

কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দুই-ই সর্বজনস্বীকৃত। তিনি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বিচার করেছিলেন সে কথার উল্লেখ তার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যমধ্যেই একাধিক স্থানে মেলে তাই রামায়ন মহাভারতের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতসহ অন্যান্য পুরাণ ও সংস্কৃত গ্রন্থদিও যে তার অজানা ছিলনা সে কথা বলাই বাহুল্য। মহাকবি কালিদাস ও জয়দেবেও তার গতি অব্যাহত ছিল। বিশেষ করে ভাগবতের প্রভাব যেন তার কাব্যে সর্বত্র বিদ্যমান। এই সূত্র ধরে আমরা তাকে বৈষ্ণব আখ্যা দিতে পারি যদিও তার সৃষ্টিকার্য শক্তি দেবীকে অবলম্বন করেই। তিনি বৈষ্ণব না শাক্ত, নাকি অন্য কিছু এই বিতর্কে এক্ষুনি আমরা প্রবেশ না করে তার চণ্ডীমঙ্গল কাব্য অবলম্বনে দেখার চেষ্টা করি যে ঐ কাব্য মধ্যে কোথায় কোথায় বৈষ্ণবীয় প্রভাব জাজ্বল্যমান কারণ এই বিষয়টিই বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল গ্রন্থে বন্দনা অংশের প্রথম দিকেই আমরা সুদীর্ঘ চৈতন্যস্তুতি লক্ষ্য করি। কবি মধ্যযুগীয় এই জাতীয় গ্রন্থ রচনার নিয়ম অনুসারে বা গানের আসরের প্রথা অনুযায়ী সিদ্ধিদাতা গণেশের বন্দনা বা স্তুতি প্রথমেই করেছেন ঠিকই তবে তা দেখে মনে হয় তা যেন নিতান্তই প্রথা বা নিয়ম রক্ষার্থে। ঠিক তারপরেই কবি দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন চৈতন্যস্তুতিতে, তার জীবনকাহিনী বর্ণনাতে ও তার মত্যে আবির্ভাবের গূঢ় কারণ ব্যাখ্যার্থে। তিনি কিন্তু গণেশ বন্দনার পর শিব বা শক্তিদেবী কারেরই স্তুতি কার্যে হাত দেননি। এক্ষেত্রে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক তিনি যদি শৈব হতেন বা শাক্ত হতেন তবে তাদের আরাধনা বা বন্দনা নিশ্চয়ই আগে করতেন এবং পরে স্থান দিতেন চৈতন্য দেবকে। তবে কি তিনি সত্যই বৈষ্ণব বলেই

সর্বাগ্রে চৈতন্যদেবকে স্থান দিয়েছেন নাকি এর অন্য কোন কারণ আছে? বিষয়টি আমাদের ভাবিয়ে তোলে নিশ্চয়ই। এখন দেখা যাক তার রচিত চৈতন্যস্তুতি কতটা ভক্তি বিনম্রচিত্ত-যুক্ত নাকি শুধু তৎকালীন প্রথা রক্ষার্থে রচিত। মনে হয় প্রথা মাত্র নয় বৈষ্ণবীয় বিনম্রতাই এর মূল প্রতিপাদ্য, যা সেই ধর্মের প্রতি আনুগত্যেরই পরিচায়ক বলা যেতে পারে। তাই চৈতন্য বন্দনার কিছু কিছু অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যথা অবনিতে অতরি চৈতন্য ঠাকুর হরি বহু সন্ন্যাসী-চূড়ামণি সখে সখা নিত্যানন্দ ভুবনে আনন্দ কন্দ, মুকতির দেখালা সুরনী। প্রণম শচীর নন্দন হৈয়া অকিঞ্চনবশ দিয়া জীবে প্রেমরস। কি নিস্তার করিলা সবর্জন। ভুবন বিখ্যাত নামক সুধন্য নদীয়া গ্রাম : জম্বুদীপ-সার নবদ্বীপ মহাকালি অন্ধকারে : চৈতন্য অবতারে :প্রকাশিলা হরিনাম দীপ। ভট্টাচার্য-শিরোমণি সার্বভৌম সাণ্ডীপণী ষড়ভুজ দেখি কৈলা স্তুতি প্রেমভক্তি কল্পতরুন অখিলতন্ত্রের, গুরু, গুরু কৈল কেশব ভারতী। - কৃপাময় অবতার : কলিকালে কেবা আর পাষণ্ডদলন বীরবানাতে জগাই মাধাই আদি অশেষ পাপের নিধি : হরিভাবে হৈলা দৃঢমনা।

আবার কবি রচিত দেবখণ্ডে সৃষ্টিকথা অংশে দেখি কবি শ্রীমদ্ভাগবতকে অনুসরণ করে তার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই ভাবে হরিকথা বর্ণনা করেছেন-

ভোজরাজ-মহাতঙ্কে শ্রীহরি করিয়া অঙ্কে বসুদেব গেলা নন্দাগার আগম যমুনাজল মায়াপতি কৈলে স্থল শিবারূপা নদী কৈলে পার। হরিতে অবনীভার কৃপাময় অবতার যদুকুলে হৈলা নারায়ণ। যশোদা জঠরে জাতা হইলা নন্দের সুতা বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।।... এই বর্ণনায় কবি বৈষ্ণব মাহাত্ম্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কবি আরও লিখেছেন—

ব্রহ্মায় মানসপুত্র হইলা চারিজন সনৎকুমার যে সনক সনাতন।। সনন্দ হইল তথি পরের পূরণ কৃষ্ণ কথা বিনে তার অন্যে নহী মন। পিতৃবাক্য না শুনিলা সংসার বিমুখ চারিজন বুঝিলেন হরিভক্তি সুখ। প্রপঞ্চ সকল বিধি হরিহর সুত্য চারি ভাই কৃষ্ণনাম গান সাবহিত।

দেবখণ্ডে শিব কর্তৃক মদন ভস্মের পর রতির বিলাপ ও রতির আত্মহত্যার উদ্যোগ বর্ণনায় তাকে সান্ত্বনা দান কালে কবি দেখিয়েছেন -

"যদুকুলে শ্রীহরি কবির অবতার হরির অসুর বধি অবনীর ভার। দৈবকী উদরে বসুদেবের নন্দন কংস কারাগারে তার হইব জনম। রুক্মিনী বিবাহ প্রভু কবির প্রথম তার গর্ভে হইবেক কামদেবের জনম। ইত্যাদি।

১১.২ কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলেঃ সতীন সমস্যা

সমস্যা সংকুল সমাজ। সমাজের শোভন-সুন্দর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হল মানুষ। মানুষকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে সমাজের নানাবিধ সমস্যা। সময়কালানুসারী সমাজসমস্যার হেরফেরের দিকটি লক্ষ্য করা যায়। সমস্যার পাথর ঠেলে ঠেলে মানুষের পথ-পরিক্রমা। প্রাচীনকালে থেকে একাল পর্যন্ত মানবসভ্যতার ইতিহাস এবং সাহিত্যের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনায় এই সত্য প্রমাণিত। সাহিত্য যেহেতু সমাজেরই দর্পণ সেই কারণে সাহিত্যের মধ্যে সমাজ-সমস্যার অনুপুংখ চিত্র মেলে। প্রাচীন বাংলার নিদর্শন চর্যা থেকে শুরু করে এযুগের কথাসাহিত্যের মধ্যেও সামাজিক সমস্যার' বাস্তবধর্মী জুলন্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সমাজ-সমস্যার প্রতি সচেতন দৃষ্টির প্রকাশ রেখেছেন কবি কঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী। তার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মূল সমস্যাটি হোল গার্হস্থ্যজীবনধারার বস্তুনিষ্ঠ সমস্যা। এই সমস্যার রূপায়ণে শিল্পী প্রসংসনীয় কৃতিত্বের নিদর্শন রেখে নিজেকে মধ্যযুগীয় সামাজিক সমস্যার রূপদক্ষ কবিশিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

সময়কাল মধ্যযুগ। পটভূমি বাংলাদেশের সমাজ। এখানে উজ্জ্বল সামাজিক সমস্যারূপে যার স্থানাধিকার-সে হোল সতীন-সমস্যা। মধ্যযুগীয় সমাজে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হলেও পারিবারিক জীবনের সুখশান্তি বিধ্বস্ত করার ব্যাপারে এই সতীন সমস্যা যে সর্বাধিক প্রকট সমস্যারূপে স্থানলাভ করেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে এক অর্থে তিনটি কাহিনী ধারার রূপায়ণ ঘটানো হয়েছে। প্রথম কাহিনী শিব-পার্বতী কেন্দ্রিক। দ্বিতীয় কাহিনী কালকেতু-ফুল্লরা কেন্দ্রিক এবং -তৃতীয় কাহিনী ধনপতি-লহনা-খুল্লনা কেন্দ্রিক। এই

ত্রিধারার কাহিনী মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে সতীন সমস্যার সংযোগ ঘটিয়েছেন শিল্পী। প্রথম দুটি কাহিনীধারার প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে মাত্র কিন্তু তৃতীয় কাহিনীতে তার চুড়ান্ত রূপ প্রোজ্জ্বল।

চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম পারিবারিক জীবন-রস কেন্দ্রিক কাহিনী হল শিবকেন্দ্রিক কাহিনী। পরিবারজীবনের দারিদ্র্য ও দাম্পত্য সম্পর্কের স্বরূপ নির্ধারণে এ কাহিনীর গুরুত্ব অপরিসীম। শিবের প্রথম পত্নী সতী। অনিমন্ত্রিত হয়ে সে যেতে চাইল পিতৃগৃহে। মিলল না শিবের অনুমতি। শুরু হল কলহ। বাঙালী মেয়ের বাপের বাড়ী যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী। করেও খুব একটা কাজ হয় না। এক্ষেত্রেও তাই হল। এ যাত্রাই সতীর শেষ যাত্রা। স্বামীনিন্দা সহ্য করতে না পেরে প্রাণত্যাগ করল সতী। শক্তিহীন হল শিব।অতিক্রান্ত হল দীর্ঘসময়কাল।। শিবের দ্বিতীয় পত্নী পার্বতীর আগমন হল। প্রথমে শ্বশুরালয়ে, পরে মেনকার সঙ্গে কলহে পিতৃগৃহ ত্যাগে কৈলাসভবনে শিব-শিবানীর ঘরকন্না। নিদারুণ দারিদ্র্যে তাদের অভাবঅনটনের সংসারচিত্র সুচিত্রিত। এখানে যেহেতু একই সঙ্গে শিবের জীবনে সতী ও পার্বতীর অবস্থান দেখানো হয়নি সেই কারণে সতীন সমস্যা জট পাকাতে পারেনি। কিন্তু দেবী ও ঐ ফুল্লরার কথাবার্তাতে শিবের জীবনে দুই নারীর একত্র অবস্থান ও সতীন সমস্যার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। চণ্ডীর সঙ্গে ফুল্লরার সাক্ষাৎকার মুহূর্তে দেবীকে বলতে শোনা যায় ‘ইলালুতে ঘর মোর জাতিতে ব্রাহ্মণী। শিশুকাল হইতে আমি ভ্রমি একাকিনী।।। বন্দ্য বংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল। সাতসতা গৃহে বাস বিষম জঞ্জাল।।”

ফুল্লরাকে চণ্ডীর পরিচয় প্রদানের কালেও সতীন সমস্যার দিকটি উৎথাপন করা হয়েছে। সেখানে দেবী চণ্ডী বলেছে-

“কি কব দুঃখের কথা গঙ্গানামে মোর সতা স্বামী যারে ঘরেণ মস্তকে।। বরঞ্চ গরল খায় মোর পানে নাহি চায় ভবন ছড়িনু এই দুঃখে।। গঙ্গা বড় আউচালি সদাই পিড়য়ে-গালি, স্বামীর সোহাগ পরতাপে। দেখিয়া পতির দোষ হইল পরম রোষ লাজে জলাঞ্জলি দিনু তাপে। সতিনের সম্মান। সেই মোর অপমান অভিমানে নাহি মেলি আঁখি। দেখিয়া দারুণ স বিবাহ দিলেন পিতা পিতৃপুলে হইনু বিমুখী।। আমার কর্মের গতি উগ্র হইল

মোর পতিত পাঁচমুখে মোরে দেয় গালি। তাহে সতিনের জ্বালা কত বা সহিবে বালা পরিতাপে হয়ে গেনু কালি।।”

চণ্ডীর কথায় বোঝা যায় সতীনের জ্বালায় সে ঝালাপালা। সতীন নিয়ে ঘর করা যে। বিষম বিড়ম্বনা, একথা সে ভালো করেই জানে। সাত সতীনের উপদ্রবে চণ্ডীর ওষ্ঠাগত প্রাণের চিত্র-' সাত সতিনীরা মারে বুঝিয়া না শান্তি করে সাত সাঁ পরাণের বৈরী। সতীনদের উপদ্রবে সে স্বামীর ঘর ছেড়ে বনবাসী হয়েছে একেলা। চণ্ডীমঙ্গলকার মুকুন্দের কথায়--

“যে ঘরে সতীন রয় হিংসানলে প্রাণ দ’য় যেমন লাগয়ে বিষজ্বালা।

বিধি মোরে হৈল বাম না গণিন পরিণাম বনবাসী হইনু একেলা।।"

ফুল্লরাকে চণ্ডীর পরিচিতি প্রদানের প্রেক্ষাপটে সতীন সমস্যার প্রতি কাব্যকার সুন্দর ভাবেই আলোকপাত করেছেন।

কাব্যটির প্রথমদিকে যে সতীন সমস্যার দিকটিকে কাহিনীকার তুলে ধরেছেন তার মধ্যে শিবের ঘরণীর সতীন সমস্যার দিকটি এসেছে। ফুল্লরার কাছে দেবী চণ্ডী তার সমস্যাসংকুলতার কথা এখানে ব্যক্ত করেছে। সমস্যার গভীরতা অনুধাবন করে চণ্ডীর প্রতি ফুল্লরা যে উপদেশ দিয়েছে তাতে এই সমস্যার সমাধান সংকেত যেমন নির্দেশিত তেমনি এ ব্যাপারে ব্যর্থতার ফলশ্রুতি হিসাবে নিজের সর্বনাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ফুল্লরা জানিয়েছে, দেবীর গৃহত্যাগ করে চলে আসা উচিত হয়নি। সতীনে কোন্দল করলে পিছু হটা চলবে না। প্রতিবাদী মানসিকতা নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। তাই ফুল্লরার দেবীর উদ্দেশ্যে উপদেশ –

“সতিনে কোন্দল করে দ্বিগুণ শুনাবে তারে । কেন ঘর ছাড় হয়ে মানী।

কোপে কৈলে বিষপান। আপনি ত্যজিরা প্রাণ : সতিনের কিবা হবে হানি। কৌশল্যা রামের মাতা কৈকেয়ী তাহার সতা দোঁহার কোন্দলে সর্বনাশ। না গণিয়া হিতাহিত কৈল সেই অনুচিত এক রামচন্দ্র গেলা বনবাস।।"

শাক্ত পদাবলীর মধ্যেও হরপার্বতীর পারিবারিক জীবনধারাতে সতীন সমস্যার দুর্বিষহ দিকটিকে তুলে ধরা হয়েছে। মেয়ের সতীন সমস্যায় দিশাহারা হয়ে সেখানে উমা-জননী। মেনকার কন্যাকেন্দ্রিক স্নেহমায়ামমতার দিকটি অসাধারণ কাব্যগুণান্বিত হয়ে পরিবেশিত। এপ্রসঙ্গে শাক্ত সংগীতের কিছু নিদর্শন উপস্থাপন করা যেতে পারেঃ

১। "একে সতীনের জ্বালা, না সহে অবলা, যাতনা প্রাণে কত সয়েছে।(কমলাকান্ত) "
তাহে সুরধনী, স্বামী-সোহাগিনী, সদাশঙ্করের শিরে রয়েছে।।"

২। "সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শ্মশানে রহে,

এ তুমি হে পাষাণ, তাহে না কর মনেতে।" .

৩। ঘরেতে সতিনী জ্বালা, সদা করে ঝালা পালা,

হয়ে উমা রাজবালা, কিসে পাবে ত্রাণ।!" (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)।

মধ্যযুগের সমাজজীবনের অনুপুংখ চিত্রাংকনে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সতীন সমস্যার দিকটি শাক্তপদাবলীর মধ্যেও প্রত্যক্ষ করা যায়। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ উপরোক্ত দৃষ্টান্তত্রয়ী।

চণ্ডীমঙ্গলের সতীনসমস্যা প্রসঙ্গে যদিও শিব-গঙ্গা-চণ্ডী কেন্দ্রিক পারিবারিক জীবনধারায় সমস্যাকে টেনে আনা হয়েছে তথাপি গঙ্গাকে আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করি না। ফুল্লরার মাধ্যমে তাকে উপস্থাপন করার প্রয়াস নিয়েছেন শিল্পী। এটিকে তাই সতীন সংক্রান্ত ছায়াসমস্যা বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। সমালোচক ক্ষেত্রগুপ্ত কবি মুকুন্দরাম' গ্রন্থে দেবখণ্ডস্থ এই কাহিনীবৃত্তে তাই লিখেছেন—"কবি ধর্মবিশ্বাসের এবং ভক্তিরসের উপরে তার স্বাভাবিক প্রবণতার চেয়ে কিছু বেশি জোর দিয়ে ফেলেছেন এখানে। ফলে দাম্পত্য সমস্যার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকের ছবি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। তাছাড়া দাম্পত্য সম্পর্কে আরও কিছু জটিলতা এখানে ছিল। তা বহু বিবাহজনিত। সতী শিবের প্রথমা পত্নী, পার্বতী দ্বিতীয়া পত্নী। কিন্তু প্রথমার মৃত্যুর বহুকাল পরে দ্বিতীয়াকে বিবাহ করেছেন শিব। তাছাড়া পৌরাণিক বিশ্বাসের দিক থেকে সতীরই নবরূপ পার্বতী। কাজেই শিব-পার্বতীর দাম্পত্যজীবনে অতীতের ছায়াপাত কখনও সমস্যার সৃষ্টি করে নি।"

কবিকঙ্কণ মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনী ধারা গড়ে উঠেছে কালকেতু ফুল্লরাকে কেন্দ্র করে। আখেটিক খণ্ডে উৎথাপিত সমস্যাসমূহের মধ্যে সাধারণ একটি সমস্যা হিসাবে ফুল্লরার সতীন-ভীতি জনিত দিকটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সতীন যে বাঙালী নারীজীবনের জীবন্ত এক উপদ্রব সে সম্পর্কে সমস্ত বিবাহিত বাঙালী নারীর সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ মেলে। মুকুন্দের বিবৃতিতে সতীন সম্পর্কে তৎকালীন যুগপ্রেক্ষাপটের নারীমনস্তত্ত্ব বিশ্লেষিত। সতীন সুখের সংসারে জ্বেলে দিতে পারে দুঃখের দাবাগ্নি। তাই সতীনের উপস্থিতি কোন নারীরই কাম্য ছিল না। সতীন সমস্যার আশঙ্কায় ফুল্লরাকেও শংকিত হতে দেখি। কালকেতু-ফুল্লরার অভাব অনটনের সাংসারিক জীবনে দারিদ্র্যের দিকটি দাম্পত্য জীবন প্রেক্ষাপটে বড় মাপের সংকট টেনে আনেনি, সংকট ঘনীভূত হয়েছে দাম্পত্যজীবনে সতীন শঙ্কা থেকে। বিষয়টির উপর আলোকপাত করতে গিয়ে সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্তের মূল্যবান মন্তব্য—"কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনীতে দরিদ্র একটি অন্ত্যজ পরিবারের জীবনচিত্র স্থান পেয়েছে। দারিদ্র্যের কথা নানা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, কিন্তু দারিদ্র্য কেন সমস্যার সৃষ্টি করেনি এই কাহিনীতে। দরিদ্র ব্যাধ চণ্ডীর কৃপায় রাজা হয়েছে। ফুল্লরার বারমাস্যায় তাদের অভাবজনিত দুঃখের বিস্তৃত বিবরণ স্থান পেয়েছে। কিন্তু দারিদ্র্য এদের দাম্পত্যজীবনে কোনরূপ সংকটের সৃষ্টি করেনি। এদের দাম্পত্যজীবনে সতীনের আশংকাই রীতিমতো সমস্যা ঘনিয়ে তুলেছিল। গোধিকামূর্তি পরিহার করে চণ্ডী যখন অপরূপ সুন্দরী যুবতীরূপ ধারণ করল, ঘরে ফিরে সুন্দরীকে দেখে যখন ফুল্লরা শুনল কালকেতুই তাকে ঘরে এনেছে, তার মনে সতীনের ভয়টাই প্রবলভাবে দেখা দিল।"

কাহিনীধারা বিশ্লেষণে এখানে এই সত্য প্রমাণিত হয় যে, এক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে সতীন সমস্যা নেই, আছে সতীনসমস্যাজনিত শংকিত চিত্তবৃত্তির প্রকাশ।

সতীনহীন সংসার সুখশান্তির স্বপ্ননীড়। অন্য নানাবিধ সমস্যা থাকলেও সতীন সমস্যা যদি না থাকে তাহলে পারিবারিক জীবনে শান্তির সুখচ্ছবি গড়ে ওঠে। ফুল্লরা-কালকেতুর জীবনধারাতে দুঃখের, অভাব-অনটনের দিক আছে ঠিকই কিন্তু, নেই সেখানে অশান্তির দিক। পারিবারিক জীবনে বধূর অশান্তি ও কষ্টকর অনুভূতি সৃষ্টির

মূল আধার তিনটি। সেগুলি হল, শাশুড়ি, ননদী এবং সতীন। এতিনের মধ্যে কারোর উপস্থিতি নেই ফুল্লরার জীবনে। গৃহে শাশুড়ি নেই, নেই ননদিনী, সতীন তো নেইই; তাহলে ফুল্লরার দুঃখের কোন কারণ থাকতে পারে না; থাকতে পারে না অশান্তির কোন কারণ। কালকেতুর মাধ্যমে কবিকে তাই ফুল্লরার উদ্দেশ্যে বলতে শোনা যায়

"সাসুড়ি ননদি নাঞি তোর সতা   কা সনে কল করি চক্ষু কৈলে রাতা!"

সতীনের আশংকায় শঙ্কিত হয়ে ফুল্লরা গোলাহাটে বীর কালকেতুর কাছে গিয়ে যে মুহূর্তে ক্রন্দন করে মনের অভিযোগময় অভিলাষ ব্যক্ত করেছে তখন সবিস্ময় জিজ্ঞাসায় কালকেতুকে উপরোক্ত বক্তব্য রাখতে দেখা যায়। এর আলোকে একথা স্পষ্ট হয় যে ফুল্লরার জীবনে সপত্নী-জনিত সমস্যা না থাকলেও তৎকালীন যুগজীবন ও সমাজ প্রেক্ষাপটে নারীজীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল এই সতীন সমস্যাগত দিকটি। কালকেতে আখ্যানে সতীনহীন দাম্পত্য জীবনের সুখচ্ছবি পরিস্ফুট। এপ্রসঙ্গে ক্ষেত্রগুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গি "কালকেতু ফুল্লরার জীবনে দুঃখ আছে, কিন্তু অশান্তি নেই। কারণ গৃহে শাশুড়ী ননদী নেই, বিশেষ করে ফুল্লরার সতীন নেই। কালকেতুর মুখ দিয়ে কবি এই কথাই বলিয়েছেন, ... কালকেতু-আখ্যানে সপত্নী-সমস্যাটি প্রকৃত নয়, এই প্রসঙ্গে তুলে হয়তো কবি সপত্নীহীন গৃহকেই দাম্পত্যজীবনের আদর্শ বলে নির্দেশ করতে চেয়েছেন। সর্ববিধ দুঃখ ও অভাবের মধ্যেও সে জীবনে শান্তি অবিচল।"

কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীধারা বিশ্লেষণে দেখণ্ডে শিব পার্বতীর দাম্পত্যজীবনের ছবি পাওয়া যায়, আখেটিকখণ্ডে ফুল্লরা ও কালকেতুর দাম্পত্যজীবনের ছবি মেলে আর বণিকখণ্ডের মূল আকর্ষণ, ধনপতি সদাগর-লহনা-খুল্লনার জীবনালেখ্য। শিবের জীবনে একাধিক পত্নী প্রসঙ্গ থাকলেও চণ্ডীমঙ্গলে সরাসরি তাদের কেন্দ্র করে সতীন সমস্যার ছবি তুলে ধরা হয়নি। আখেটিকখণ্ডে সতীন সমস্যার শংকিত দিকটির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে সতীনসমস্যা জর্জরিত প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছে। বণিকখণ্ডের অভ্যন্তরলোকে। চণ্ডীমঙ্গলের ত্রিধারার কাহিনীকথার মধ্যে এই সমস্যাকে তুলে ধরার চেষ্টা নেওয়া হলেও বাস্তবিকপক্ষে বণিকখণ্ডমধ্যেই তার স্পষ্টও প্রকট চিত্র পাওয়া যায়। এই কাহিনী ধারার প্রকৃত রসের দিকটি সপত্নী

সমস্যার মাধ্যমে উপস্থাপিত। ক্ষেত্রগুপ্ত তার স্বচ্ছ দৃষ্টিপাতে প্রসঙ্গটিকে আলোকিত করতে গিয়ে লিখেছেন-"ধনপতি সদাগরের আখ্যানটি আসলে সপত্নী সমস্যার কাহিনী! ধনপতির খুম্ননার রূপে মুগ্ধ হওয়া থেকেই এই সমস্যার সূত্রপাত। লহনা-খুল্লনা বিবাদে, খুল্লনার দাসী বৃত্তিতে এর চরমপ্রকাশ। শেষ পর্যন্তও এই সমস্যা নির্বাপিত হয়নি, তার গুরুত্ব হারিয়েছে। খুল্লনার বাৎসল্যের পশ্চাতেও, সপত্নীর বঞ্চিত মাতৃত্বের ঈর্ষাবিষজর্জর মূর্তি উঁকি দিয়েছে। লহনা-খুল্লনা-দুর্বলা-লীলাবতী, স্বয়ং ধনপতি এবং কতকটা শ্রীপতি এই সমস্যার বিস্তার ও পুষ্টিতে সহায়তা করেছে। ধনপতি শ্রীপতির বাণিজ্য ব্যাপারের নিপ্রাণ কৃত্রিমতার কথা মনে রাখলে, কাহিনীর আসল রস যে সপত্নী সমস্যায় তা বোঝা যাবে। লক্ষণীয়, ধনসম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও যে শান্তি লহনাখুল্লনার দাম্পত্যজীবনে আসেনি, ভাগ্যবতী সন্তানবতী হয়েও খুল্লনা যে সপত্নী-বিদ্বেষের ঈর্ষায় দগ্ধ হয়েছে, একান্ত দারিদ্র্য এবং বন্ধ্যাত্বের শূণ্যতা সত্ত্বেও সেই কাম্য শান্তি ব্যাধের কুটিরকে মহিমা দিয়েছে।"

বণিকখণ্ডের মূল পুরুষচরিত্র ধনপতি সদাগর। এই গল্পকাহিনীর নায়ক রূপে তার প্রতিষ্ঠা। ধনপতি আখ্যানের মধ্যে যে দুটি উপাখ্যান আছে তাদের একত্রিত করলেও উভয় আখ্যানেরই পুরুষ চরিত্ররূপে ধনপতির একচ্ছত্র অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। ধনীর সন্তান ধনপতি। পূর্বপুরুষের সঞ্চিত সম্পদের মাধ্যমে সুখে দিন কাটে তার। বাণিজ্যবৃত্তির সঙ্গে সংযোগ। থাকলেও পায়রা উড়িয়ে, ক্রীড়াকৌতুকে মত্ত হয়ে সম্ভোগাতিশয্যে দিন কাটাতে দেখি তাকে। তার প্রথমপত্নী লহনা। সে বিগত যৌবনা প্রায়। বণিকপুত্র পায়রা উড়াতে উড়াতে চলে এলো একদিন ইছানি নগরে। বিগতাযৌবনা প্রথমা পত্নী লহনাতে তার ভোগবাসনা আত্মসন্তুষ্টির পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। নবোদ্ভিন্না কিশোরীর প্রতি উন্মুখ হল সে। রূপসী খুল্লনার সঙ্গে ঘটল সাক্ষাৎ। প্রথম দর্শনেই প্রগাঢ় প্রেমাসক্তির অভিব্যক্তি। রূপসী সুন্দরীর। -মোই তাকে মুগ্ধ করল। গৃহিণী করে ঘরে তুলতে মনস্থ করল ধনপতি সেই সুন্দরী খুল্লনাকে।। দেওয়া হল বিবাহ প্রস্তাব। রাজী হল খুল্লনা-জনক লক্ষপতি। একে সুদর্শন, তার উপর পর্যাপ্ত বিত্ত-বৈভবের অধিকারী। কুলে শীলেও উপেক্ষণীয় নয়। খুল্লনা-জননীর কিন্তু সম্মতি

মিলল না। সতীনের ঘরে সে রূপসী কন্যাকে সম্প্রদানে নারাজ। রম্ভাবতী তাই স্বামী লক্ষপতির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুতীব্র বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। রম্ভাবতীর বক্তব্যের মাধ্যমে। মধ্যযুগের সমাজ ও জীবনভাবনাতে সতীন সমস্যার সমস্যা-কণ্টকিত দিকটি অনুধাবন করা যায়।সতীনের সঙ্গে ঘর করার জ্বালা সম্পর্কে এ নারী সচেতন। তাই এ বিয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সে গঙ্গাজলে ঝাপ দেওয়ার অভিলাষও ব্যক্ত করে। কবির কথায় তার অবতারণা—

"প্রাণনাথ কেনি হেন দিলে অনুমতি হিতাহিত মনে গণ নাঞি লব কন্যাপণ কোন ঝিয়ে করাবে দুর্গতি। পড়া সুন্যা লইলে শিশু ব্যয় করি নিজ বসুর কন্যা দিবে দারুণ সতিনে? লহনারে নাঞি জানে হেন বাক্য মুখে আন করুণা তোমার নাঞি মনে। তোমারে বুঝাব কী, লহনা ভাই এর ঝি? 'যদি তুমি দিবে তারে সতা কেনি কৈলে হেন কাজ। সঞ্চয় করিলে লাজ লোক মাঝে না তুলিবে মাথা। খুল্লনা বান্ধিআ গলে ঝাপ দিব গঙ্গাজলেল " নাঞি দিব দারুণ সতিনে দুরন্ত ঝিয়ের মোহ নয়নে গলয়ে লোহ লক্ষপতির ধরিআ চরণে। খে না গুণিলে হেন কথা , জে ঘরে লহনা সতা একাচার ভূখিল বাঘিনী বিচারে হইআ অন্ধ পদ-গলে দিআ বন্ধ ভেট দিলে খুল্লনা হরিণী। দুতিন সতিন জার বিফল জীবন তার দিন ব্যর্থ না জায় কোন্দলে । আমার বচন ধর আনি প্রথম বরফ জেন কন্যা থাকে অন্নজলে।"

মধ্যযুগের নারী হয়েও খুল্লনা-জননী রম্ভাবতী প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে এখানে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তার মাধ্যমে তৎকালীন সতীন সমস্যার দিকটি অনুধাবনে আমাদের কোনরূপ অসুবিধা হয় না। পুরুষের উপর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নারীর সংগ্রামী মানসিকতার অভিব্যক্তি মেলে। ধনপতির জীবনে আগে এসেছে লহনা। সে স্বামীর উপর তার সামগ্রিক দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় নারী খুল্লনার অনুপ্রবেশকে সে খুশীমনে নিতে পারবে না। তাই মা হয়ে রম্ভাবতী সতীনের দুঃসহ জ্বালা-যন্ত্রণাদীর্ণ জীবনে মেয়েকে ঠেলে দিতে রাজী নয়। মঙ্গলকাব্যকার মুকুন্দ তার চণ্ডীমঙ্গলের রম্ভাবতী চরিত্রের জীবনদর্শন থেকে সতীন সমস্যাকে তৎকালীন 'সমাজ-সমস্যার সংকটময় সর্বাধিক প্রোজ্জ্বল এক সমস্যারূপে এখানে হাজির করেছেন।

রম্ভাবতীর বলিষ্ঠ প্রতিবাদধর্মী মানসিকতায় ধনপতি সদাগর বিভ্রান্ত হল। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা দিল সংশয়। তখন আশ্রয় নিল সে মিথ্যার। মায়ের মনস্তত্ত্ব সমীক্ষা করে সে রম্ভাবতীর মত আদায়ের জন্য উপায়ান্তর না দেখে. মিথ্যাভাষণের দ্বারস্থ হল। সতীন ভয়ে খুল্লনা-জননী রম্ভাবতী বাস্তবিকপক্ষে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছে। আপন যুক্তিতে সে অচল অটল। তার দৃঢ়মূল সিদ্ধান্ত সতীনের হাতে মেয়েকে তুলে সে দেবে না কোনক্রমে। লক্ষপতি গণক নিয়ে গণনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কথা জানাল। কবির কথায় তার উপস্থাপনা "রম্ভার শুনিঞা কথা তিল আধ নাঞি ব্যেথা শুন প্রিয়ে আমার বচন ছিলাঙ দ্বিজের সঙ্গে বসিআ কথার রঙ্গে গণাইলাঙ ভবিষ্য গণন। গণক কহিল, মোরে দিবে দ্বিতীয় বরের বিচারিএ বিধবা-লক্ষণ : এত যদি হইল গতি দিল রম্ভা অনুমতি বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ।।"

আর কোন যুক্তি খাটে না। মা হয়ে মেয়ের কল্যাণ কামনা করে রম্ভাবতী। তাই সব জেনে শুনেও সম্মতি দিতে হল তাকে। এছাড়া ছিল না তার উপায়ান্তর। কাহিনীধারা সমীক্ষায় দেখা যায় খুল্লনা-জননী রম্ভাবতীর আশংকাই বাস্তবে রূপ পায়। সতীন সমস্যার বলি হতে হয় খুল্লনাকে। অত্যাচারে-পীড়নে তাকে অতিষ্ঠ হতে হয়েছে। কাহিনী ধারাজুড়ে সতীনের উপদ্রবে খুল্লনার বিড়ম্বিত জীবন-যন্ত্রনার নিদারুণ চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায়।।

খুল্লনার বিয়ের বিষয়টি স্থির করা হোল। সতীনকেন্দ্রিক রম্ভাবতীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে গ্রন্থকার যেমন নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তেমনি সতীন সমস্যার অনল কেমন করে লহনার মনস্তত্ত্বে প্রভাব ফেলল, আলোড়ন সৃষ্টি করল তার চিত্রও পাওয়া গেল। দাসী দুর্বলার কাছে লহনা তার মনের খেদ ব্যক্ত করল। এই খেদোক্তির মাধ্যমে সমস্যার গভীরতা সম্পর্কে ধ্যানধারণা স্পষ্ট হয়। শোকের অনলে দগ্ধ হল মন। স্বামীকে অন্যজনের হাতে তুলে দিতে সমর্থন নেই তার মননলোকের। দাবানলে বনপোড়ার মতো তার অবস্থা। অশ্রুজল নিবারণ করতে পারে না সে। কবির কথায় এই প্রেক্ষাপটের বিবৃতি--

"দেখিয়া কুস্বপ্ন বহু স্পন্দে ডানি আঁখি বাহু, লহনা কহেন মন কথা। শুনিয়া লোকের মুখে শেল যেন বাজে বুকে প্রভু দিবে নিদারুণ সতা। একলা ঘরের দারা আছিলাম স্বতন্ত্তরা আপনি গৃহিণী এ ভবনে। বিধাতা হইল বাম পরে নিবে ধন ধাম মনে পোড়ে তুষের আগুনে।. শোকানলে পোড়ে মন দাবানলে যেন বন আঁখিজল নিবারিতে নারি। এ শেল রহিল মনে স্বামী দিব আন জনে সঞ্চয় করিয়া ঘর বাড়ী।।"

স্বামীর জীবনে আর এক নারী এসে হাজির হোক-তা মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারে না কোন নারী। লহনাও তা পারে নি। সে তার বহুসখের ঘরবাড়ীকে কেমন করে তুলে দেবে সতীনের হাতে? নিদারুণ জীবন-যন্ত্রণায় সে দগ্ধীভূত হতে থাকে নিরন্তর! সতীনের কথা ভেবেই লহনার জীবনে এ নিদারুণ জীবন যন্ত্রণার দাবদাহ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কবিকঙ্কণ ধনপতি আখ্যানের একাধিক চরিত্রের মাধ্যমে সতীন সমস্যার দিককে একাব্য তুলে ধরেছেন। কি দেবখণ্ড, কি আখেটিক খণ্ড, সর্বত্রই নানা চরিত্রকেন্দ্রিক সতীনসমস্যার প্রতি আলাোকপাত করেছেন গ্রন্থকার তার লেখনীর অসাধারণ নৈপুণ্যের মাধ্যমে।

খুল্লনাকে বিয়ে করার অভিলাষ জেগেছে ধনপতির মনে। পুরুষশাসিত সমাজ হলেও ধনপতি এখানে লহনাকে কিছুট ভয়ও করেছে। সরাসরি সত্য কথা বলার সাহস তার হয়নি। আশ্রয় নিয়েছে সে ছলনার। লহনাকে সে বোঝাতে চেয়েছে যে, এ বিয়ে নিজের জন্য নয়; লহনার জন্যই। রান্না করতে করতে লহনার রূপ নষ্ট হয়েছে। এ কষ্ট আর সহ্য করা যায় না। তাই তারই দাসী আনার জন্য খুল্লনাকে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সাধু ধনপতি।নপতির চাতুর্যে, ছলনায় মিষ্টভাষায় লহনা জার বিষয়টিকে বাধা দেয়নি। লহনার প্রতি ধনপতির প্রবোধ প্রদানের পটভূমিতে অভিমানাহত নারীর মানভঞ্জনের পরিপ্রেক্ষিতে মিষ্টভাষায় ছলনাশ্রয়ী সাধু ধনপতির বক্তব্যের বাস্তবরূপ প্রদানে কবিকঙ্কণের বিবৃতি

"লহনা লহনা বলে ডাকে সদাগর। অভিমানযুক্ত রামা না দেয় উত্তর। ইঙ্গিতে বুঝিল লহনার অভিমান। কপট প্রবন্ধে সাধু লহনা বুঝান।' এ রূপনাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে। চিন্তামণি নাশ কৈলে কাচের বদলে। স্নান করি আসি শিরে না দাও চিরুণী। রৌদ্র না পায় কেশ শিরে বিন্ধে, পাণী। অবিরত ওই চিন্তা অন্য নাহি গনি। রন্ধনের শালে নাশ হইলে পদ্মিনী।। মদী পিসী মাতুলানী, ভগিনী সতিনী। কেহ নাহি রহে ঘরে হইয়া রান্ধনী।।যুক্তি যদি লহে মনে কহিবে প্রকাশি। রন্ধনের তরে তর করে দিব দাসী।"

ধনপতি আরও বলতে চেয়েছে বর্ষা-বাদল দিনে উনানের আগুনে ফু দিতে দিতে এবং কপুর তাম্বুল বিনে লহনার মুখ শুকিয়ে গেছে তাই তার দাসী এনে না দিয়ে উপায় কি। এরপরে মুহনা আত্মসমর্পণ করল সাধু ধনপতির কাছে। অতএব লহনা ও খুল্লনা দুই নারী এসে হাজির হল ধনপতির জীবনে। সতীন সমস্যার জটজটিলতাকে তুলে ধরার মানসিকতায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দ এভাবে প্রত্যেকটি চরিত্রকে সজীব-প্রাণবন্ত করে উপস্থাপন করলেন। রম্ভাবতী, লহনা-খুল্লনাধনপতি প্রভৃতি চরিত্রগুলি এই সমস্যার সঙ্গে ওতপ্রোত সম্পর্কসূত্রে জড়িত হল এবং সমস্যাটিকে তৎকালীন সমাজের অনুপুংখ চিত্রে রূপায়িত করল।

সুখশান্তিতে দিন কাটছিল লহনা-খুল্লনার। ধনপতির গৃহে মিলন সুখে দু-সতীনের এভাবে দিন অতিবাহিত হওয়ার দিকটিতে অন্তরায়রূপে দেখা দিল আর এক নারী চরিত্রনাম তার দুর্বল। ধনপতির গৃহের দাসী এই দুর্বল চরিত্রের মাধ্যমে কবি সতীনসমস্যার চূড়ান্ত সঙ্কটময় দিকটি গড়ে তুলেছেন। দু-সতীনে গলায় গলায় ভাব! বুক জ্বলতে লাগল। দুর্বলা দাসর।'কঞ্জুর তাম্বল লয়ে দু-সতিনে থাকে শুয়ে একত্র শয়ন দিবারাতি।'—এ অবস্থা অসহনীয় ঠেকে দাসী দুর্বলার কাছে। তাই 'প্রেমবন্ধে দু-সতিনে দেখিয়া দুর্ব্বলা মনে সাত পাঁচ ভারে দুঃখমতি। এই ভাবনার ফলশ্রুতি হিসাবে দুজনের মধ্যে কোন্দল সৃষ্টির প্রয়াস গৃহীত হয়দুর্বদাসী কর্তৃক। সতীন সমস্যারূপ অগ্নি প্রজ্বলন থেকে শুরু করে তাতে ঘৃতাহুতি প্রদানের সার্বিক দায়দায়িত্ব যেন এই দুর্বলীদাসীই

নিজের হাতে তুলে নেয়। দাসদাসীরা চায় ফাকি দিতে। দুই সতীনের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিতে পারলে দাসীর অভিপ্রায় সহজে চরিতার্থ হবে। তাই দুর্বলার মনস্তত্ত্ব-

"দু-সতিনে গ্রেবন্ধ দেখিয়া দুর্বল। হৃদয়ে লাগিল তার কালকূট-জ্বালা।। লহনা খুল্লনা যদি থাকে এক মেলি। পাইট করি মরিব দুজনে দিবে গালি ।।। যেই ঘরে দু-সতিনে না হয় কন্দল। সে ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল।। একের করিয়া নিন্দা যাৰ অন্যস্থান। সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান।!"

দুর্বলাদাসী কুটবুদ্ধির অধিকারিণী। খুল্লনা-লহনা বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে দুর্বল দাসীর লোকসান ষোলআনা। সেই কারণে দুর্বল দাসী শঠবুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে কপট চাল চালালো। লহনার কাছে পথমে গজির হল সে! সরলমতি লহনার কাছে গিয়ে সে বলে—

"শুন শুন মোর বোল শুন গো লহনা। আপনি করিলে নাশ এ বেশে আপনা।। ঋজুমতি ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ। দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কালসাপ।।

সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে। অবশেষে এই তোমায় বধিবে পুরাণে।।" –

এভাবেই দুর্বলা লহনার মন জয় করে নেয়। লহনার দুর্বলতা সম্পর্কে দুর্বলা অবগত। বিগতযৌবনা নারীর দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে তাকে দুর্বলা দাসী উত্তেজিত করে তোলে। লহনা নবযৌবনা খুল্লনার সঙ্গে সম্প্রীতির সম্পর্ক রক্ষা করে যাতে না-থাকে সে নিয়ে দুর্বল সক্রিয় ভূমিকা নিল। দুর্বদাসী তাই লহনাকে উপদেশ দিয়ে বলে ওঠে--

"খুল্লনার রূপ দেখি সাধু হবে ভোর। ওই ছাড়াইবে তোমা সোয়ামীর কোল।। কলাপি-কলাপ জিনি খুল্লনার কেশ। অর্ধপাকা কেশে তুমি কি করিবে বেশ।। খুল্লনার মুখশশী করে ঢলঢল। মাছিতায় মলিন তোমার গণ্ডস্থল।। কদম্ব-কোরক জিনি খুল্লনার স্তন। তোমার লম্বিত স্তন দোলায় পবন।। ক্ষীণমধ্যা খুনা যেমন মধুরী। যৌবন বিহীন নমি হৈলা ঘটোদরী।। আসিবেন সাধু গৌড়ে থাকি কতদিন। খুল্লনার রুপে হবে কামের অধীন।। অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে। মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে।।"

দুর্বলার এই উপদেশ লহনার চরিত্রে খুল্লনার প্রতি শত্রুতার অধ্যায়কে জাগিয়ে তোলে। ঈর্ষার জ্বালা, বিগতযৌবনা লহনার নষ্ট যৌবনের জ্বালা-যন্ত্রণা অপমানজনিত রুক্ষ শুষ্কতা থেকে চিরবৈরিতার ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করে দিল। লহনা দুর্বলার বশীভূত হল। দুর্বলাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে বসল লহনা। দুর্বলার প্রতি সন্তুষ্টচিত্ততার প্রকৃষ্ট প্রমাণ লহনার দুর্বলার প্রতি সন্তোষজনক বচন। সে বলেছে—

"উপদেশ দিলে দুয়া জীবন উপায়। তোমা বিনে ইথে মোর কে আছে সহায়।। আমার লাগুক কড়ি তোমার হউক যশ। ঔষধ করিয়া সাধু কর মোর বশ'। তোমা বিনা প্রিয় বড় কে আছে আমার। বিপদ-সাগরে দুয়া হও কর্ণধার।।"

লহনা নিজে ষড়যন্ত্রে বিশেষ পারদর্শী নয় বলেই সখী লীলাবতীর আশ্রয় নিতে হল। লহনার স্বামীর উপর অধিকার হারানোর নানাবিধ কারণের মধ্যে একটি বিশেষ কারণ হল তার বন্ধ্যাত্ব। স্বামী বিরূপ হলে সন্তানকে কেন্দ্র করেও নারীর স্বপ্ন সাধ চরিতার্থ হতে পারে। কিন্তু লহনার সে পথও বন্ধ। এসব কারণে লহনা খুল্লনার প্রতি শত্রুতার চূড়ান্ত রূপ। দেখিয়েছে। নিজের সামগ্রিক ব্যর্থতার, পুঞ্জীভূত জ্বালা যন্ত্রণার ফলশ্রুতি হিসাবে লহনা চরিত্রে স্বামীর বিদেশ যাত্রার কালে চিত্তবিকৃতির প্রকাশ মেলে। এমতাবস্থায় তার মনোভাব

"জীয়ও পতিতে যার কিছু নাহি সুখ।

সেজন মরিলে তার কি হয় দুঃখ।।"

খুল্লনা পুত্রবতী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে লহনার সতীন সুলভ ঈর্ষা আরও বেড়ে গেছে। দুর্বলাদাসীর কুমন্ত্রণা, নিজের বন্ধ্যাত্বের বঞ্চনা প্রভৃতি কারণে লহনা-খুল্লনার সংঘাত প্রবলতর রূপ নেয়। লহনার দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়ে তুলে সতীন সমস্যাকে দুর্বলা প্রবলতর করে তুলেছে এক্ষেত্রে।

লহনা ও দুর্বলাদাসী সমবেত প্রয়াসে খুল্লনার সর্বনাশ সাধন করতে চেয়েছে। আনা। হোল লীলাবতী ব্রাহ্মণীকে। লিখিত হল কপট প্রবন্ধ। ধনপতির জবানীতে এ পত্র লিখিত হল খুল্লনার নিমিত্ত। এই জাল চিঠি সতীন সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলল।

এর পরিপ্রেক্ষিতে লহনা-খুনার মধ্যে শুরু হয় বাকবিতণ্ডা। খুল্লনার রূপনাশের অভিপ্রায়ে লহনালীলাবতী-দুর্বলার সমন্বয়ে এই ক্রিয়াকলাপ নিস্পন্ন হল। বিশেষ করে লীলাবতীর কপট পত্রখানি সতীন সমস্যার সংকটময় পরিণাম সৃষ্টির ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণের লেখনীর ভাষ্যরূপ

"ঔষধ প্রবন্ধ কিছু না লাগিল মনে। ভিতর মহলেতে বসিল দুইজনে।।

খুল্লনার রূপ নাশে চিন্তেন উপায়। উপভোগ দূর হৈলে রূপনাশ হায়!

দুইজনে একভাবে করেন যুকতি। কপট প্রবন্ধে পাতি লিখে লীলাবতী।।"

এসবের ফলশ্রুতিতেই দুসতীনের মধ্যে অঙ্গনেতে চুলোচুলির ঘটনাও দেখা যায়। সমাজ ও সমাজের সমস্যাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে সাহিত্য। সাহিত্যের অঙ্গনে সমাজ সমস্যার চালচিত্রের যথার্থ প্রতিফলন। মধ্যযুগের জনজীবনের বিশেষ করে নারীজীবনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যারূপে দেখা দেয় সতীন সমসা। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী তার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে এই সমস্যাজর্জরিত সমাজের বস্তুনিষ্ঠ চিত্র হাজির করে তার বাস্তবনিষ্ঠার নিদর্শনকে প্রোজ্জ্বল করে তুলেছেন।

১১.৩ ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, প্রবাদ প্রবচন

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণনা, তুলনা, উপমা ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তার দুটি রূপ

ক. প্রথানুসারী সংস্কৃতানুগ ভাষা এবং

খ. লোকায়ত দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত মানুষের মুখের ভাষা।

তবে বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপের ভাষা হিসাবে অবশ্যই লোকায়ত জীবনের আটপৌরে ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আখেটিক খণ্ড থেকে একটি বর্ণনা দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে

'অনুদিন পশুবধে বীর মহাবল কুরুরণে সেনা-জেন বধে বৃহন্নল।

মন্তব্য

শুণ্ডে ধরি মাতঙ্গ গজ আছড়িয়া মারে দণ্ড উপাড়িয়া বীর আনে বোঝাভারে।

চুবড়ি মুলাইয়া হাটে বেচয়ে ফুল্লরা কৃষাণ জেন হাটে দেই মুলার-পশারা।

ক. এখানে প্রথানুগ উপমার ব্যবহার আছে বীর কালকেতুর পশু শিকারের প্রসঙ্গে। প্রসিদ্ধ সংস্কৃত মহাকাব্যের ঘটনা বিশেষ তুলনার বিষয় হয়ে উঠছে। বীর কালকেতুর হাতে, পড়ে পশুদের অবস্থা কেমন হয়েছিল, সেটি বোঝানর জন্য কবি মহাভারতের ঘটনা বিশেষের উল্লেখ করে বললেন যে বৃহন্নল (অর্জুন)-এর হাতে পড়ে কুরুসেনাদের যুদ্ধক্ষেত্রে (বিরাটপর্ব) যে অবস্থা হয়েছিল, ঠিক সেইরকম।

খ. সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে আগের উপমাটি সংগ্রহ করলেও পরের অংশে - আমরা দেখি কবি প্রথার বাইরে এসে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উপমা ব্যবহার করেছেন। সেখানে প্রাণের উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছে। ফুল্লরার হাটে মাংস বিক্রির বর্ণনা তুলনীয় হয়েছে কৃষাণের হাটে মুলার পশারা দেওয়ার সঙ্গে।

শব্দ-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও উপরে উল্লিখিত দৃষ্টান্তে দুটি রীতি চোখে পড়ে।

ক. তৎসম শব্দের ব্যবহার এবং

খ. লোকায়ত শব্দের ব্যবহার। শুণ্ড, মাতঙ্গ ইত্যাদি শব্দের পাশাপাশি চুবড়ি, পশারা প্রভৃতি শব্দও ব্যবহার করে স্বাধীনবোধের পরিচয় রেখেছেন কবি। কেতাবী ভাষার ব্যবহারে মাঝে মাঝে যে ধরণের নিষ্প্রাণতা এসেছে তাকে কাটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে লোকায়ত ও আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে। অবশ্যই তা স্বাভাবিক হয়েছে কেনা ভাষা ভাবপ্রকাশের মাধ্যম। বিষয় যেখানে ব্যাধজীবন ও ব্যাধসমাজ, সেখানে। আরণ্যক সমাজে ব্যবহৃত মানুষের মুখের ভাষাই স্বাভাবিক ও প্রাসঙ্গিক হবে তাতে কোন সন্থে নেই। আর তা যে প্রাণোত্তাপপূর্ণ হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

দুই ধরণের ভাষারীতির জন্য অবশ্য সবসময় বর্ণনার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আসে নি এবং অনেকসময় বিভিন্ন চরিত্রের আচরণের মধ্যে অসঙ্গতি চলে এসেছে। কবি তার

অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে যেখানে বর্ণনা দিয়েছেন বা চরিত্রের মুখে সংলাপ বসিয়েছেন সেখানে তা জীবন্ত ও স্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের সংস্কার কবির মনকে পুরোপুরি স্বাধীন হতে দেয় নি। মৌলিকতার উপর নির্ভর না করে কবি কৃত্রিম উপায়ে ভাষা ব্যবহার করতে গেছেন। দোটানায় পড়ে মাঝে মাঝে কবির শিল্প বোধ ব্যাহত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই অস্বাভাবিকতা আমাদের চোখে পড়ে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক— |

দেবী চণ্ডী ফুল্লরার কাছে নিজের মিথ্যা পরিচয় দিলে তাকে ফিরে যাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে ফুল্লরা গা োলাহাটে এসেছে কালকেতুর কাছে। কালকেতু তাকে কাঁদতে দেখে তার কারণ জানতে চেয়েছে। ব্যাধ দম্পতির আচরণ ও তাদের সংলাপের ভাষা যথাসাধ্য কবি তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে নিয়েছেন বলে স্বাভাবিক ও জীবন্ত হয়েছে। তাদের সংলাপের কিছুটা অংশ উদ্ধার করছি -

গদগদ বচনে রাঙ্গা চক্ষে বহে নীর সবিস্ময় হইআ জিজ্ঞাসা করে বীর।

সাসুড়ি ননদি নাঞি নাঞি তোর সতা কা সনে কল করি চক্ষু কৈলে রাত।।

সতা সতা নহে প্রাণনাথ মোর সতা ইবে ফুল্লরারে হৈল বিমুখ বিধাতা।

পিপিড়ায় পাক উঠে মরিবার তরে কাহার সোলস্যা কন্যা আনিআছ ঘরে।”

ব্যাধ-দম্পতির সংলাপে যেভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা মোটামুটি অন্ত্যজ সমাজের মুখের ভাষা। পিপিড়ায় পাক উঠে মরিবার তরে'—এই প্রবচনটিও কবি লোকায়ত অভিজ্ঞতা। থেকে নিয়েছেন। প্রাণনাথ' বা ‘বিধাতা ইত্যাদি দু-একটি সাহিত্যের প্রসিদ্ধ শব্দ ছাড়া প্রায় সবই আঞ্চলিক লোকব্যবহৃত শব্দ। এই সব শব্দ ও প্রবচন ব্যবহারের ফলে চরিত্র দুটিও আমাদের কাছে জীবন্ত ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

কিন্তু পরক্ষণেই কালকেতু যখন ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে পুরাণ-ভাণ্ডার থেকে উপমা গ্রহণ করে উপদেশ দিতে শুরু করেছে তখন তার মুখের বাণী কৃত্রিম হয়ে উঠেছে এবং ব্যাধ কালকতেও অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। কালকেতুর সংলাপের কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

ছাড়িআ ব্যাধের বাস   চল বন্ধুজন পাশ থাকিতে থাকিতে দিননাথে

যদি হয় পাপ নি লোকে গাব দুর্ভাষা   রজনি বঞ্চিবে কার সাথে।

—এই উপদেশের মধ্যে লোক বিশ্বাস কাজ করছে। কালকেতুর মুখে এই সংলাপ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তার পরেই তার মুখে রামায়ণের সীতার উল্লেখ কিছুটা বেমানান

সীতা পরম সতী তার শুন দুর্গতি দৈবে ছিলা রাবণ ভবনে।

রণে রাম তারে হানি! সীতা জানকীরে আনি পুনুর্বার পাঠাইল কাননে।

দৃষ্টান্ত সহযোগে কালকেতুর এই উপদেশ প্রদান অপেক্ষা তার পরবর্তী আচরণেই বরং স্বাভাবিক ব্যাধস্বভাব বেশি করে ফুটে উঠেছে।

একাকিনী যুবতি ছাড়িলে নিজঘর উচিত বলিতে কেনি না দেহ উত্তর।

বড়ার বহুআরী তুমি বড় লোকের ঝি তমার মোহন রূপে মোর লাভ কি। শতেক রাজার ধন আভরণ অঙ্গে মোহিনী হইআ ভ্রম কেহ নাহি সঙ্গে। চোর খণ্ডা হইতে কিবা নাঞি ফর ভয় চরণে ধরিআ বলি ছাড়হ নিলয়। হিত উপদেশ বলি শুনহ বেভার নিকটে কলিঙ্গরাজা বড়ই দুর্বার। আমার বচনে চুল বড় পাবে সুখ রাজার গোচর হইলে পাবে বড় দুঃখ। এত বোলে চণ্ডী যদি না দিলা উত্তর। ধর্ম সাক্ষি করে বীর জোড় করি কর। শরাসনে আকর্ণ পুরিত কৈল বাণ ।

—ব্যাধের পক্ষে এই আচরণ অত্যন্ত স্বাভাবিক।

কবি বিভিন্ন দেব-দেবীর বন্দনা, নায়ক, নায়িকার রূপের বর্ণনা, দেবতার স্তবস্তুতি ইত্যাদি করেছেন সংস্কৃত কাব্যের রীতিনীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে। সেইসব বন্দনা, বর্ণনা ও স্তবস্তুতির ক্ষেত্রে ভাষাব্যবহারে ও শব্দযোজনায় সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব মেনে নিয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে কবি স্বাধীনতা অবলম্বন করেছেন এবং কবি হিসাবে সাফল্যও অর্জন করেছেন। মুকুন্দের কবিচিত্তের মূল ছড়িয়ে পড়েছে বাস্তব জীবনের গভীরে। মঙ্গল কাব্যধারার কবি বলে তাঁকে গতানুগতিক ভাবে ধরা বাঁধা কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের নামের তালিকা তৈরী করতে হয়েছে,

নারীদের পতিনিন্দার বিবরণ দিতে হয়েছে—নায়িকার বারমাস্যা সংযোজন করতে হয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে প্রথানুসারী হয়েও তিনি তার স্বাধীন চিত্ততার পরিচয় দিতে পেরেছেন। শক্তিশালী কবি বলেই মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। নগর নির্মান প্রসঙ্গে প্রজা আগমনের কথা বলতে গিয়ে বিভিন্ন জাতির মানুষের বাস্তব বিবরণ দিলেন নিজের চোখে দেখা বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগালেন। অরণ্যের পশুদের তালিকা দিলেন প্রথাকে মেনে নিয়েই। কিন্তু পশুরা মানবস্বভাব পেল কবির - । লেখনীর গুণে—এখানেই কবির বিশিষ্ঠতা। আর এইসব বিবরণ দিতে গিয়ে কবি যে সব শব্দ। নির্বাচন করলেন তাতে লোকায়ত জীবনই হয়ে উঠল মূল আধার—পুথির ভাণ্ডার নয়।' কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে

ধরণী ললাটাইয়া কান্দে বীর আদ্য বরা অরুণ লোচন যুগে বহে জলধারা।

সশুর সাশুড়ি মৈল দেওর ভাসুর, পতি মইল রতিসুখ বিধি কৈল দূর।

ছিল অভাগীর এক পেটরাড় পোয় পারিব কেমতে তাহার মায়া মো।

—এখানে বরা বা ব্রাহ মানব-স্বভাব পেয়েছে। দেবীর কাছে অত্যাচারিত বরার কান্না যেন দরিদ্র শ্রেণীর কোন মানুষের। তার ভাষাও মানব সমাজের জীবন্ত ভাষা। বিশেষ করে 'পেটরাড়' শব্দটি। এই গ্রাম্য শব্দটি অত্যন্ত জীবন্ত ও বাস্তব। শব্দটির অর্থ গর্ভবতী অবস্থায় বৈধব্য। এই বাস্তব শব্দটির প্রয়োগে গ্রাম্য জীবন ও পরিবেশ জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

ফারুনে দুগুন শীত খরতর ঘরা

খুদ সেরে বান্ধা দিল মার্টিয়া পাথরা।

ফুল্লরার আছে কত কর্মের ফল

মাটিয়া পাথরা বিনে নাহি অন্য স্থল।

দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান

আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।

দরিদ্র অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের গৃহের উপকরণের বিবরণে কবি বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। খরা', 'খুদ', 'পাথরা', 'আমানি' প্রভৃতি গ্রাম্য শব্দগুলির জীবন্ত ব্যবহার এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

ব্যাধ জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি যেসব উপমা ব্যবহার করেছেন সেগুলিতে 'বনজঙ্গল জলকাদার গন্ধস্পর্শ আছে। কালকেতু-ফুল্লরা যোটক বোঝাতে গিয়ে কবি বলেন—"খুঁজিয়া পাইল জেন হাঁড়ির মুক্রের সরা। কালকেতুর ভোজনের বিবরণ দিতে গিয়ে কবি বলেন—"ছোট গ্রাস তোলে যেন তে-আঁটিয়া তাল।' কালকেতুর শিকারের বর্ণনা—

হাতে টাঙ্গি ধরি বীর কাটে করিশুণ্ড! বালক কৃষাণ যেন কাটে ইক্ষুদণ্ড।

--এইসব উপমা ছবি হয়ে উঠেছে। ডঃ ক্ষেত্রগুপ্তের ভাষায়--"এসব তরতাজা শব্দচিত্রের তুলনায় সংস্কৃত কাব্য ঘেঁটে জোগাড় করা উপমা, বর্ণনা একেবারেই শীতল মনে হয়।" (কবি মুকুন্দরাম---ক্ষেত্রগুপ্ত)

চণ্ডীমঙ্গলের ভাষার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই কাব্যে আরবী রসি শব্দের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। উচ্চবর্ণের হিন্দু লেখক হয়েও নবাগত মুসলমান সংস্পর্শজাত। ভাষা প্রয়োগে কবির মানসিক বাধা জন্মায়নি। সংস্কৃতানুগত্য থাকা সত্ত্বেও ইসলামী শব্দ প্রয়োগে কবি ছিলেন অকৃপন। এর মধ্য দিয়ে কবির লোকায়ত জীবনানুরাগই প্রবল হয়ে উঠেছে। একটি দৃষ্টান্ত---

ফজর সময়ে উঠি বিছাই লোহিত পাটী পাঁচুবেরি করয়ে নমাজ
সোলেমানী মালা ধরে জপে পীর পেগম্বরে পিরের মোকামে দেই সাজ।

-'ফজর', 'নমাজ', 'সোলেমানী', 'পীর পেগম্বর', 'মোকাম' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যনীয়।

বাংলা প্রবাদ প্রবচনের নিপুন প্রয়োগে মুকুন্দরাম অনন্য। পিপিড়ার পাক উঠে মরিবার তরে হরিণ ভুবন বৈরি আপনার মাসে', 'ধরিতে রাঙন হইসা চাহ সুধাকর', 'খলের বচনে নাহি করও প্রমান'—ইত্যাদি প্রবাদ-প্রবচনগুলিতে বাংলার মাটির স্পর্শ আছে।

মধ্যযুগের। প্রথা অনুযায়ী কবি পয়ার-ত্রিপদী ছন্দোবন্ধে কাব্য রচনা করেছেন। দৃষ্টান্তঃ

পয়ার

বীরহস্তে দিলা চণ্ডী মাণিক্য অঙ্গুরী। লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী।

ত্রিপদী—

বীরের বচন শুনি আসিয়া বলে বেণেনী: আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার।

শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার—দুই ধরণের অলঙ্কার প্রয়োগে কবি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। দৃষ্টান্ত :

শব্দালঙ্কার

(ক) বিধিমুখে বেদবাণী বন্দোঁ দেবী বীণাপাণি ইন্দু কুন্দ তুষার-সঙ্কাশা।।

(অনুপ্রাস)

(খ) আছিলাঙ একাকিনী বসিয়া কাননে আনিল তোমার স্বামী বান্ধি নিজ গুণে।।

(শ্লেষ)

অর্থালংকার

(ক) ইন্দীবর জিনি তিন লোচনের শোভা। (ব্যতিরেক)

(খ) কি কব দুঃখের কথা ।

গঙ্গানামে মোর সতা স্বামী তারে ধরিলা মস্তকে। (ব্যাজস্তুতি)

১১.৪ নির্বাচিত প্রশ্ন

- চন্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি মুকুন্দের ভাষা-ছন্দ- অলংকার –প্রবাদ প্রবচন ব্যবহারের কৌশল আলোচনা কর ।
- চন্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি মুকুন্দের সতীন সমস্যার দিকটি আলোচনা কর।

- কবি মুকুন্দের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে বৈষ্ণবীয় প্রভাব কতখানি রয়েছে আলোচনা কর ।

১১.৫ সহায়ক গ্রন্থ

চন্ডীমঙ্গল পরিক্রমা - সুখময় মুখোপাধ্যায়

কবি মুকুন্দ রাম - ক্ষেত্রগুপ্ত।

চন্ডীমঙ্গল -এস, ব্যানার্জী

বাংলা মঙ্গল কাব্যর ইতিহাস - আশুতোষ ভট্টাচার্য

একক ১২- চন্ডীমঙ্গলের চরিত্র

বিন্যাস ক্রম

১২.১ চন্ডীমঙ্গলের চরিত্র – ভূমিকা

১২.২ শিব ও চণ্ডী

১২.৩. কালকেতু ও ফুল্লরা, মুরারি,ভাঁড়ু

১২.৪ ধনপতি-খুল্লনা-লহনা-দুর্বলা

১২.৫ নির্বাচিত প্রশ্ন

১২.৬ সহায়ক গ্রন্থ

১২.১ চন্ডীমঙ্গলের চরিত্র - ভূমিকা

আমাদের দেশে মধ্যযুগে ব্যক্তি-ভাবনার উদ্ভব হয়নি। কিন্তু শিল্পীরা কেবল শিল্প-চেতনার বলে কখনো কখনো ব্যক্তির স্বাতন্ত্রের কেন্দ্রে পৌঁছেছেন। তাকে রূপায়িত করেছেন। সচেতন সমাজ তথা জীবনচিন্তায় ব্যক্তিবোধের এই সিদ্ধি তখনো বিলম্বিত ছিল।

অবশ্য সামাজিক 'টাইপ' চরিত্রাঙ্কনে অনেক কবিই অল্পাধিক সাফল্য অর্জন করেছেন। মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে উল্লেখযোগ্য বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা, বিজয় গুপ্তের মনসা, বিজয় গুপ্ত নারায়ণ দেবের চাঁদ সদাগর ও বেহুলা। মুকুন্দরাম শেষোক্ত দুজনের তুলনায় অনেক শক্তিমান এবং বড়ু চণ্ডীদাসের চেয়ে ন্যন তো ননই, আরও মার্জিত। কিন্তু উল্লিখিত চরিত্রগুলির মাহাত্ম্য তার একটি চরিত্রেও নেই।

বড়ু চণ্ডীদাসের রাধায় সূক্ষ্ম যৌন মনস্তত্ত্বের এক সার্থক ছবি ধরা পড়েছে। বয়ঃসন্ধি থেকে প্রথম যৌবনে পদার্পণের চিত্তগত-চরিত্রগত ক্রমবিকাশ রূপ পেয়েছে। বিজয়

গুপ্তের মনসায় বিরুদ্ধ জীবন-পরিবেশে এক তরুণীর কোমল স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তিগুলি কিভাবে শুষ্ক হয়ে মূর্তিমতী নিষ্ঠুরতা ও সন্ত্রাসে রূপান্তরিত হল তার চিত্র আঁকা হয়েছে। পুরাতন সাহিত্যে এই দুটিই উল্লেখযাোগ্য বিকশমান (dynamic) চরিত্র।

মনসামঙ্গলের প্রথম দিকের কবিরা অর্থাৎ বিজয় গুপ্ত নারায়ণ দেব প্রমুখ চাঁদ সদাগরের যে সুদৃঢ় পৌরুষ এবং আকাশচুম্বী আত্মশ্লাঘার দীর্ণ ট্র্যাজিক মূর্তি গড়েছেন তার তুলনা মধ্যযুগে নেই, নবযুগেও অল্পই আছে। তাদের বেহুলা চরিত্র-পরিকল্পনা একেবারে ভিন্ন ধাতুর। কোমলে এবং কঠোরে এমন মিলন দুর্লভপ্রায়। বস্তুজগৎ থেকে মানুষের চিরন্তন আশার মতোই মৃত্যরাজ্যে তার অভিযান জীবনকে ফিরিয়ে আনবার জন্যই।

মুকুন্দরাম এ-জাতীয় একটি চরিত্রও রচনা করতে পারেননি। রাধা বা মনসার মতো ক্রমপরিবর্তমান চরিত্রচিত্র আঁকবার চেষ্টা তিনি করেননি। চাদের মতো ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলবার ক্ষমতা তার ছিল না। বেহুলা-চরিত্রের ভিত্তিতে যে রোমান্টিক কল্পনা তার সঙ্গে মুকুন্দরামের শিল্পীচিত্তের পরিচয় ছিল না।

মুকুন্দরাম বড় কিছু গড়েননি। না গল্পে, না চরিত্রে। বাংলা দেশের সমতল মাটির কাছাকাছি কিছু, বাংলার পরিবারজীবনের নিত্য-পরিচিত কিছু, অভিজ্ঞতাস্পশী বাস্তব কিছু। তৈরি করায়ই তার আনন্দ, তার সাফল্য।

মুকুন্দরামের তিনটি কাহিনীতে কাউকে না কাউকে নায়কের ভূমিকা নিতেই হয়েছে।' দেখণ্ডে নায়ক না হলেও নায়িকা থাকার কথা। ব্যাধখণ্ডে কালকেতুর ভূমিকাই প্রধান। বণিকখণ্ডের দুটি আখ্যানেই ধনপতির নায়ক পরিচয় গ্রাহ্য। কিন্তু নায়কোচিত ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য তথা আদ্যন্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রণী শক্তি এদের কারুর নেই। এদের কর্মকাণ্ডে বিপুলতা নেই, বিস্তৃতি নেই। আসলে মুকুন্দরামের চরিত্রগুলি চরিত্র-চিত্র। জীবন্ত কিন্তু স্থির। তাদের একটা মূর্তিই " সত্য, জীবন-পরিবেশের পরিবর্তনও তার গোড়া নাড়াতে পারেনি, তার বিচিত্র বৃত্তিকে। শাখায়িত করে তোলেনি।

মুকুন্দরামের চরিত্রগুলি জীবন্ত। তাদের আচরণে এবং ভাষায় ধমনীর রক্তচাঞ্চল্য যেন অনুভব করা যায়। কিন্তু তাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে জটিলতা বেশি নেই। দেবখণ্ড বা কালকেতুআখ্যানের কোন পাত্রেই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার পরিচয় নেই। তবে ধনপতির প্রথম আখ্যানের কোন কোন চরিত্রে জটিলতা কিছুটা আছে।

অবশ্য কবির সব কটি চরিত্রই বাস্তববাদী ভাবনার ফল। মুকুন্দরামের কবি-প্রাণের বিশিষ্টতার দিক থেকে তাই-ই স্বাভাবিক। পরিচিত জীবন-পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকেই এরা আমন্ত্রিত। বস্তুবাদী শিল্পী যে নিষ্ঠায়, যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চরিত্রসৃষ্টি করেন তার অনেকটাই যে কবির আয়ত্তে ছিল এখানে তার প্রমাণ আছে। তার দুটি মুখ্য লক্ষণ কবির সহানুভূতিতে এবং সর্বত্র বর্ষিত কৌতুকরসে। এই দুটি স্বর্গীয় পদার্থই প্রায় নির্বিচারে দান করেছেন কবি। দুইয়ের সহজ সংযোগে প্রথম বৃত্তির আর্দ্র ভাবালুতা এবং দ্বিতীয়টির ব্যঙ্গধর্মী উৎকেন্দ্রিক সংযত হয়েছে। এখানেই মুকুন্দের শ্রেষ্ঠত্ব।

চরিত্র রচনায় কবির অন্যতম কৃতিত্ব বৈচিত্র্যের মহলে মহলে সমান স্বচ্ছন্দ পরিক্রমায়। গ্রাম্য প্রৌঢ়ের ভোজনলোলুপ কর্মবিমুখ বালসুলভতা, নাগরিক বণিক নন্দনের স্বভাবভ্রমরবৃত্তি, ব্যবসায়ী বেনের বাক্-বিন্যাসের কৌশলে নিত্যশাঠ্য, অপগত-যৌবন নারীর সপত্নীযন্ত্রণা, মহাশক্তিমান ব্যাধের স্বল্পবুদ্ধি বীরত্বের অতিরেক, তরুণীর প্রণয়-রোমান্টিক ভাৰবৃত্তির সঙ্গে উচ্চরব সপত্নীকলহের মিশ্রণ, ব্যর্থজীবন চতুর কায়স্থ সন্তানের খলতা---- মধ্যযুগে একজন কবির সৃজনক্ষমতা এত বিচিত্রকে আয়ত্ত করতে চায়নি, পারেনি। সীমাবদ্ধ অর্থে হলেও মুকুন্দরাম সম্পর্কে কি বলা যায় না ‘Here is God's plenty'। অথচআশ্চর্য এর দুটি চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য শুধু পরিস্থিতিগত নয়। ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতেই এই পার্থক্য। মুরারিও শঠ। কিন্তু ভাডু র পরিবেশে পড়লেও সে ভাঁড়ু হয়ে উঠত না। সতীন-কলহে খুল্লনাও পিছু পা নয়, কিন্তু লহনার সঙ্গে তার গোড়ায় পার্থক্য। ফুল্লরা ফুল্লরাই। সম্পদ লাভ করেও সে লহনা বা খুল্লনা কারুর চরিত্র-সামীপ্য পায়নি।

এখানেই মুকুন্দ অনন্য এবং মধ্যযুগে এ শক্তি ছিল একান্ত দুর্লভ।।

১২.২ শিব ও চণ্ডী

বাংলার শিবের দেশগত কতকগুলি বিশিষ্টতা আছে, পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে যার গোড়ায়। অমিল। যদিও কিছু পুরাণানুমোদিত লক্ষণ আমাদের শিবেও মেলে। সেটুকু সর্বভারতীয় ঐতিহ্যের চিহ্ন বহন করছে। এই দুই উপাদান এত বেশি বিসদৃশ যে মেলাবার চেষ্টা সবটাই ব্যর্থ হয়েছে।

মুকুন্দরাম বাংলাদেশের ঐতিহ্য থেকে শিবকে পেয়েছেন। অনেক পুরাণ বিচার করে পুঁথি লিখেছেন তিনি। তা ছাড়া সর্বভারতীয় হিন্দু পৌরাণিক সংস্কারসূত্রে কিছু কথা এসেছে। তা চরিত্রের মূলে পৌছতে পারেনি। আর আছে কালিদাসের কুমারসম্ভবের কিঞ্চিৎ উপাদান। পৌরাণিক হিন্দুর শিব-কল্পনায় যে গম্ভীর সর্বত্যাগী আত্মবিস্মৃত রূপ সত্য, তার সঙ্গে কালিদাসের ভাবনা সুসঙ্গত, কিন্তু বাংলা লোক কল্পনার মিল ঘটানো অসম্ভব। মুকুন্দরামও। সেই অসাধ্যসাধন করতে পারেননি।

শিব মানুষটি বাঙালি কবিদের কাছে প্রায় কখনই খুব গুরুগম্ভীর চরিত্র হিসেবে উপস্থিত হয়নি। একমাত্র নাথপন্থীদের হাতে ছাড়া শিব চাষী, দরিদ্র গৃহস্থ, ভিক্ষুক অথবা ইন্দ্রিয়শিথিল ব্যক্তিরূপে বাংলা শিবায়ন, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও অন্নদামঙ্গলে হাসির খোরাক জুগিয়েছে। কোথাও কখনো যে তাকে ধ্যানস্তব্ধ দেখিনি এমন নয়, কিন্তু কবিরা নির্ভুলভাবে দেখিয়েছেন যে তা নেহাত ভাঙের ক্রিয়া। বাংলা যাত্রার নারদমুনির ভূমিকার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে এর মিল আছে। অবশ্য গোড়ায় আছে পার্থক্য। নারদ হাসিয়েছে কিন্তু নিজে ভাঁড়ের পর্যায় থেকে সমুন্নতি পায়নি। শিব তার যাবতীয় অসঙ্গত আচরণ সত্ত্বেও আপন চরিত্র-বৈশিষ্ট্যেই আমাদের সস্নেহ সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে। বাংলা কাব্যে শিব 'সিরিয়াস' নয়, কিন্তু মধ্যযুগের সাহিত্যসমাজের ভাড়রূপেও তাকে চিহ্নিত করা যায় না।

এই সাধারণ পরিচয়ের মধ্যে বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন সেকালের দুজন কবি। বিজয় গুপ্ত এবং মুকুন্দরাম। শিব এঁদের শিল্পবুদ্ধিকে নাড়া দিয়েছে একেবারেই দুটি স্বতন্ত্র দিক থেকে।

বিজয় গুপ্তের শিব শিথিলচরিত্র গৃহস্থ। দেবসমাজে তার সত্যকার কোন মর্যাদা নেই, কিন্তু পেছন থেকে মর্যাদাবোধ উদ্রিক্ত করে নারদ প্রভৃতিরা মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে মজা দেখে। অল্প প্রশংসায় সে গলে যায়। তখন বিষ খাবার মতো সাংঘাতিক কাজও তাকে দিয়ে অনায়াসে করিয়ে নেওয়া যায়। আবার অল্পেই সে ক্রুদ্ধ হয়ে তাণ্ডব বাধিয়ে দেয়। শিবের আনন্দ ও বেদনার প্রকাশে মাত্রাতিরিক্ত শিশুসুলভতা তাকে আরও কৌতুকাশ্রয়ী করে তুলেছে। মনসার বিষে চণ্ডীর মূছা দেখে তার উচ্চকণ্ঠে রোদন অথবা বচাই-এর প্রাণলাভে নাচে শিব দিয়া বাহু নাড়া দেখে চরিত্রটির মূলগত উপভোগ্যতায় কোন সন্দেহ থাকে না। বিজয় গুপ্তের শিব বিশেষ করে ইন্দ্রিয়দুর্বল ব্যক্তি। শিবের চরিত্রে গৌরীর সন্দেহ, আঁচল বেঁধে নিদ্রা, গ্রন্থি ছিড়ে দিয়ে শিবের পলায়ন, ডোমবধূর প্রতি আচরণ, মনসার জন্ম-বিবরণ, যৌবনপ্রাপ্ত অপরিচিত মনসাকে দেখে চাঞ্চল্য, এমন কি শা োকক্লিষ্ট রূপসী বেহুলার নৃত্যোপভোগের বাসনা---সব কিছুই তার চরিত্রের একটি কেন্দ্রের প্রতি নির্দেশ করে। কিন্তু তবু শিব পাঠকদের ভৎর্সনা ও ঘৃণা জাগায় না। হাস্যের স্পর্শে তাকে লাম্পট্যের গ্লানি থেকে মুক্ত করেছেন কবি।। মুকুন্দরাম শিবের ইন্দ্রিয়-দৌর্বল্যকে প্রাধান্য দেননি।

মুকুন্দরামের শিব একবার রুদ্ররূপ ধরেছিলেন দক্ষজ্ঞ ধ্বংস করার সময়ে। কিন্তু এই পরিচয় পুরাণকাহিনী থেকে সঙ্কলিত। মৌলিক অংশের সঙ্গে এর দূরত্ব অনেকটা। একবার তপস্যায় বসেছিলেন তিনি, কাম ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু তাও কালিদাসের প্রভাবে। কপর্দীর সেই নিবাতনিষ্কম্প ধ্যানমূর্তি এবং কামজয়ী তৃতীয় নয়নের অগ্নিদাহ অনুকৃত উপাদান রূপে মাত্র আছে, মুকুন্দরামের লোকায়ত শিবকে তা মহিঃ সমুন্নতি দিতে পারেনি।

কবিকঙ্কণের শিব পত্নীভীত। পত্রীবশও। নিষেধ না শুনেও যখন সতী বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃগৃহে চলল শিব বিব্রত হলেন। সন্ত্রস্তও। দ্রুত নন্দীকে আদেশ দিলেন যাত্রার ব্যবস্থা করে দিতে। সতীর মৃত্যুতে বালকের মতো মাটিতে লুটিয়ে শিবের ক্রন্দন আন্তরিকতার বর্ণপাতে সার্থক।

অশ্রুমুখে বার্তা কহে নন্দী মহেশ্বরে।

লোটায়ে কান্দয়ে রুদ্র মহীর উপরে।

সতি সতি করিয়া আকুল শূলপাণি।

ত্রিজগৎ নাথ হৈয়া লোটায় ধরণী।

দক্ষযজ্ঞের পুরাণ-কথার মধ্যেও একান্ত মচারী ব্যক্তিটিকে আবিষ্কার করেছেন মুকুন্দ দ্বিধাহীন চিত্তে।

শিব-পার্বতীর কাহিনীতে শিবের দারিদ্র্যকে বিশেষ বড় করে দেখানো হয়েছে। এই দরিদ্র ব্যক্তিটি একান্ত কর্মবিমুখ। শ্বশুরঘরে নিশ্চিন্ত আহারাদির উত্তম ব্যবস্থায় সে সন্তুষ্ট ছিল। পত্নীর তাড়নায় নিজগৃহে ফিরে আসতে হল। এবং বাধ্য হয়ে ভিক্ষায় বেরুতে হল।

কিন্তু দ্বিতীয় দিন আর ভিক্ষায় যাবার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না শিবের।

কালি ভিক্ষা করি দুঃখ পাইনু বহু ধামে।

সকালে খাইয়া অদ্য থাকিব আশ্রমে।

কর্মে যতটা অরুচি আহারে আবার রুচি ঠিক ততগুণ। আহার্য কোথা থেকে আসবে সেভাবনা নেই। কিন্তু ভোজনবিলাসী মন নানা ব্যঞ্জনের আলোচনা থেকে যতটা সম্ভব রস টেনে নিতে ক্লান্তিহীন। অবশেষে যখন গৃহকর্তা শুনল ক্ষুদকণাও নেই ভাণ্ডারে তখন গৃহিণীর উপরে মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। গৌরীর সঙ্গে কলহ শুরু হল। গৃহ ছেড়ে বৈরাগী হবার বাসনা শিব প্রকাশ করতে লাগল।

মুকুন্দামের শিব যেমন অলস তেমনি লোভী, তার চেয়েও বেশি অবুঝ। এ শিবে মহিমা নেই, কামুকতাও নেই। এ জাতীয় প্রৌঢ় গ্রামীণ মানুষ এদেশের অভিজ্ঞতার সত্য। মুকুন্দরাম নিকট অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে সংগ্রহে ত্রুটিহীন।

কিন্তু বাংলার কোন কবি শিবকে এতটা কামুকতামুক্ত—একেবারে পুরো ইন্দ্রিয়শৈথিল্যের ঊর্ধ্বচারী করতে চেয়েছেন কি? এখানে কি মুকুন্দরামের পিউরিটান মনের ছাপ পড়েছে?

কবি প্রত্যক্ষত চণ্ডীমাহাত্ম কাব্য লিখেছেন। কাব্যরীতির দিক থেকে আরাধ্য দেবীর ক্ষমতার পুর নিদর্শন কাব্যমধ্যে স্থাপনের বাসনা তার হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য কবির দৃষ্টির বাস্তবতা অতিলৌকিককে বাধাহীন করে তোলেনি। কবির চণ্ডী গোটা কাব্যের অংশে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আদ্যন্ত তার চরিত্র-সঙ্গতি-বিধানের চেষ্টা কবি করেননি।

সতীই জন্মান্তরে উমারূপে দেখা দিলেন। এ বিশ্বাস ভক্তের। এদের দুটি চরিত্রকে সাহিত্যের দিক থেকে এক করে দেখবার কারণ নেই। সতীর রূপ পুরাণানুসরণে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বিবর্ণ নয়। পিতৃগৃহে যাবার আবেদনে বাঙালি বধূর ভাষা তার কণ্ঠে বসিয়ে কবি নিজস্ব বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন।

উমার কুমারীচিত্র কালিদাসের অনুসরণে আঁকবার চেষ্টা কবি করেননি। কুমারসম্ভবের ঋণ যেখানে আছে উমা সেখানে প্রায় অন্তরালবর্তিনী। না হলে বিবাহোত্তর জীবন-চিত্রের সঙ্গে বৈপরীত্য অসঙ্গত হত।

বিবাহিতা উমার পিতৃগৃহবাসের ছবিটি যত সংক্ষিপ্ত তত প্রাণময়। আলস্যের খেলায় দিন কাটানো, সংসার-কর্মের প্রতি সম্পূর্ণ অবহেলা, মাতার সঙ্গে কলহ এবং তীব্র অভিমান-ধনীগৃহে আদরে লালিত কন্যার একটি স্বাভাবিক চিত্র। কৈলাসে স্বামী-গৃহে গমনের পরে দারিদ্রের চাপে তার আলস্যবিলাসের দিনগুলি পুরোই বিস্মৃত। তবে নিপুণ হাতে নিজের সংসারটি গুছিয়ে চালাবার চেষ্টা কিছুটা আছে। শিবের মতো স্বামী নিয়ে অবশ্য তা সম্ভব ছিল। তার বিবাহ জীবনের অভিমানী মন একেবারে যায়নি, তার প্রমাণ স্বামীর সঙ্গে তীব্র কলহে এবং সংসারের দারিদ্র্য ঘোচাবার জন্য অপদার্থ স্বামীর অপেক্ষা না রেখে নিজেই সচেষ্ট হয়ে ওঠায়।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী নিজের দারিদ্র্য ঘোচাবার জন্য পূজা-প্রচার করতে মতে নেমেছেন, বিশুদ্ধ মাহাত্ম প্রচারের জন্য নয়। কিন্তু মাগত চণ্ডীর সঙ্গে দেখণ্ডের উমার চরিত্রগত কোন সংযোগ নেই। এ সংযোগ আছে মনসামঙ্গলের মনসা-চরিত্রে। দেবখণ্ডে মনসার রুদ্র ব্যক্তিত্বের ভিত্তি রচিত। তার নিষ্ঠুর সন্ত্রাসক্রর প্রকাশ ঘটল নরখণ্ডের কাহিনীগুলিতে। মনসা নরখণ্ডের একটি প্রধান চরিত্র। নায়কের সঙ্গে সংঘর্ষে, ঘটনার

গতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায়, জয়ের উল্লাসে, পরাজয়ের লাঞ্ছনা ও বেদনাবহনে তার জীবন্ত উপস্থিতি সর্বত্র অনুভব করা যায়। চণ্ডীর গুরুত্ব মনসার তুলনায় অনেক কম। ধনপতির প্রথম আখ্যানে বহু চেষ্টায় চণ্ডীর জন্য কাহিনীর অভ্যন্তরে একটি স্থান করে নেওয়া হয়েছে। সে খুল্লনার হারানো ছাগল এবং প্রবাসী স্বামীকে পাইয়ে দিয়েছে। গল্পের প্রধান আকর্ষণের সঙ্গে তার বড় যোগাযোগ নেই। চণ্ডীর কোন চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই কাব্যের এ অংশে প্রকাশ পায়নি।

ধনপতির দ্বিতীয় আখ্যানে চণ্ডীর সঙ্গেই ধনপতির বিরোধ। চণ্ডী মনসার মতো সক্রিয় হয়ে উঠতে পারত। মগরায় নৌকো ডুবানোয়, কমলে-কামিনী ছলনায়, শ্রীপতির প্রাণরক্ষায় চণ্ডী সক্রিয়তা দেখিয়েছে। কিন্তু দেবীর কোন স্পষ্ট বা অস্পষ্ট চরিত্র-রূপ ফুটে ওঠেনি।

কালকেতু-কাহিনীতেও দেবীর দুই রূপে ভিন্নতা আছে। যে রুদ্রতায় তিনি কলিঙ্গ বন্যাবিধ্বস্ত করে ভক্তের রাজ্য জনাকীর্ণ করে তোলেন, তা মঙ্গলকাব্যের ধারানুগ মাত্র। কিন্তু যেখানে তিনি কালকেতুকে ধনদান করতে এসে ফুরার সপত্নীভীতি লক্ষ্য করে তাকে নিয়ে অনুচ্চ কৌতুকে মেতে ওঠেন সেখানে কবিধৃত একটি মৌলরূপ প্রকাশ পায়। রসিকা বঙ্গবন্ধু হিসেবে তাকে চিনতে ভুল হয় না।

কিন্তু দেখণ্ডের চণ্ডীর সঙ্গে স্বভাবগত বিশিষ্টতায় নরখণ্ডের তিনটি কাহিনীর কোনটির দেবীকেই যুক্ত করা চলে না।

১২.৩. কালকেতু ও ফুল্লরা, মুরারি,ভাঁড়ু

পঞ্চভূতের একটি চরিত্রকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়েছিলেন, কবিকঙ্কণ চণ্ডীর সুবৃহৎ সমভূমির মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুন্ননা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থাণুমাত্র এবং ধনপতি ও তাহার পুত্র কোন কাজের নহে। ধনপতি ও শ্রীপতির সক্রিয়তা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে। খুল্লনার চরিত্রও একই প্রসঙ্গে বিচার্য। কিন্তু ফুল্লরা কালকেতুর তুলনায় এমন কিছু বেশি নড়িয়া বেড়ায় না। আর

কালকেতুর বিকৃত বৃহৎ স্থাণুত্ব সৃষ্টিক্ষমতার ব্যর্থতার ফল নয়, চরিত্রসৃষ্টির এক বিশিষ্ট আদর্শের নিদর্শন।

কালকেতু ও ফুল্লরা অন্ত্যজ ব্যাধশ্রেণীর মানুষ। এই শ্রেণীর নরনারীর জীবন ও মনের বিশিষ্টতার পরিচয় মিলছে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায়--

অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা

নাহি কোনো ধর্মাধর্ম নাহি কোনো প্রথা,

নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাহি ঘর-পর,

নাহি কোনো বাধাবন্ধ, নাহি চিন্তাজ্বর

উন্মুক্ত জীবনস্রোত বহে দিনরাত

সম্মুখে আঘাত করে সহিয়া আঘাত

অকাতরে; পরিতাপজর্জর পরানে

বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে

ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়

বর্তমান তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়।

নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি-

সভ্যতার অগ্রগতিতে আমাদের মানসিক জটিলতা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। চিন্তা, বিচারবিশ্লেষণ, সুদূর কামনা-বাসনা প্রভৃতিকে প্রাধান্য দেওয়াই সভ্যতার লক্ষণ। কিন্তু অন্ত্যজ অসভ্য সমাজে চিন্তা ও মননের অতিরেক ঘটেনি। মনের ভূমিকা সামান্যই। দেহবুদ্ধিতে এ শ্রেণীর জীবনবোধের সীমা। রবীন্দ্রনাথ এ-জাতীয় মানুষদের গাছের সঙ্গে উপমিত করেছেন। ‘ঐ একটি লোক রৌদ্র নিবারণের জন্য মাথায় একটি চাদর চাপাইয়া দক্ষিণ হস্তে শালপাতার ঠোঙায় খানিকটা দহি লইয়া রন্ধনশালা অভিমুখে

চলিয়াছে, ওটি আমার ভৃত্য, নাম নারায়ণ সিং। দিব্য হৃষ্টপুষ্ট, নিশ্চিন্ত, প্রফুল্লচিত্ত, উপযুক্ত সারপ্রাপ্ত পর্যাপ্ত পল্লবপূর্ণ মসৃণ চিক্কণ কাঠালগাছটির মতো।

....এই জীবনধাত্রী শস্যশালিনী বৃহৎ বসুন্ধরার অঙ্গসংলগ্ন হইয়া এ লাোকটি বেশ সহজে বাস করিতেছে, ইহার নিজের মধ্যে নিজের তিলমাত্র বিরোধ-বিসম্বাদ নাই। ঐ গাছটি যেমন শিকড় হইতে পল্লবাগ্র পর্যন্ত কেবল একটি আতাগাছ হইয়া উঠিয়াছে তাহার আর কিছুর জন্য কোনো মাথাব্যথা নাই, আমার হৃষ্টপুষ্ট নারায়ণ সিংটি তেমনি আদ্যোপান্ত কেবলমাত্র একখানি আস্ত নারায়ণ সিং।

স্বভাবতই এ-জাতীয় চরিত্র, আমাদের মন-প্রধান জীবনচর্যার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে বেশ খানিকটা স্থাণু বলে বিবেচিত হবে। কালকেতুর জড়ত্ব এই ধরনের। তাই তা কবির সৃষ্টিক্ষমতার ব্যর্থতার পরিচয় বহন করে না, এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জীবন জিজ্ঞাসার বৈশিষ্ট্যের সংবাদ দেয়।

কালকেতু বীর এবং শিক্ষাসংস্কারহীন বর্বর। এই বর্বরতা তার বীরত্বেরও বিশেষণ। কালকেতুর যুদ্ধজয় প্রায়ই অস্ত্রপ্রয়োগের নৈপুণ্যের অপেক্ষা রাখে না। মুষ্ট্যাঘাতে সিংহব্যাঘ্রকে পরাজিত ও নিহত করাতেই তার কৃতিত্ব। কলিঙ্গ-সেনার সঙ্গে যুদ্ধেও সে দীর্ঘকাল সশস্ত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকেনি। ধনুঃশর পরিত্যাগ করে মুষ্টিবদ্ধ হাতে ঝাপিয়ে পড়েছে। আসলে সে কুশলী সেনানায়ক নয়, অমানুষী দৈহিক শক্তির অধিকারী এক মল্ল। পশুসুলভ এই যুদ্ধরীতি অথবা ভোজনবাহুল্য তার চিত্তবৃত্তির আদিম ও অপরিণত গঠনেরই পরিচয় দেয়। দারিদ্র্যের জন্য সে নিত্য হাহাকার করে না, কিন্তু ভোজ্যদ্রব্যের স্বল্পতা তার দেহকে পীড়িত করে। অর্থসম্পদের প্রতি তার লোলুপতা না থাকলেও লোভ আছে। শিকারে যেদিন কিছু জোটে না, আহারের চিন্তাই তাকে বিব্রত এবং চিন্তিত করে তোলে। কবি তার মনে পাপপূণ্য-ভাবনার যে তরঙ্গ উদ্বেলিত করে তুলেছেন তা অনেকখানি আরোপিত। বাহিরের এত ভাবনাবিস্তারের অন্তরালে আসল কথাটি হল অন্নের জন্য দুর্ভাবনা।

কালকেতু তার ব্যাধজীবনের পরিবেশে চতুর না হলেও একান্ত নির্বোধ নয়। প্রয়োজনবোধে মুরারি শীলের ধূর্ততাকে সে প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু তার এ বুদ্ধির প্রসার বেশি নয়। সম্পদদায়িনী দেবীর প্রতি তার সন্দেহ বালসুলভ অপরিণত বুদ্ধিরই পরিচয় দেয়। গুপ্তধনপ্রাপ্তির সেই প্রসঙ্গ থেকে কালকেতুর বুদ্ধি ও যুক্তির দৌড় কতকটা ছিল বোঝা যাবে।

দুই ঘড়া করে ধন বাঁকে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কালকেতু। তৃতীয় বারে যাবার সময়ে দেখল, মাত্র এক ঘড়া ধন বাকি আছে। দেবীকে সেই অর্থের পাহারায় বসিয়ে যাবার ভরসা তার ছিল না।

এক ঘড়া অবশেষ দেখি মহাবীর।।

নিতে নারে দেড়ি ভার হইল অস্থির।

মহাবীর বলে মাতা করি নিবেদন।

চাহিয়া চিন্তিয়া দেহ এক ঘড়া ধন।

যদি গো অভয়া ধন না দিবা অপর।

এক ঘড়া ধন মা গো নিজ কাখে কর।

অস্থির দেখিয়া বীরে ভাবেন অভয়া।

ধন ঘড়া কাঁখে কৈলা বীরে করি দয়া।

আগে আগে মহাবীর করিল গমন।

পশ্চাতে চলিল চণ্ডী লয়ে তার ধন।

মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি।

ধন ঘড়া লয়ে পাছে পলায় পার্বতী।

তার যুক্তির ধারা অনুসরণ করলে সন্দেহ থাকে না যে তার মনের পরিপক্কতা কিছুমাত্র। ঘটেনি। সামাজিক ও সাংসারিক কতকগুলি একান্ত প্রাথমিক বোধের উন্মেষমাত্র ঘটেছিল। এই অপরিণত বুদ্ধিই ধার ও ভারের পার্থক্য বোঝে না, সাত কোটি টাকা মূল্যের মাণিক্য-খচিত অঙ্গুরির তুলনায় সাত ঘড়া ধনই অধিক কাম্য বলে মনে করে। আপন বুদ্ধির সামান্যতার জন্যই আত্মবিশ্বাস নেই, তাই যুদ্ধজয়ের পরেই ধান্যশালায় পলায়ন, তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

ব্যাধজীবনের অরণ্য-পরিবেশে সে জীবন্ত; কিন্তু রাজ্যপরিচালনার বুদ্ধি ও মেধাপ্রধান বৃত্তিতে সে ম্রিয়মাণ! রাজা কালকেতু প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু কিছু সক্রিয়তা দেখিয়েছে। কিন্তু তা কবির বর্ণনামাত্র। রাজারূপী কালকেতুর কোন বিশ্বাসযোগ্য চরিত্রচিত্র প্রকাশ পায়নি। নগরপরিকল্পনা এবং নির্মাণ বিশ্বকর্মা এবং বীর হনুমানের, নাগরিক জনসমাগম ঘটেছে চণ্ডীর চেষ্টায়। গুজরাটের প্রজাকল্যাণকামী ভূমিব্যবস্থা স্বয়ং কবির ভাবনাজাত। প্রজামঙ্গলমূলক এরূপ পরিপক্ক অর্থনৈতিক বিধিবিধান কস্মিনকালেও কালকেতুর মাথায় আসত না, ব্যক্তিগত জীবনে সে ছিল বনচর শিকারজীবী। কৃষকের সমস্যা তার জানবারও কথা নয়। রাজ্যস্থাপনে কালকেতু একমাত্র যে-কাজটি করেছিল তা তারই উপযুক্ত। মল্লযুদ্ধে বনের বাঘ মেরে বসত করা সম্ভব করে তুলেছিল।

আসলে তার সাজানো রাজাগিরি! রাজা কালকেতু রূপশক্তিহীন একটা অস্তিত্বমাত্র। এ-চরিত্র নির্মাণে দুটি মাত্র স্থানে কবি-দৃষ্টি ঔচিত্যভ্রষ্ট হয়েছে। ছদ্মবেশী চণ্ডীকে স্বগৃহে ফিরে যেতে উৎসাহী করবার জন্য পুরাণাদির উল্লেখ কালকেতুর পক্ষে যেমন অসঙ্গত তেমনি অসম্ভব কলিঙ্গরাজের প্রশ্নের জবাবে বক্রচতুর বাক্যে আপন চণ্ডীভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করা।

কালকেতুর চরিত্র-কল্পনার উৎসেও কবির পিউরিটান ভাবনা কার্যকর হয়েছিল। যে মহাবীর তে-আঁটিয়া তালের মতন ‘ছোট’ গ্রাস তুলে আস্ত একটা হরিণের মাংস শেষ করে; বহুসংখ্যক নেউল-পোড়া, অনেক হাঁড়ি আমানির পরেও যার ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটে না, বন্য পশুদের সঙ্গে দাঁতে নখে মল্লযুদ্ধ যার স্বভাবগত তার যৌনজীবনের নিরুত্তাপ

নীরবতা চোখে না পড়ে পারে না। এর পেছনেও কি কবির অতিশুচিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই সক্রিয় নয় ?

ফুল্লরা-চরিত্রেও একই শ্রেণী-পরিচয় আছে। প্রাত্যহিক দারিদ্র্যদুঃখ নিয়ে বিনিয়ে কাদার মতো চরিত্র তার নয়। তার বারমাস্যার দুঃখের গান অন্য উপাদানে গড়া, ভিন্নতর রসের আশ্রয়। ফুল্লরা দারিদ্র্যের বেদনা নিয়ে জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল বলে ভাবে না। কিন্তু সতীন নিয়ে জীবনযাপনে তার কঠিন আতঙ্ক আছে। এই আতঙ্কই তাকে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং অশিক্ষিত পটুত্ব দান করেছিল। বারমাস্যায় তার কৌতুক-মিশ্রিত সুন্দর প্রমাণ কবি দিয়েছেন। ফুল্লরার নিজের বুদ্ধি সম্পর্কে কিছু উচ্চ ধারণা ছিল। ছদ্মবেশী চণ্ডীকে নানা উপদেশ ও নীতিকথায় যখন বিদায় দেওয়া গেল না তখন সে দারিদ্র্যের পল্লবিত বর্ণনা শুরু করল। কিন্তু সে কৌশলও যখন ব্যর্থ হল তখন ব্যাকুল হয়ে গোলাহাটে কালকেতুর কাছে গিয়ে হাজির হল। এই একটিমাত্র প্রসঙ্গ ফুল্লরাকে স্বাতন্ত্রে চিহ্নিত করেছে।

ফুল্লুরা সম্ভবত কালকেতুর তুলনায় নিজেকে কিছু বেশি বুদ্ধিমতী মনে করত। এই প্রসঙ্গে ই মুকুন্দরামের কৌতুকদৃষ্টি অভ্রান্তভাবে এ চরিত্রের মর্মস্থল ভেদ করেছে। লক্ষণীয়, বিশেষ করে দুটি ক্ষেত্রে ফুল্লরা কালকেতুর স্বল্প-বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়েছে, নিজ বুদ্ধির বশে তাকে চালাতে চেয়েছে। তার একটি ক্ষেত্রে ঘটেছে বিপর্যয়।

দেবী যখন আত্মপরিচয় দিয়ে কালকেতুকে অঙ্গুরীয় দান করলেন, ফুল্লরা চণ্ডীর কার্পণ্য মুখ বাঁকা করল। কবি লিখছেন

বীরহস্তে দিলা চণ্ডী মাণিক্য অঙ্গুরী।

লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী।

এক অঙ্গুরীতে প্রভু হবে কোন কাম।

সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম।

এই অঙ্গুরীর মূল্য সাত কোটি টাকা।

ফুল্লরা শুনিয়া মূল্য মুখ করে বাঁকা ।"

ধারের চেয়ে ভারের মূল্য তার কাছ বেশি। তাই

ফুল্লরা রহিল ঘরে ধন করি কোলে।

কিন্তু অতিবুদ্ধির এই প্রয়োগে ক্ষতি হয়নি। দেবদত্ত ধন—অধিকন্তুতে দোষ নেই। সাত ঘড়া ধনের লোভে তাকে সাত কোটি টাকার আঙটি হারাতে হয়নি। কারণ দেবী কালকেতুকে কৃপা করে রাজা করবেনই।

ফুল্লরা দ্বিতীয় বার বুদ্ধির খেলা দেখাতে গিয়ে কিন্তু গুরুতর বিপদ ডেকে এনেছে।। কালকেতু কলিঙ্গরাজ-সৈন্যদের প্রথমে পরাজিত করেছিল। বিপক্ষ সৈন্যবাহিনীর প্রত্যাবর্তনে ফুল্লরা বলল—

প্রাণনাথ শুনহ আমার উপদেশ ।

হারিয়া যে জন যায় পুনরপি আইসে তায়।

হেতু কিছু আছয়ে বিশেষ।

যদি আছে জীয়ে আশা ত্যজিয়া দেশের বাসা

প্রাণ লয়ে চল মহাবীর।

স্ত্রী-বুদ্ধি যে প্রলয়ঙ্করী এবারে তা অচিরে প্রমাণিত হল। সম্ভবত ফুল্লরা-চরিত্রের এই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যর মধ্যে সাংসারিক বুদ্ধিতে আপন শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নারীমাত্রে যে আত্মম্ভরিতা দেখা যায় তার প্রতি কবির কটাক্ষ প্রকাশ পেয়েছে।

মুরারি শীল কালকেতু-আখ্যানের একটি বিশিষ্ট চরিত্র। অবশ্য কাব্যমধ্যে তার ভূমিকা। একান্ত সংক্ষিপ্ত। অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী তার উপস্থিতি। কিন্তু রচনা-কৌশলে পাঠকের মনে সে একটি অনপনেয় ছাপ রেখে যায়। মুরারির চরিত্র-ভিত্তিতে আমরা অতিসাধারণ স্তরের একটি কপট বণিকবৃত্তি লক্ষ্য করি। কিন্তু তাকে অসাধারণ করে তুলেছেন কবি

তিনটি উপায়ে। স্ত্রীর সাহচর্য, বাক-বিন্যাসের পটুত্ব, কৌতুকরসের সহযোগ। একটি শঠ ব্যবসায়ীর চরিত্র। কাহিনীর নায়ককে প্রতারিত করবার জন্য তার চেষ্টার ভূমিকা নিয়েই যে কাহিনীতে স্থান পেয়েছে তার উপস্থাপনায়ও কৌতুকরসের স্পর্শ এনেছেন কবি। তার শঠবুদ্ধি, আচরণ এবং বাকচাতুর্য সব মিলে আশ্চর্য । সংহতি, অথচ সব কিছু জড়িয়ে একটা মৃদু ব্যঙ্গের স্পর্শ—একটি সংযত হাস্যের রেশ। |

মুরারি-চরিত্রের চালচিত্রে তার স্ত্রীকে স্থাপিত করেছেন লেখক। ফলে সে উপযুক্ত পটভূমি। পেয়ে আরও জীবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছে। কালকেতুর সাড়া পেয়ে মুরারি পেছনে পালিয়েছে। স্ত্রীকে কোন উপদেশ তার দিতে হয়নি। পাওনাদারকে ফেরাবার কৌশল তার অজানা নয়।। কালকেতুকে সে নির্বিকার চিত্তে আরও কিছু পণ্যের জন্য হুকুম করে বসল।

বীরের বচন শুনি আসিয়া বলে বেণেনী
আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার।
প্রভাতে তোমার খুড়া গিয়াছে খাতক পাড়া
কালি দিব মাংসের উধার ।
আজি কালকেতু যাহ ঘর।।
কাষ্ঠ আন এক ভার হাল বাকি দিব ধার
মিষ্ট কিছু আনিহ বদর।

শত্রুর আক্রমণের জন্য অপেক্ষা না করে তাকে আঘাতে বিপর্যস্ত করার এই রণকে বড় সেনাধ্যক্ষদেরই মাত্র জানা।

কিন্তু প্রয়োজনে পশ্চাদপসরণ করতেও সে পটু। কালকেতুর কাছে সোনার আঙটি। শুনে বেনেগিন্নীর মুখের চেহারা কেমন বদলে গিয়েছিল কবি তা স্মিতমুখে লক্ষ্য করেছেন।

মুরারির স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়। সে আমাদের কৌতূহলী করে "ছেন। তুরুপের তাস এখনো দেখানো বাকি। মুরারি শাঠ্যে, বাক-ভঙ্গিতে সত্যই ত 'পতিদেবতা'। কবি মুরারিকে রঙ্গমঞ্চে আনবার সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রী সম্বন্ধে নীরবতা করেছেন। বেনেনীর ভূমিকাভিনয় শেষ হয়েছে। একটি মনোরম চরিত্র পূর্ণ করবার পড়ে কবি সংযমচ্যুত হননি। কালকেতুর আগমনে কোটিপতি বণিকের দেড়বুড়ি ঋণ শোধের ভয়ে খিড়কিতে পালানো, আঙটির কথা শুনে 'আসিতে বীরের পাশ ধায় বেণে খিড়কীর পথে'।

কালকেতুকে দেখে সে কিন্তু পুরাতন ধারের কথা তুলল না, আঙটি ক্রয়ের জন্য দেখাল না, কালকেতুর কুশলসংবাদের জন্য আন্তরিক কাতরতা ব্যক্ত করল। কালকে সহজবুদ্ধির মানুষ এই জালে অনায়াসেই ধরা পড়ল। বিক্রেতার মনটিকে একটু নরম। অপ্রত্যাশিতভাবে আসল জায়গায় কঠিন আঘাত করল

সোনা রূপা নহে বাবা এ বেঙ্গা পিতল।

ঘসিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল।।

মুরারির ব্যবসায়ী বাকচাতুর্য সম্বন্ধে আমরা আগের পরিচ্ছেদে সংলাপ বিলো আলোচনা করেছি। মুরারির বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা তার মধ্যে চমৎকার প্রতিফলিত । কালকেতুকে বশ করবার জন্য মুরারি একাধিকবার তার সঙ্গে হৃদয়সম্পর্ক একটু বেশি গলায় ঘোষণা করেছে। কালকেতুর অদর্শনে কাতরতা ব্যক্ত করে তার আবির্ভাব। যখন তার কথার জালে ধরা পড়ল না, সে আবার তার সঙ্গে পিতার কাল থেকে। ঘনিষ্ঠতার কথা পাড়ল।

মুরারির চরিত্রটির আয়োজন অল্প। চরিত্রের কল্পনাও টাইপ ধরনের। কিন্তু এসেছে সিদ্ধি। এই চরিত্রটির পরিকল্পনাও মুকুন্দরামের নিজস্ব। দ্বিজ মাধব প্রভৃতিতে এ চলি নেই।।

ভাড় দত্ত চণ্ডীমঙ্গলের পাতা থেকে বাঙালির মানসলোকে আসন নিয়েছে। এক জীবনের দ্বিতীয় পর্বের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাকে চিহ্নিত করা। ভাড় দত্তের

চরিত্র অবশ্য মুকুন্দরামের মৌলিক কল্পনার নয়। অপরাপর চণ্ডীমঙ্গলে কিন্তু মুকুন্দরামের ভাড়ুই রচনা-সৌকর্যের দিক থেকে উজ্জ্বলতম।

ভাঁড়ু কে শেষ পর্যন্ত 'ভিলেন'-রূপে দাঁড় করানো হয়েছে। কাব্যকাহিনা , সেখানেই তার গুরুত্ব। ভাড় যে দুষ্ট প্রকৃতির অসৎ চরিত্রের লোক প্রথমাবিধি কবি দিয়েছেন। এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই তাকে শেষ পর্যন্ত ভিলেন করে তুলছে। মুকুন্দরাম এই প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট চরিত্র-পরিচয়ে সন্তুষ্ট থাকেননি। তার ব্যক্তিত্বের কোন বিশেষ যত্ন করেছেন। চরিত্র-ভাবনায় এ জাতীয় অন্তদৃষ্টি মধ্যযুগের সাহিত্যে দুর্লক্য প্রায়।

দ্বিজ মাধবের ভাড়ু দত্তের চরিত্রটিও একান্ত মামুলি নয়! কবি এই খল চরিত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন, আপন মনের সহানুভূতির আলো ফেলে। তার খলতার পশ্চাতে একটি বেদনাবিন্দুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। নিঃসম্বল ভাড় দত্তের জীবিকার্জনের ক্ষমতাও নেই

ভাড় দত্ত ডাকি বলে তপন দত্তের মা!

ক্ষুধার কারণে মোর পোড়ে সর্ব গা।

ছলনা আর কয়েকটি কানা কড়ি মাত্র সম্বল করে সে হাটুরেদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে আর পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে। মাছের হাটে টানাটানিতে তার কোচড় থেকে ভাঙা কড়ি কয়টি পড়ে গেল। সেই পরিস্থিতির অপমান ও বেদনাটুকু ধরে রেখেছেন দ্বিজ মাধব।

মুকুন্দরাম ভাড় দত্তের মধ্যে দেখেছেন কাম্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা না পাওয়ায় একটি বিপর্যস্ত চিত্ত-কেন্দ্র। ভাড়া নিজের বংশকৌলীন্য এবং বুদ্ধি ও প্রতিভা সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করত। কিন্তু তার ক্ষমতার পরিমাণ কতদূর, কবি ভাড়ুর প্রসঙ্গ তুলেই সে-কথা বলেছেন। বানের জলে সাঁতার কেটে বাঁচার শক্তিও তার নেই।'

উঠানে ডুবিয়া মরি না জানি সাঁতার।

জটে ধরি পত্নী মোরে করিল নিস্তার ।

আসলে তার দম্ভমাত্র সম্বল। শুধু কাপট্যের মূল্যে, শাঠ্যের কৌশলে সে সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব। পেতে চায়। কালকেতুর সভায় তার আগমনের ছবিটি ভাড়ুর চরিত্রবৈশিষ্ট্য অনেকখানি প্রকাশ করেছে।

ভেট লয়ে কাঁচকলা পশ্চাতে ভাড়ুর শালা

আগে ভাড় দত্তের প্রয়াণ।

ফোটা কাটা মহাদম্ভ ছিড়া ধুতি কোচা লম্ব

শ্রবণে কলম লম্বমান ।

প্রণাম করিয়ে বীরে ভাডু নিবেদন করে '

সম্বন্ধ পাতিয়া খুড়া খুড়া।

ছেড়া কম্বলে বসি মুখে মন্দ মন্দ হাসি

ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া।

কিন্তু জীবনে কাম্য সেই মর্যাদাপ্রাপ্তি ঘটেনি। সামাজিক মানী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাই তার জাতক্রোধ। বুলান মণ্ডলকে প্রজামুখ্যের সম্মান দিলে সে ক্ষোভ ঢেকে রাখতে পারে না--

দিয়ান ভেটের বেটা বহিত আমার চিঠা

যারে বল বুলান মণ্ডল।

ভাডু দরিদ্র, ভাঁডু ক্ষমতাহীন, অথচ তার তুল্য যোগ্যব্যক্তি দুর্লভ, সে ভাগ্য-তাড়িত এই ভাবনা তার মনকে সমাজের প্রতি বিষিয়ে রেখেছে। কালকেতুকে তাই অকারণেই প্রজাশোষণের উপদেশ দিতে তার বিকৃত আনন্দ

যখন পাকিবে খন্দ। পাতিবা বিষম দ্বন্দ্ব

দরিদ্রের ধনে দিবে নাগা ।।

ভাডু হাটে গিয়ে পণ্যদ্রব্য লুটে নিয়ে আসে। কারণ তার বাঁচার অন্য পথ নেই। সে স্বভাবতই শাঠ্যে উৎসাহী হয়ে পড়েছিল! অপরের ক্ষতিসাধনে এক ধরনের বিকারগ্রস্ত সুখ সে অনুভব করে। এবং নগরের মণ্ডল না হয়েও বৃহৃকাম্য মণ্ডলত্বের ভূমিকাভিনয়ের ক্ষণিক আত্মপ্রসাদ সে পেতে চায়।

কালকেতুর হাতে অপমানিত হয়ে সে কলিঙ্গরাজের আশ্রয় নিয়েছে। কালকেতুর প্রতি তার ক্রোধ অবশ্য পূর্বপোষিত। দরিদ্র ব্যাধ কালকেতু আজ নগরপতি, আর কায়স্থকুলতিলক, বুদ্ধিতে ভাস্কর ভাডু অর্থহীন, সহায়হীন ভিক্ষুক। এই জ্বালা সে হঠাৎ প্রকাশ না করে পারেনি উত্তেজনার মুহূর্তে

তিন গোটা বাণ ছিল একখান বাঁশ।

হাটে হাটে ফুল্লরা পসরা দিত মাস।

দৈবযোগে আমি যদি ছিলাম কাঙ্গাল।।

দেখিয়াছি খুড়া গো তোমার ঠাকুরাল।

অবশেষে অপমানিত ভাড় দত্ত ভিলেনে পরিণত হল। নিঃসন্দেহে কালকেতু-আখ্যানে ভাড় দই মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এর মধ্যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ববোধের পরিচয় আছে।

১২.৪ ধনপতি-খুল্লনা-লহনা-দুর্বলা

ধনপতির আখ্যানে দুটি কাহিনী। ধনপতি উভয় কাহিনীর প্রধান পুরুষ-চরিত্র। কিন্তু তার চরিত্রে দুটি কাহিনী জুড়ে আদ্যন্ত সঙ্গতি আছে, এমন কথা বলা চলে না। দুই কাহিনীর ধনপতি যেন দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

ধনপতি ধনীর সন্তান। পূর্বপুরুষের সঞ্চিত সম্পদভোগে অলস জীবন মসৃণ পথ ধরে চলেছে। বাণিজ্যবৃত্তির সঙ্গে জড়িত দুর্ধর্ষ পৌরুষের ইঙ্গিতমাত্র তার মধ্যে নেই।

ধনপতি পায়রা নিয়ে কৌতুকক্রীড়ায় দিন কাটায়। এ কবি তার চরিত্রের কেন্দ্রবিন্দু দেখেছেন ইন্দ্রিয়-শৈথিল্যে। কর্মহীন অলস জীবন, পারাবতক্রীড়ায় দিনপাত, সঞ্চিত সম্পদভোগ এবং ইন্দ্রিয়শৈথিল্য যেন সহজ সম্বন্ধে যুক্ত। ধনপতির প্রথমা স্ত্রী লহনা প্রায় বিগতযৌবনা। বণিকপুত্রের ভোগবাসনা তাই নবীন কিশোরীর প্রতি উন্মুখ। প্রথম দর্শনেই খুল্লনার প্রতি সে আসক্ত হয়েছে।

কিন্তু সেকালের ভোগী পুরুষদের সাহস তার ছিল না। লহনাকে মনে মনে সে ভয় করত। পারিবারিক শান্তিরক্ষার আগ্রহও তার ছিল। তাই কামুক ও চরিত্রদুর্বল পুরুষের প্রচলিত রীতিতে লহনাকে অলঙ্কারাদি এবং ভালো কথার উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করতে হয়েছে।

ধনপতি রাজার জন্য সোনার খাঁচা তৈরি করতে গৌড় নগরে গেল। দায়িত্বটি এমন যাতে পুরুষের পৌরুষ ও দার্ঢ নেই। সেখানে পাশাখেলায় এবং আনুষঙ্গিক নারীসাহচর্যে তার দিন কাটতে লাগল। ঘরের কথা সে প্রায় ভুলেই গেল। মুকুন্দরাম এই দ্বিতীয় কারণটির উল্লেখ মাত্র করেছেন। বিস্তারিত বর্ণনা করেননি। তার কারণ দুটি। প্রথমত, একালের নীতিঘটিত জিজ্ঞাসা সেকালে কোন সমস্যাই ছিল না। দ্বিতীয়ত, চরিত্র-বিশ্লেষণের পদ্ধতি সেকালের কাব্য-শিল্পে অজ্ঞাত ছিল।

ধনপতি ঘরে ফিরে খুল্লনার লাঞ্ছনার কথা শুনল। কিন্তু লহনাকে সামান্য ভৎসনা ছাড়া আর কিছুই ঘটল না। খুল্লনাকে বিয়ে করে তার নিজের মধ্যেই কি কোন বিবেক-দংশনের সৃষ্টি হয়নি?

ধনপতির যে বণিকবেশ দেখানো হয়েছে তা পূর্বপরিচয়ের সঙ্গে একেবারে সম্পর্কহীন! তা ছাড়াও বণিক ধনপতি স্বতন্ত্র চরিত্রচিত্র হিসেবেও আমাদের বিশ্বাস জাগায় না। মনসামঙ্গ লের চাঁদ সদাগরের চরিত্র-কেন্দ্রে যে-ভাবকল্পনা তার অনুসরণ করতে চেয়েছেন কবি। সেচেষ্টা সফল হয়নি। ঐ জাতীয় দৃঢ় পুরুষকারের ছবি আঁকার কোন আন্তরিক আগ্রহ ছিল না মুকুন্দরামের। ধনপতি চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করেছিল। এই কাজটি গুরুতর, কিন্তু এর পেছনে কোন বিশেষ চরিত্রগত কারণ দেখানো যায়নি।

ধর্মাদর্শের এবং জীবন-চেতনার এমন কোন কঠিন প্রত্যয় তার ছিল না যার জন্য জীবনপণ করে দৈবশক্তির সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া যায়। সে হঠাৎ চণ্ডীকে অপমান করেছে, দেবতার বিরুদ্ধতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। মঙ্গলদেবী তার শক্তির প্রবল মাহাত্ম্য ঘোষণা করবার একটা সুযোগ পেয়েছে। . নৌযাত্রায় ধনপতির অনভিজ্ঞতা, কালীদহে কমলে কামিনী দর্শনের বিভ্রম, সিংহলে বাণিজ্য-ব্যাপার এবং চণ্ডীর কোপে কারাবাস তার চরিত্রের কোন বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ করেনি। তকেদীর্ঘ বারো বছর কারাবাসের পরে গৃহে প্রত্যাবর্তনের আকুলতা খণ্ডচিত্র হিসেবে সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে।

খুল্লনার চরিত্র মুকুন্দরামের সৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। খুল্লনার কথা আরম্ভ হয়েছে রোমান্টিক প্রণয় কাহিনীর নায়িকার সুরে বেঁধে আর শেষ হয়েছে পুত্রস্নেহব্যাকুল বঙ্গ জননীরূপে। ধনপতির খেলার পায়রা যখন উড়ে গিয়ে খুল্লনার আঁচলে লুকাল, ইন্দ্রিয়-দুর্বল তরুণ সদাগরপুত্রের চোখের ভাষা কি খুল্লনা পড়তে পেরেছিল? তাদের সেই প্রথম সম্ভাষণে কৌতুকের অন্তরালে নিশ্চিত পূর্বরাগের ঈষৎ বর্ণসম্পাত ঘটেছিল।

ধনপতি।

কে তুমি পায়রা লয়ে যাও হে সুন্দরি।

পারাবত লয়ে মোর কর প্রাণ চুরি

অমূল্য পায়রা মোর জানে সর্বজনে।

লুকায়ে রাখিলা তাহা ঝাপিয়া বসনে।

পারাবত দিয়া মোরে করহ পীরিতি।

নহিলে জানাব গিয়া বিক্রম ভূপতি।

সাধু ধনপতি আমি বসি হে উজানী।

গন্ধবণিক জাতি বিদিত অবনী।

বনিতা জনের ঠাই নিতে পারি বলে।

পরাণ ধরিয়া মোর রাখিলা আঁচলে।

ধনপতির ভাষা বহুস্থলে দ্ব্যর্থবোধক হয়ে উঠেছে। তার পরোক্ষ অর্থে নিঃসন্দেহে চিত্তমুগ্ধতার স্পর্শ লেগেছে।

খুল্লনা পরিচয় জেনে সম্পর্কে ভগ্নীপতি বলে বুঝল। অন্যথায় সেকালের বাঙালি মেয়ের পরপুরুষের সঙ্গে কৌতুক-আলাপ এতটা অবধি প্রগলভ হয়ে উঠতে পারত না। কিন্তু তার কৌতুক-কথায় কি অন্য কোন সুরের ব্যঞ্জনা নেই?

খুল্লনা।

ঈষদ হাসিয়া বামা করে উপহাস।।

পারাবত হেতু সাধু তুমি ছাড় আশ ।

আজিকার মত ছাড় মাংস অনুরোধ।

আপনা আপনি সাধু করহ প্রবোধ।

প্রাণভয়ে পারাবত লয়েছে শরণ।

প্রাণ দিয়ে রক্ষা করি অনুগত জন।

দৈবে দিল পারাবত নাহি করি চুরি।

মিথ্যা কার্যে কর সাধু কপট চাতুরী।

তুমি ত রাজার সাধু কে তোমাতে টুটা।

তবে দিব পারাবত দাঁতে কর কুটা।

খুল্লনার ভাষার সেই ব্যঞ্জনা বুঝতে ধনপতিরও বিলম্ব হয়নি।

পরিহাসে ধনপতি বুঝি কার্য্যগতি।

এ কন্যার পিতা বুঝি সাধু লক্ষপতি।

কবি এ বিষয়ে যথেষ্টই সচেতন ছিলেন দেখা যাচ্ছে।

খুল্লনার এই প্রণয়িনী নায়িকামূর্তি আর-একবার প্রকাশ পেয়েছে। কাননে ছাগল রাখার অশেষ কষ্টের মধ্যেও যেদিন বসন্ত এল, তার বাস্তব সব দুঃখ ছাপিয়েও হৃদয়ের বিরহ ব্যাকুলতাই বড় হয়ে উঠল। নিত্যকার সংসারজীবনে যন্ত্রণা অনেক। সেখানে খাদ্যবস্ত্রের অভাবের দুঃখ, সতীনকলহের বিড়ম্বনা। এরই মধ্যে সুপ্ত খুল্লনার নারীচিত্তের হঠাৎ জাগরণ বসন্তের দিনে। তা যেন একটা অকস্মাৎ উচ্চারিত সঙ্গীতের তান। কবি এই স্বাতন্ত্রটুকু ধরে রেখেছেন, কয়েকটি গীতিলালিত্যে পাঁচালিকাব্যের ঘটনা আর বিবরণ-প্রাচুর্যের মধ্যে। একটি পুষ্পিত লতার মতো তা কম্পিত। ' কবি এই খুল্লনাকে প্রণয় নায়িকার কমনীয়তা ও কল্পনা-মাধুর্য থেকে সংসারজীবনের কর্কশ বাস্তব-রথের চাকায় বেঁধেছেন। সে শুধু লহনার দ্বারা অত্যাচারিতই হয়নি। লহনা গায়ের জোরে জিতেছে। খুল্লনা জিতলে লহনার ভাগ্যেও কম লাঞ্ছনা জমা হত না। কলহে খুল্লনার পারদর্শিতা কম ছিল না। মর্মান্তিক আঘাত করতে সেও জানত। লহনার বিগতযৌবন এবং বন্ধ্যাত্বের প্রতি তার তীব্র তীক্ষ্ণ কটাক্ষ লক্ষ্য করবার মতো।

খুল্লনাকে মুগ্ধা এবং লহনাকে প্রভা নায়িকা বলা সম্ভব নয় সংস্কৃত আখ্যান-সাহিত্যের রীতি অনুযায়ী প্রথমায় প্রগতার এবং দ্বিতীয়ায় মুগ্ধতার লক্ষণ কিছু আছে। হয়ত সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব এক্ষেত্রে বর্তেছিল। অবশ্যই ধনপতি-লহনা-খুল্লনায় মিলে প্রথম কাহিনীটি হয়ে উঠেছিল কতকটা সংস্কৃত নাটকের ত্রিভুজ প্রেম-আখ্যানগুলির মতো। কিন্তু চরিত্রভাবনার গোড়ায় পার্থক্য আছে। মুকুন্দের পাত্র-পাত্রীরা সবাই বাংলাদেশের পরিবারজীবনের মানুষ। সংস্কৃত নাটকের নরনারীদের আভিজাত্যের অধিকারী তারা নয়। তাদের সপত্নীদ্বেষ, তাদের অভিমান অন্যপথ ধরে প্রকাশ পেত। মুকুন্দরামের খুল্লনালহনা যেভাবে কলহ করেছে, যে-ভাবে তাদের কলহ মারামারিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে গ্রাম্যতার শিল্পসিদ্ধি ঘটেছে, আভিজাত্য নিশ্চয়ই নেই। আর খুল্লনা এ কলহে শুধুই নির্যাতিতা নয়—শেষ পর্যন্ত লাঞ্ছিতা হলেও কলহের, হাতাহাতির কলাকৌশলও তার কাছে অজ্ঞাত নয়।এর ফলে খুল্লনা চরিত্রের নায়িকাসুলভ

কমনীয়তা বিঘ্নিত হয়েছে। পরবর্তী অশ্রুপ্রবাহও এই তুচ্ছতা থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারেনি। কিন্তু এখানেই মুকুন্দরামের চরিত্রভাবনার বিশিষ্টতা। খুল্লনার মধ্যে প্রণয়িনী তরুণীর কিছু বৈশিষ্ট্য এনেছেন কবি, কিন্তু তাকে সংসার ব্যস্তবতাচ্যুত রোমান্টিক কামস্বর্গের কল্পরূপিনী করে তুলতে চাননি। প্রেমলালিত্য, সপত্নীকলহ, সন্তানস্নেহ-ব্যাকুলতা—এদের মধ্যে সহজ সমন্বয়ে সমস্যা নেই। মুকুন্দরাম এইরূপ আপাতবিপরীত উপাদানকে নির্দ্বিধায় একটি ব্যক্তিত্বের মধ্যে মিলিয়েছেন। অবশ্য খুল্লনার সপত্নী-দ্বেষের মধ্যে তার যৌবন-সৌন্দর্যের গর্ব কতটা সক্রিয়, কবি তা দেখিয়েছেন।

পরিণতিতে খুল্লনার মাতৃমূর্তির যে-ছবি এঁকেছেন কবি, তা সংক্ষিপ্ত হলেও উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট। এমন কি লহনা যখন তার হারানো ছেলের খোঁজ করা নিয়ে কুৎসায় মেতে উঠেছিল, তখনও সে বিরুদ্ধতায় শাণিত হয়ে ওঠেনি। বরং সতীনের কথায় ‘পুত্রর সন্ধান পেয়ে ধরে তার পায়। মাতা খুল্লনা সন্তানস্নেহে বিগলিত এক উন্নততর অস্তিত্ব ; অনায়াসে সে যেন সতীন-কলহের ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছে।

কিন্তু খুল আর শঠের তির্যক অঙ্কনে, তাদের মনস্তাত্ত্বিক গভীরতার বিশ্লেষণে মুকুন্দরাম আরও সার্থক। তার সবচেয়ে সুঅঙ্কিত চরিত্র ভাড় দত্ত এবং লহনা—কেউ এরা ভালো মানুষ নয়। কিন্তু ভালো মানুষদের চেয়ে এরা অনেক বেশি উজ্জ্বল, সাহিত্যরসিকের কাছেও এরা অনেক প্রিয়।

খুল্লনা-প্রসঙ্গে লহনার ষড়যন্ত্র এবং বলপ্রয়োগ তার হীনতা প্রতিষ্ঠিত করেছে। খুল্লনার জন্য সমবেদনাও সৃষ্টি করেছেন লেখক। সরল রেখায় দেখলে লহনার প্রতি বিশুদ্ধ ঘৃণা হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু মুকুন্দরাম সহানুভূতি বর্ষণ করে তাকে সামান্য ঘৃণা থেকে উদ্ধার করেছেন। এর জন্য কবিকে মনস্তাত্ত্বিক গভীরতায় প্রবেশ করতে হয়েছে।

ধনপতি খুল্লনাকে যখন বিয়ে করতে চাইল লহনার কাছে সে-সংবাদ কতটা নিদারুণ হয়ে বেজেছিল কবি তা লক্ষ্য করেছেন। তার সাজানো সংসারে অপরের কর্তৃত্বের

কল্পনাও বড় ভয়ানক বলে মনে হল। ধনপতির ইন্দ্রিয়-দুর্বল চরিত্রের কথাও অজানা নয়। ভবিষ্যতে তাই শুধু অন্ধকারই সে দেখল।

পায়রা উড়ান ব্যাজে গেলা প্রভু নিজ কাজে

নাহি জানি এসব বারতা।

লক্ষণীয় নিজ কাজ' কথাটি। স্বামীর চরিত্রের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তার কাছে স্বচ্ছ। কিন্তু আসল দুঃখ তার দীর্ঘদিন ধরে তিলে তিলে গড়ে-তোলা ঘরে সাক্ষাৎ উপদ্রবস্বরূপ সব কিছুতে সম-অংশীদার অন্য এক রমণীর আবির্ভাব। এ আশঙ্কা তাকে অপমান ও ঈর্ষায় কাতর করে তুলেছে--

বিধাতা হইল বাম পরে নিবে ধন ধান

মন পোড়ে তুষের আগুনে।

শোকানলে পোড়ে মন দাবানলে যেন বন

আঁখিজল নিবারিতে নারি।

পরিবার-তন্ত্রে দীক্ষিত কবি মুকুন্দরাম। বাইরে থেকে দেখতে গেলে যা অকিঞ্চিৎকর, তার মধ্যে কত গভীর বেদনা জমা বেঁধে থাকতে পারে, মুকুন্দরাম তা সহজেই অনুভব করেছিলেন।

ধনপতি অবশ্য সুচতুর ব্যক্তি। মনস্তত্ত্বজ্ঞান তার প্রচুর। প্রথম স্ত্রীকে যে স্তোকবাক্যে ভুলাবার চেষ্টা সে করেছিল তা প্রায় অমোঘ। লহনার কষ্ট লাঘব করবার জন্যই তার এই আয়োজন। কিন্তু লহনা ধনপতিকে জানে। তাকে ভোলানো গেল না। বরং ধনপতির। কৈফিয়ত একটি কঠিন সত্যকে খুব তীব্রভাবেই প্রকট করে তুলল। লহনার যৌবন পাকশালেই বিনষ্ট হয়েছে। সংসারের কর্ম ও কর্তব্যচক্রে তার লালিত্য আজ অপগত। যে-ভাবনাকে মনের সচেতন স্তরে নিয়ে আসতে চায়নি লহনা, অবচেতনে তা নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছিল! স্বয়ং ধনপতিই তার মনের আবরণের প্রথম গ্রন্থিমোচন করল। ধনপতি কিছু উৎকোচ দিয়ে স্ত্রীকে বশ করল ভেবে নিশ্চিত হল।

লহনাকে নীরব হতে হল নিরুপায় জ্বালা বুকে নিয়ে। এর কারণ রয়েছে ধনপতির ভোগলালসায়, তার নিজের যৌবনআকর্ষণের শিথিলতায়, বা তার আয়ত্তের বাইরে। তবুও লহনা নবযৌবনা খুল্লনার সঙ্গে সম্প্রীতির সঙ্গেই থাকতে চেয়েছিল। কনিষ্ঠার প্রতি স্নেহকেই বড় করে তুলেছিল। নিজের প্রবৃত্তির সহস্রশীর্ষ সর্পকে দমন করবে ভেবেছিল। দুর্বল উপদেশ দিল

খুল্লনার রূপ দেখি সাধু হবে ভোর।

ওই ছাড়াইবে তোমা সোয়ামীর কোল।

কলাপি কলাপ জিনি খুল্লনার কেশ।

অর্ধ পাকা কেশে তুমি কি করিবে বেশ।

খুল্লনার মুখশশী করে ঢল ঢল।

মাছিতায় মলিন তোমার গণ্ডস্থল।

কদম্ব-কোরক জিনি খুল্লনার স্তন।

তোমার লম্বিত স্তন দোলায় পবন।।

এ উপদেশ দুর্বলার, তার নিজের দুর্বল মনেরও। এই চিত্তকেন্দ্র—ঈর্ষার জ্বালা, নষ্ট যৌবনের যন্ত্রণা, অপমানবিদ্ধ রুক্ষতা থেকেই তার খুল্লনার প্রতি শত্রুতার সূত্রপাত।

লহনা নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্রে ততটা পারদর্শী নয়। না হলে লীলাবতীকে ডাকতে হত না। এবং অনেকষন্ত্র করেও প্রবল ঝগড়া, প্রবলতর গায়ের জোর প্রয়োগ করে তাকে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হত না। লক্ষণীয়, লহনা খুল্লনার যে শাস্তির ব্যবস্থা করল তা যৌবন-সৌন্দর্যনাশী। লহনার স্বামীর উপর অধিকার হারাবার অপর কারণ তার বন্ধ্যাত্ব। আবার স্বামীকে সতীনের হাতে তুলে দিয়েও সন্তানস্নেহ আশ্রয় করে বাঁচা যায়। বাৎসল্যের প্রশান্তি নারীকে অনেক জ্বালা থেকে উধ্বচারী করতে পারে। লহনার বন্ধ্যাত্ব একটি ঘটনামাত্র নয়। তার চরিত্রের অপর একটি জট।

কাহিনীর দ্বিতীয়ার্ধে লহনা একেবারেই গৌণ হয়ে পড়েছে। তবে ধনপতির বাণিজ্যবাত্রাকালে খুল্লনার প্রতি শেষবারের মতো শত্রুতা সে করতে ছাড়েনি। এমন কি নিজের সামগ্রিক ব্যর্থতার পুঞ্জীভূত জ্বালা তার সর্ববিধ কল্যাণচিন্তাকে বিকৃত করে ফেলেছে। স্বামীর বিদেশ গমনকালে তার প্রার্থনায় এই চিত্ত-বিকৃতির চুড়ান্ত প্রকাশ লক্ষ্য করি।

খুল্লনার নবজাত পুত্রকে নিয়ে যে বাৎসল্য-মহোৎসব, কৃষ্ণ-কথার প্রসঙ্গ তুলে কবি তার গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। সেখানে দুর্বলা দাসীর প্রবেশ আছে। কিন্তু তারই গৃহ-প্রাঙ্গণের এই নিত্য শিশুলীলায় লহনা অনিমন্ত্রিত। এ শুধু বেদনা নয়, এ তার অপমান—সবচেয়ে বড় পরাজয়। কবি ইঙ্গিতে একবার লহনা-চিত্তের অন্দরের এই কথা জানিয়েছেন। খুল্লনা নগরের পথে পথে সন্তানের সন্ধান করছে, তখন লহনার সুপ্রচুর কুৎসার মধ্য দিয়ে হঠাৎ মনের গোপন বেদনাটুকু প্রকাশিত হয়ে পড়েছে

দু বহিনী দু সতিনী বসি একবাসে।

আঁখি তারা পো হারা মোরে না জিজ্ঞাসে।

দুর্বল দাসীর চরিত্রটি একান্ত প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এই টাইপ চরিত্রটিকে কবি প্রাণদান করেছেন। শুধু প্রাণদানই নয়, তার একরঙা চরিত্রে ক্ষণিকের জন্য বর্ণ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন। দুর্বল কূটবুদ্ধি দাসী। সতীনেরা সখীত্বে প্রতিষ্ঠিত হলে তার লাভ কিছু নেই।

দু সতিনে প্রেমবন্ধ দেখিয়া দুর্বল।

হৃদয়ে লাগিল তার কালকূট জ্বালা।

লহনা খুল্লনা যদি থাকে এক মেলি।

পাইট করি মারিব দুজনে দিবে গালি।

যেই ঘরে দু সতিনে না হয় কন্দল।

সে ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল।

একের করিয়া নিন্দা যাব অন্য স্থান।

সে ধনী বাসিয়ে মোরে প্রাণের সমান।

তাই লহনার দুষ্টবুদ্ধিকে নানা যুক্তিতে সে জাগিয়ে তুলেছে। আবার বিজিত ক্লান্ত খুল্লনার মুখে জল জুগিয়েছে।

ধনপতি দেশে ফিরতে সে দ্রুত খুল্লনার দিকে ঝুঁকেছে। বাজার-হাটে কিছু পয়সা চুরি এবং মিথ্যে হিসেবের ছলনা অবশ্য সমানে চলছিল। কিন্তু হাতে তালি দিয়ে কৃষ্ণগান গেয়ে বালক শ্রীপতিকে সে নাচিয়েছে, হারানো সন্তানের সন্ধানে বেপথু মাতার সে সাহচর্য করেছে। অতি সংক্ষিপ্ত এবং অনাড়ম্বর এই সংবাদ কণিকা দুটি পরিবারের এই বৃদ্ধা দাসীর বাৎসল্যসিক্ত হৃদয়ের পরিচয় উদঘাটিত করে তার চরিত্রকে আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।

১২.৫ নির্বাচিত প্রশ্ন

- চন্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি মুকুন্দের চরিত্র নির্মান দক্ষতার পরিচয় দাও ।
- কবি মুকুন্দের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে ফুল্লরার চরিত্রটি আলোচনা কর ।
- কবি মুকুন্দের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে ভাড়ুদত্তের চরিত্রটি আলোচনা কর ।

১২.৬ সহায়ক গ্রন্থ

চন্ডীমঙ্গল পরিক্রমা - সুখময় মুখোপাধ্যায়

কবি মুকুন্দ রাম - ক্ষেত্রগুপ্ত।

চন্ডীমঙ্গল -এস, ব্যানার্জী

বাংলা মঙ্গল কাব্যর ইতিহাস – আশুতোষ ভট্টাচার্য

একক ১৩- বাস্তবতা ও চন্ডীমঙ্গল

বিন্যাস ক্রম

১৩.১ বাস্তববোধ ও চন্ডীমঙ্গল

১৩.২ দ্বিজ মাধব এবং মুকুন্দরাম

১৩.৩ কালিদাস এবং মুকুন্দরাম

১৩.৪. ফুল্লরার বারমাস্যা

১৩.৫ সামাজিক ও পারিবারিক জীবন

১৩.৬ পশুদের দুঃখ বর্ননা

১৩.৭ গ্রন্থোৎপত্তির কারণ

১৩.৮ নির্বাচিত প্রশ্ন

১৩.৯ সহায়ক গ্রন্থ

১৩.১ বাস্তববোধ ও চন্ডীমঙ্গল

মুকুন্দরামের কাব্যে পৌরাণিক কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ যুক্ত হয়েছে বারবার। তাদের সংখ্যা প্রচুর। এই জাতীয় কাহিনীর সহ-যাগিতায় কবি নিজ কাব্যকে হয়তো বৈচিত্রমণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মূল কাহিনী এমন একটা বস্তুবোধ ও সরসতার সুরে বাঁধা যে পুরাণপ্রসঙ্গে এসেই বার বার সে সুর কেটে গিয়েছে। তাছাড়া বহু পাত্রপাত্রীর মুখে পুরাণঘটনার উল্লেখ করবার উৎসাহে কবি চরিত্রগত স্বাভাবিকতা বর্জন করেছেন। তাছাড়া কল্পি ব্রাক্ষ্মণ্যসংস্কার কখ-না কখ-না বাস্তব-বাধকে আছন্ন করেছে। ব্যাধজীবনের চিত্রাঙ্কনে তাঁর স্তবতা মাঝে মাঝে এর ফলে খণ্ডিত হয়েছে।

এই বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা নিয়েই বাস্তববাদী শিল্পী হিসাবে মুকুন্দরাম মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একক।

১৩.২ দ্বিজ মাধব এবং মুকুন্দরাম

মুকুন্দরামের পূর্বর্তী চণ্ডীমঙ্গলের কবিদের মধ্যে দ্বিজ মাধব নিশ্চিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর নামে চিহ্নিত কাব্যটিও কিছু অবিশ্বাস্য নয়। অপরাপর যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁদের কাল এবং কাব্য-বিষয়ে এমন সুস্থির তথ্যগত প্রমাণ নেই যাতে তুলনামূলক আ-লাচনায় কোন লাভজনক ফল মিলতে পারে। অবশ্য দ্বিজ মাধবের কাব্যের সঙ্গে মুকুন্দরামের পরিচয়ও ছিল কিনা জানা যায় না। তবুও উভয় কাব্যের তুলনায় মুকুন্দরামের বৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্ট হবে বলেই দ্বিজ মাধবের চণ্ডীকাব্যটি একান্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ততা অপ্র-য়াজন-বর্জনের জন্য আসেনি। মঙ্গলকাব্যগুলির আকৃতিগত অতিবিস্তৃতির অন্যতম কারণ, কারণে-অকারণে প্রাত্যহিক সমাজ ও পরিবার-জীবনের বিবরণ দান এবং কতকগুলি বাঁধাধর বর্ণনার অপরিহার্য প্রথানুগ অনুসরণ। কাহিনীর সামান্যতম সূত্র ধরে কবিরা বিবাহ ও স্ত্রী-আচার, বারব্রত, খাদ্যতালিকা, জাতকর্ম, শ্রাদ্ধাদি পূজাপার্বণের নানা বাস্তব তথ্য পরিবেশন করে থাকেন। চৌতিশা, বারমাস্যা, কাঁচুলি নির্মাণ, দেববন্দনার অনাবশ্যক বিস্তারও কাব্যদেহকে ভারাক্রান্ত করে -তালে। দ্বিজ মাধব যদি অনাবশ্যককে বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ততা আনতেন কাব্যটি সংহত হত এবং কবি প্রথাভঙ্গের শক্তিতে গৌরবান্বিত বিপ্লবী প্রতিভা হিসাবে সম্মানিত হতেন। তিনি তা করেননি। অপ্র-য়াজনীয় বিষয়ের প্রথানুগ বর্ণনা আছে, মূল কাহিনী সংক্ষিপ্ত হয়ে কাঠা-মায় পরিণত হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ততা দ্বিজ মাধবের কাব্যের সৌন্দর্যহানি ঘটিয়েছে। মুকুন্দরাম কিন্তু বিস্তৃত বর্ণনায় পূর্ণদেহ কাব্য গঠন করেছেন। পরিমিতি বোধ কাব্যরচনার গুণ হলেও অতিসংক্ষিপ্ততা আবার রসাভাবের কারণ। অনেকের মতে দ্বিজ মাধবের সংক্ষিপ্ততার প্রধান কারণ কোন পূর্ব আদর্শের অভাব। এই কাব্যকাঠামোটি তাঁকে নিজেকেই গড়ে নিতে হয়েছিল। কিন্তু মুকুন্দরাম কোন পূর্বধারার সহায়তা পেয়েছিলেন তাও ভাববার মত। দ্বিজ মাধব সামান্য পূর্ববর্তী কবি। কিন্তু মুকুন্দরাম এই কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এই কাব্যের কাঠা-মাটি পেয়েই তাঁর পক্ষে সুঠাম প্রতিমা

নির্মাণ সম্ভব হয়েছে—এরূপ সিদ্ধান্ত করা সহজ নয়। কবিকঙ্কণ মানিক দত্ত নামক পূর্বসূরীর না-মাল্লেখ করেছেন। সেকাব্য অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। দ্বিজ মাধবের সঙ্গে মুকুন্দরামের পরিচয় ছিল এমন প্রমাণ নেই। তিনি যে পূর্ণদেহ কাব্যরচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন তার কারণ কবির শিল্প-বাধের গভীরতা—কোন পূর্বাদর্শের সহায়তা নয়। দ্বিজ মাধব এই -বাধে ন্যূন ছিলেন বলেই গল্প ও চরিত্রের রূপরেখামাত্র উপস্থিত করেছেন।

দ্বিজ মাধবে কাব্যগঠনের অন্যতম মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে ‘বিষ্ণুপদ’ আখ্যাত কতকগুলি কবিতার ব্যবহারে। এর দ্বারা সম্ভবত আখ্যানধর্মের সঙ্গে গীতরস যুক্ত করতে চেয়েছেন কবি, মঙ্গলকাব্যের বস্তুভারাক্রান্ত বর্ণনরীতিকে কিছুটা সুরের ডানা দিতে চেয়েছিলেন। কবির উদ্দেশ্য ভালো । কাব্যগঠন-রীতিতে এই নবপরীক্ষা নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কিন্তু প্রযুক্তিতে সর্বদা সাফল্য আসেনি। কোন কোন ক্ষেত্রে গীতকাবিতাটি বর্ণিত প্রসঙ্গের সঙ্গে এতই অসঙ্গত ভাবে সংশ্লিষ্ট যে পীড়িত হতে হয়।

মুকুন্দও ঠিক একই উদ্দেশ্যে—মঙ্গলকাব্যের একঘেয়ে বস্তুভারস্থবির বর্ণনায় কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য কয়েকটি গীতিকবিতা যুক্ত করেছেন। গীতি-আবেদনের প্রতি কবির বিশেষ প্রবণতা ছিল না, খুল্লনার কণ্ঠে বসন্ত, শুক প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যে বিরহপদগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তা আখ্যানকাব্যে রীতিঘটিত বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য। হয়তো মুকুন্দরাম তাঁর কাহিনীর সাধারণ বিন্যাসরীতির মধ্যে এই জাতীয় বিরহব্যাকুলতা প্রকাশের অক্ষমতার কথা মনে মনে অনুভব করেছিলেন। কাব্যের এই একটিমাত্র স্থানে শুধু নায়িকার বিরহর্তি প্রকাশের সু-যাগ করে নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থেকেছেন।

উভয়েই প্রায় অভিন্ন উদ্দেশ্যে একই ধরনের উপাদান ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সংযত শিল্পবুদ্ধির তারতম্যের জন্য ফল এত পৃথক হয়েছে। দ্বিজ মাধবের সঙ্গে কবিকঙ্কণের একটা বড় পার্থক্য দেখণ্ডের কাহিনী নির্বাচনে।

দ্বিজ মাধবের চণ্ডীকাব্যটি একান্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ততা অপ্র-য়াজন-বর্জনের জন্য আসেনি। মঙ্গলকাব্যগুলির আকৃতিগত অতিবিস্তৃতির অন্যতম কারণ, কারণে-

অকারণে প্রাত্যহিক সমাজ ও পরিবার-জীবনের বিবরণ দান এবং কতকগুলি বাঁধাধর বর্ণনার অপরিহার্য প্রথানুগ অনুসরণ। কাহিনীর সামান্যতম সূত্র ধরে কবিরা বিবাহ ও স্ত্রী-আচার, বারব্রত, খাদ্যতালিকা, জাতকর্ম, শ্রাদ্ধাদি পূজাপার্বণের নানা বাস্তব তথ্য পরিবেশন করে থাকেন। চৌতিশা, বারমাস্যা, কাঁচুলি নির্মাণ, দেববন্দনার অনাবশ্যক বিস্তারও কাব্যদেহকে ভারাক্রান্ত করে -তালে। দ্বিজ মাধব যদি অনাবশ্যককে বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ততা আনতেন কাব্যটি সংহত হত এবং কবি প্রথাভঙ্গের শক্তিতে গৌরবান্বিত বিপ্লবী প্রতিভা হিসাবে সম্মানিত হতেন। তিনি তা করেননি। অপ্র-য়াজনীয় বিষয়ের প্রথানুগ বর্ণনা আছে, মূল কাহিনী সংক্ষিপ্ত হয়ে কাঠা-মায় পরিণত হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ততা দ্বিজ মাধবের কাব্যের সৌন্দর্যহানি ঘটিয়েছে। মুকুন্দরাম কিন্তু বিস্তৃত বর্ণনায় পূর্ণদেহ কাব্য গঠন করেছেন। পরিমিতিবোধ কাব্যরচনার গুণ হলেও অতিসংক্ষিপ্ততা আবার রসাভাবের কারণ। অনেকের মতে দ্বিজ মাধবের সংক্ষিপ্ততার প্রধান কারণ কোন পূর্ব আদর্শের অভাব। এই কাব্যকাঠা-মাটি তাঁকে নিজেকেই গড়ে নিতে হয়েছিল। কিন্তু মুকুন্দরাম কোন পূর্বধারার সহায়তা পেয়েছিলেন তাও ভাববার মত। দ্বিজ মাধব সামান্য পূর্ববর্তী কবি। কিন্তু মুকুন্দরাম এই কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এই কাব্যের কাঠা-মাটি পেয়েই তাঁর পক্ষে সুঠাম প্রতিমা নির্মাণ সম্ভব হয়েছে—এরূপ সিদ্ধান্ত করা সহজ নয়। কবিকঙ্কণ মানিক দত্ত নামক পূর্বসূরীর না-মাল্লেখ করেছেন। সেকাব্য অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। দ্বিজ মাধবের সঙ্গে মুকুন্দরামের পরিচয় ছিল এমন প্রমাণ নেই। তিনি যে পূর্ণদেহ কাব্যরচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন তার কারণ কবির শিল্প-বাধের গভীরতা—কোন পূর্বাদর্শের সহায়তা নয়। দ্বিজ মাধব এই বোধে ন্যূন ছিলেন বলেই গল্প ও চরিত্রের রূপরেখামাত্র উপস্থিত করেছেন।

দ্বিজ মাধবে কাব্যগঠনের অন্যতম মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে ‘বিষ্ণুপদ’ আখ্যাত কতকগুলি কবিতার ব্যবহারে। এর দ্বারা সম্ভবত আখ্যানধর্মের সঙ্গে গীতরস যুক্ত করতে চেয়েছেন কবি, মঙ্গলকাব্যের বস্তুভারাক্রান্ত বর্ণনরীতিকে কিছুটা সুরের ডানা দিতে চেয়েছিলেন। কবির উদ্দেশ্য ভালো। কাব্যগঠন-রীতিতে এই নবপরীক্ষা

নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কিন্তু প্রযুক্তিতে সর্বদা সাফল্য আসেনি। কোন কোন ক্ষেত্রে গীতকাবিতাটি বর্ণিত প্রসঙ্গের সঙ্গে এতই অসঙ্গত ভাবে সংশ্লিষ্ট যে পীড়িত হতে হয়।

মুকুন্দও ঠিক একই উদ্দেশ্যে—মঙ্গলকাব্যের একঘেয়ে বস্তুভারস্থবির বর্ণনায় কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য কয়েকটি গীতিকবিতা যুক্ত করেছেন। গীতি-আবেদনের প্রতি কবির বিশেষ প্রবণতা ছিল না, খুল্লনার কণ্ঠে বসন্ত, শুক প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যে বিরহপদগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তা আখ্যানকাব্যে রীতিঘটিত বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য। হয়তো মুকুন্দরাম তাঁর কাহিনীর সাধারণ বিন্যাসরীতির মধ্যে এই জাতীয় বিরহব্যাকুলতা প্রকাশের অক্ষমতার কথা মনে মনে অনুভব করেছিলেন। কাব্যের এই একটিমাত্র স্থানে শুধু নায়িকার বিরহর্তি প্রকাশের সুযোগ করে নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থেকেছেন।

উভয়েই প্রায় অভিন্ন উদ্দেশ্যে একই ধরনের উপাদান ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সংযত শিল্পবুদ্ধির তারতম্যের জন্য ফল এত পৃথক হয়েছে। দ্বিজ মাধবের সঙ্গে কবিকঙ্কণের একটা বড় পার্থক্য দেখণ্ডের কাহিনী নির্বাচনে। মঙ্গল-দৈত্যকে বধ করে চণ্ডী কিভাবে মঙ্গলচণ্ডী হলেন সম্ভবত মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর আদর্শে মাধব সে-কাহিনী বিবৃত করেছেন। মুকুন্দ দক্ষযজ্ঞের ও শিবের কামভস্মের বর্ণনা সেরে শিবপার্বতীর পারিবারিক জীবনের কৌতুকমিশ্র মনোহর ছবি এঁকেছেন। তিনি আপন প্রবণতার কেন্দ্রটি চিনতেন। তাই শেষ পর্যন্ত পারিবারিক জীবনের প্রাত্যহিক ছোটখাট সুখ-দুঃখের সকৌতুক বর্ণনায় পোঁছে নিশ্চিত হয়েছেন। এ জাতীয় সচেতন নির্বাচন দ্বিজ মাধবে কেন, মধ্যযুগের খুব কম কবির কাছেই প্রত্যাশিত।

দ্বিজ মাধবের বাস্তবতা কোন কোন মহলে প্রশংসিত হযেছে। আবার মুকুন্দরামের তুলনায়। তাঁর বাস্তবতাকে অনেকে বস্তুর ভার বলেছেন, বাস্তব-রসের সিদ্ধি বলে স্বীকার করেননি। বাস্তবতার দিক থেকে দুজনের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই আছে এবং তা প্রণিধানযোগ্য—

১. মুকুন্দরাম ব্যাধ-জীবনের চিত্রে ব্রাহ্মণ্যসংস্কারের আরোপ করেছেন, দ্বিজ মাধব ব্যাধসমাজের চিত্রাঙ্কণে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতা বজায় রেখেছেন।

২. পৌরাণিক কাহিনী কথনে মুকুন্দরামের কিছু বেশি উৎসাহ ছিল। এই বিষয়ে ঘটনাসন্ধি বা চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষায় প্রয়োজনীয় সতর্কতা সর্বদা দেখাতে পারেননি কবি। ফলে শৈল্পিক বাস্তবতা কোথাও কোথাও বিঘ্নিত হয়েছে। মাধবের বাস্তববোধ কবিচিত্তের সর্ববিধ ব্যক্তিক প্রবণতামুক্ত।

৩. মুকুন্দরামের সৃষ্টিতে বাস্তব জীবনচিত্র কৌতুকরসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশিষ্ট স্বাদুতা নিয়ে এসেছে। এদিক দিয়ে দ্বিজ মাধবে সত্যিই বস্তুর ভার যতটা বস্তু-ঘেঁকে-নেওয়া স্বাদ ততটা নেই।

১৩.৩ কালিদাস এবং মুকুন্দরাম

কালিদাস এবং মুকুন্দরামের কবিপ্রতিভার মধ্যে এমন কোন সাদৃশ্য নেই। কিন্তু মুকুন্দ শিবপার্বতী-কথা কালিদাসের কুমারসম্ভব' কাব্য থেকে গ্রহণ করেছেন। এই বিষয়ের আলোচনায় দুজনের কিছুটা তুলনা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

হিমালয় পর্বতে শিবের ইন্দ্রিয়নিরুদ্ধ তপস্যা, তারকবধের জন্য শিবকে কামাতুর করে তুলতে ইন্দ্রকর্তৃক মদনের সাহায্য প্রার্থনা, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, উমার তপস্যা প্রভৃতি প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম কুমারসম্ভবের অনুসরণ করেছেন। দ্বিজ মাধবে এইসব বিষয়ের উল্লেখমাত্র নেই। পূর্ববর্তী অপরাপর মঙ্গলকাব্যেও স্বর্গখণ্ডে উল্লিখিত বিষয়গুলি স্থান পায়নি। কবি মুকুন্দরামই প্রথম শিব-পাবতীর বিবাহ-কথাকে চণ্ডীকাব্যে স্থান দিলেন, বাংলা সাহিত্যে। কালিদাসের প্রভাব আমন্ত্রিত হল। কবি যে কালিদাসের সাজোসুজি অনুসরণ করেছেন বহু শ্লোকের সাদৃশ্য দেখিয়ে সে কথা অনায়াসে প্রমাণ করা যেতে পারে।

কালিদাস কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গে কামের সম্মোহনবাণক্ষেপণ বর্ণনা করেছেন এইভাবে

প্রতিগ্রহীতুং প্রণয়িয়িত্বাৎ ত্রিলোচনস্তামুচক্রমে চ।

সম্মোহনং নাম চ পুস্পধন্বা ধনুষ্যোধং সমধত্ত বাণম্।।

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।

উমামুখে বিম্বফলাধরৌষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি।

অথেন্দ্রিয়ক্ষোভমযুগ্মনেত্রঃ পুনর্ব্বশিত্বদ্বলবান্নিগৃহ্য।

হেতুং খচোতাবিকৃতের্দিদৃক্ষুর্দিশামুপোষু সসজ্জদৃষ্টি।।

স দক্ষিণাগাঙ্গং নিবিষ্টমুষ্টিংনংসমাকুঞ্চিতসব্যপাদম্।

দর্শ চক্রীকৃতচারুচাপং প্রহর্ত্তমভদ্যতমাত্মযোনিম্।।

তপঃ পরামর্শবিবৃদ্ধমন্যা ভূর্ভঙ্গংদুষ্প্রক্ষ্যমুখস্য তস্য।

ফুরধুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়া দক্ষঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপিত।।

ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবগিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।

তাবৎ স বহির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার।।

মুকুন্দরামে আছে—

ধেয়ানে আছেন শিব অজিন আসনে।

ঝারি হাতে আছে গৌরী তার সন্নিধানে।

সম্মোহন বাণ বীর পূরিল সত্বরে।

ঈষৎ চঞ্চল হর হইল অন্তরে।

ধ্যানভঙ্গ হয়ে শিব চারিদিকে চান।

সম্মুখে দেখেন চাপ ধরি পঞ্চবাণ।।

কোপ-দৃষ্টে মহেশের বরিষে দহন।

দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইল মদন।।

রতিবিলাপের নিম্নোক্ত অংশেও কুমারসম্ভবের নিশ্চিত প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

চণ্ডী।। কামকান্তা কান্দে রতি কোলে করি মৃত পতি

ধূলায় ধূসর কলেবর।

লোটায় কুন্তলভার ত্যজে নানা অলঙ্কার

সঘনে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর।।

কুমারসম্ভব। অথ সা পুনরেব বিহ্বলা বসুধালিঙ্গনধূসরাকৃতিঃ।

বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা সমদুঃখমিব কুর্ব্বতে স্থললাম্।।

ভুবন সুন্দর-তনু তোমার কুসুমধনু

সম্মোহন আদি পঞ্চবাণ।

লুটায় ধরণীতলে। মম পাপকর্মফলে

সুকঠিন বিধাতার প্রাণ।।

কুমারসম্ভব। উপমানভূদ্বিলাসিনাং করণং যত্তব কান্তিমত্তয়া।

তদিদং গতমীদৃশৃশশাং দশাং ন বিদীর্য্যে কঠিনাঃ স্ত্রিয়ঃ ।

এই হর-কোপানলে তোমারে দহিলবলে

বধিল রতির জীবন।

চণ্ডী।

তোমা বিনে প্রাণপতি তিলকে না জীয়ে রতি

এই বড় রহিল গঞ্জন।

কুমারসম্ভব।

মদনেন বিনাকৃতা রতিঃ ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতিমে।

বচনোয়মিদং ব্যবস্থিতং রমণ ত্বানুয়ামি যদ্যপি।

কালিদাসের কাব্যের পঞ্চম সর্গে গৌরীর তপস্যার বর্ণনা আছে। মুকুন্দরাম বাইশ চরণে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। বিবরণ খুবই অল্প, কিন্তু এ যে কালিদাসের বর্ণনারই সংক্ষিপ্তসার তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কয়েকটি পয়ার তো যথাযথ অনুবাদ। যেমন

চণ্ডী।

পঞ্চতপ করেন জালিয়া পঞ্চানলে।

উর্ধ্বমুখ করি রহে অরুণ-মণ্ডলে।

কুমারসম্ভব।

শুচৌ চতুর্ণাং জুতাং শুচিস্মিতা হবির্ভুজাং মধ্যগতা সুমধ্যমা।

বিজিত্য নেত্রপ্রতিঘাতিনীং প্রভামনন্যদৃষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত্র।

চণ্ডী।

শিব-পদধ্যান গৌরী কৈল অনুক্ষণ।

বৃক্ষের গলিতপত্র করিল ভক্ষণ ।

ত্যজিল বৃক্ষের পত্র ছাড়ি অন্নপান।

এই হেতু অপর্ণা হইল অভিধান।

কুমারসম্ভব।

স্বয়ং বিশীর্ণমপর্ণবৃত্তি পরা হি কাষ্টা তপসস্ত্রয়া পুনঃ।

তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং বদন্তপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ ॥

মুকুন্দরাম কালিদাস থেকে গ্রহণ করেছেন। ঘটনাংশ সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন, বর্ণনাংশ যথাসম্ভব পরিহার করেছেন। পুষ্পস্ত্রসজ্জিত কামদেব রতিসহ তপস্যাজীর্ণ কাননে প্রবেশ করলেন। অকাল বসন্তের বর্ণবহুল, যৌবনরক্ত-তরঙ্গিত সেই বর্ণনা সামনে থাকা সত্ত্বেও মুকুন্দরামকে ব্যাকুল করেনি, আকর্ষণ করেনি। একটি চরণে ঘটনাটির উল্লেখ করেই কবি তৃপ্ত থেকেছেন। নবযৌবনমুকুলিত উমার প্রণয়বিহুল চিত্তে সৌন্দর্যমাধুর্য চতুর্দিকে বিকীর্ণ করে তপস্যাভূমিতে প্রবেশ কালিদাসের কাব্যকে ইন্দ্রিয়োদ্বেল করে তুলেছে। মুকুন্দরাম সেবা-পরায়ণাউমার উল্লেখমাত্র (বর্ণনা নেই, ছবি নেই) করেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। মদনভস্মের যে নাটকীয় মুহূর্তটি অমর হয়ে উঠেছে কুমারসম্ভবে (৩৬৩) তা মুকুন্দরামের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে।

রতিবিলা বর্ণনায় কালিদাসও কারুণ্যের গভীরে প্রবেশ করেননি। রূপমুগ্ধ বিলাসী মনের নাগর বক্‌পটুতা বেদনার তীব্রতাকে আচ্ছন্ন করেছে। মুকুন্দরামের সুরেও দুঃখ নেই। কিন্তু সৌন্দর্যবক্রতার আস্বাদও নেই। কালিদাসের রতিবিলাপ আসলে ‘রতি’র বিলাপ। মুকুন্দরামে বিলাপ যেমন শূন্যগর্ভ, রতিও তেমনি শুধু ভাবেই অছে, সুরে, রসে, ছবিতে নেই!

উমার তপস্যা কুমারসম্ভবের একটি বিশ্ববিশ্রুত বর্ণনাংশ। কালিদাস উমার কৃচ্ছ্রসাধনের, কঠিন তপস্যার কথা বলেছেন রুদ্র গ্রীষ্মে, নিষ্করণ হিমে, অনশনে, অধাসনে যে সাধনা শিবলাভের, তার ভাব-ভিত্তিতে ছিল ইন্দ্রিয়-আবেদন ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বচারী হবার বাসনা। কিন্তু কালিদাসের বর্ণবন্ত ভাষারূপে বিস্ময়কর হয়ে পুষ্পিত হয়েছে ইন্দ্রিয়সৌন্দর্যের বিচিত্র বিহ্বলতা। বল্কলবদ্ধ রালারুণসদৃশ পয়োধরে, জটাগ্রথিত মঞ্জুকেশের পটভূমিতে শৈবালাচ্ছাদিত পঙ্কজবৎ মুখসৌন্দর্যে, লতায় অর্পিত তন্বী দেহের বিলাসহিল্লোলে, মৃগে সমর্পিত বিলোলবৃষ্টিতে যে, স্বাদুতা তা রূপরসগন্ধস্পর্শের জগতের। সৌন্দর্যসৃষ্টির এই পৃথিবীতে মুকুন্দরামের প্রবেশ নেই। সুন্দরের এই মূর্তি দেখার চোখই তাঁর ছিল না। কালিদাসে-মুকুন্দরামে তাই নৈকট্য নেই কোথাও। সংক্ষিপ্ত বিবরণে উমার তপস্যাজগৎ থেকে তিনি বিদায় নিয়েছেন।

অত্যল্পকালমধ্যে উমা-মহেশের দাম্পত্য জীবনের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখের কথা এসেছে। কবির কৌতুকদৃষ্টি মুক্তি পেয়েছে।

১৩.৪. ফুল্লরার বারমাস্যা

আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্য প্রচলিত ছিল তাকেই। আমরা মঙ্গলকাব্য বলে অভিহিত করে থাকি। তবে মঙ্গল কাব্যগুলির কাহিনী,---ছড়া, ব্রতকথার আকারে পল্লীবাংলায় দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত ছিল। ঠিক কবে থেকে সেগুলি।কাব্যরূপ পেয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না, অন্ততঃ চতুর্দশ শতাব্দীর আগে এরা কোন বিশিষ্ট রূপ লাভ করতে পারে নি। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে মঙ্গলকাব্যগুলি একটা বিশেষ রচনা-প্রথার অনুকরণ আরম্ভ করে।

মঙ্গলকাব্যগুলি বাংলাদেশের এক বিশেষ যুগের সাহিত্য সাধনা হলেও এর সৃষ্টিপ্রেরণা কোন একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাস থেকে আসেনি। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন অবস্থায় বাংলার লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে, মঙ্গলকাব্যগুলি তারই পরিচয় বহন করছে। বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচারআচরণ, রীতি-নীতি, সংস্কার-সংস্কৃতি ও ধর্মচেতনার ভিত্তির ওপরেই এদের প্রতিষ্ঠা। তাই এই শ্রেণীর কাব্যের উদ্ভবের পেছনে রয়েছে বাংলার অধিবাসীদের আধিভৌতিক ভয় ভাবনা আর একে পরিপুষ্টি দান করেছে বাংলার রাষ্ট্রিক বিপর্যয় ও তার ভাঙ্গা গড়ার ইতিহাস। বাঙালী জাতিকে আর্য সংস্কৃতি প্রভাবিত করলেও তাদের চিন্তা চেতনায় অআর্য জীবন ধারা প্রবল ছিল। দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই বাংলার মানুষ উচ্চশ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। এছাড়াও আরও নানা শ্রেণী ভাগ বাঙালী সমাজকে শতধা বিচ্ছিন্ন করে তা়েলে। শ্রেনীগত ব্যবধান যতই বাড়তে থাকে, ততই মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার জল জঙ্গল, নদীনালা পূর্ণ বাংলা দেশে জন্তু জানোয়ারের আক্রমণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত মানুষ ছিল বড় অসহায়, এই অসহায় মানুষ ভেবেছে সমস্ত আধিভৌতিক দুর্যোগের পিছনে আছে কোন অদৃশ্য শক্তি বা দেবতার হাত। সেই ক্রুদ্ধ দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই মঙ্গল সাধিত হবে। তাই সমাজের

নিচু তলার মানুষেরা এইসব বিপদথেকে বাঁচবার জন্য নানা দেবতার কল্পনা করলো, তাদের পূজা পদ্ধতি স্তবস্তুতি রচনা করলো। তখন থেকেই লোক চিত্তে এই বিশ্বাস দৃঢ় হল যে এই সব দেবতাদের পূজা ও তাদের মহিমা কীর্তন করলে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকবেন এবং ভক্তকে নানা বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। এই ধারণা থেকেই বিভিন্ন দেব দেবীকে কেন্দ্র করে তাদের মাহাত্ম্যখ্যাপক কাব্য রচিত হতে থাকলো। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন-

“সংসারে যারা পীড়িত, যারা পরাজিত, অথচ এই পীড়া ও পরাজয়ের যারা কোনো ধর্মসঙ্গত কারণ দেখতে পাচ্ছে না, তারা স্বেচ্ছাচারিনী নিষ্ঠুর শক্তির অন্যায় ক্রোধকেই সকল দুঃখের কারণ বলে ধরে নিয়েছে এবং সেই ঈর্ষা পরায়ণা শক্তিকে স্তবের দ্বারা পূজার দ্বারা শান্ত করবার আশাই এই সকল মঙ্গল কাব্যের প্রেরণা।"--কালান্তর (১৩২৬), ‘শক্তিপূজা।

বিভিন্ন দেবদেবীকে অবলম্বন করে যে সব মঙ্গল কাব্য গড়ে উঠেছে তার মধ্যে প্রধান। ধারা তিনটি (১) মনসা মঙ্গল (২) চণ্ডীমঙ্গল (3) ধর্মমঙ্গল। এছাড়া অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শিবমঙ্গল, রায়মঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ পরিপুষ্ট।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই মঙ্গলকাব্যগুলি একটা বিশেষ রচনা প্রথার অনুসরণ করতে শুরু করে। তখন থেকেই প্রত্যেক মঙ্গল কাব্যের নায়ক ও নায়িকা স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা বা দেবী। বিশেষ কোন দেবতার পূজা প্রচারের জন্যই তারা অভিশাপ গ্রস্তহয়ে মর্তে জন্ম গ্রহণ করে। মর্তে জন্ম নিয়ে তারা সেই দেবতা বা দেবীর কল্যাণে নানা বাধা বিপ অতিক্রম করে দেবতা বা দেবীর পূজা মর্তভূমিতে প্রতিষ্ঠা করে আবার স্বর্গে ফিরে যায়। এই বৈচিত্র্যহীন কাহিনী ধারাকে কবি বৃন্দ নানা বিষয় বর্ণনার মাধ্যমে পল্লবিত করে তুলেছেন। সেই বিষয়গুলি হল নারীদের পতি নিন্দা, বারমাস্যার বর্ণনা, চৌতিশা ইত্যাদি। সেগুলি প্রায় সব মঙ্গল কাব্যেই অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী। তিনিও ঐ গতানুগতিক লক্ষণগুলিকে সামনে রেখেই কাব্য রচনা করে গেছেন। অবশ্য কবি সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য ও পুরাণ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন, তাই সেই সব কাব্য পুরাণ থেকে অনেক বিষয় আহরণ করে তার কাব্যকে সৌষ্ঠব মণ্ডিত করে তুলেছেন। এসম্বন্ধে কবি লিখেছেন,

গুণ রাজ মিশ্রসুত সঙ্গীত কলায় রত , বিচারিয়া অনেক পুরাণ।

দামুন্যা নগরবাসী। সঙ্গীত অভিলাষী শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান।

তাঁর জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতা এবং এই শ্রমলব্ধ পাণ্ডিত্যই তাঁর কাব্যকে বৈশিষ্ট্য, দান করেছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী পৌরাণিক পরিকাঠামোয় তার চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করলেও এর মধ্যে লৌকিক জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

চণ্ডীমঙ্গলের, দেব আখ্যানের নায়ক ও নায়িকা ছিল নীলাম্বর আর তার স্ত্রী ছায়া। মর্ত্যজীবনে এদের পরিচয় ধর্মকেতুর পুত্র কালকেতু আর সঞ্জয় কেতুর কন্যা ফুল্লরা। পরিণত বয়সে কালকেতুর সঙ্গে ফুল্লরার বিয়ে হয়। কালকেতু বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে আনে, পশুপাখী শিকার করে আনে আর ফুল্লরা গৃহে গৃহে কাঠ এবং হাটে মাংস বিক্রি করে। এই ভাবেই সুখে, ভালবাসায় তাদের সংসার চলে। কালকেতু যেমন বীর তেমনি সহজ সরল এক পুরুষ। ফুল্লরা ব্রীড়াশীলা, কর্ম্মনিপুণা, জীবনের নানা অভাব অভিযোগের বিরুদ্ধে। আপোসহীন সংগ্রামী। সর্বোপরি স্বামীপ্রেমের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠায় সে বাস্তবমুখী ও পুরাণ-অভিজ্ঞা।

কালকেতু একদিন শিকারে গিয়ে বনে শিকার না পেয়ে এক ‘কাঞ্চন গোধিকা’-কে ধনুকের ছিলায় বেঁধে নিয়ে আসে। এই গোধিকা আসলে ছদ্মবেশিনী চণ্ডী। তিনি স্বরূপ ধারণ করলে ফুল্লরা ভেবেছে সুন্দরী নারীর রূপে মোহিত হয়ে কালকেতু বাড়িতে এনেছে। আসন্ন সতীন সমস্যার কথা ভেবে ফুল্লরা রামায়ণ মহাভারত থেকে উদাহরণ দিয়ে বলেছে। অসতী রমণী কুলধ্বংসের কারণ, স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি, সুতরাং

তোর আমি বলি ভাল স্বামীর বসতি চল পরিণামে পাবে বহু দুঃখ।

আর সতীনের জ্বালায় যদি ঘর ছেড়ে থাকে, সে যদি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে তাহলে ফুল্লরার উপদেশ---'দুগুণ বলিবে তারে। অভিমানে ঘর ছাড় কেনি। ফুল্লরার এইসব কথা ছদ্মবেশিনী চণ্ডী মন দিয়ে শুনলেন, পরে মন্তব্য করলেন—'বীর যদি বলে তবে জাই অন্যন্তরে। ফুল্লরা এক্ষেত্রে বিফল হল। পরে দ্বিগুণ উৎসাহে দারিদ্রের আঘাত হেনে চণ্ডীকে নিবৃত্ত করতে চাইল। কারণ পুরুষ চরিত্রকে বিশ্বাস নেই তাই কালকেতু ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলে না। সমস্যার চাপে ফুল্লরা বাস্তবমুখী হয়ে 'বারমাস্যা শুরু করেছে। বারো মাসের দুঃখ যন্ত্রণার কথা শুনে যদি সুন্দরী পিছুহটে। এখন আমাদের জানতে হবে এই বারমাস্যা কি?

উত্তর ভারতের প্রাচীন প্রাদেশিক সাহিত্যে গীতি কবিতার একটা সাধারণ রীতি ছিল। তা হল নায়ক বা নায়িকার বাৎসরিক বা চাতুর্মাসিক বিরহ ব্যথার বর্ণনা। অবশ্য কখনো কখনো মিলন সুখের বর্ণনাও দেখা যেত। এমন কবিতা বাংলা সাহিত্যে গেয় আখ্যায়িকা কাব্যের মধ্যে বা বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়। বারো মাসের সুখ দুঃখের বর্ণনা হলে। তাকে বারমাস্যা' বলে। কখনও বা বারমাসিয়া, বারমাসী বা বারহ মাসাও বলা হয় আবার । এই বর্ণনা যদি চার মাসের হোত তবে বলা হত চউমাসিয়া বা চতুর্মাস্যা। বারমাস্যা প্রধানত প্রকৃতির পটভূমিকায় মানব মনের সুখ দুঃখ বর্ণনার রীতি।

প্রকৃতির পটভূমিকায় মানব মনের সুখ দুঃখ বর্ণনার রীতি সংস্কৃত কাব্যেও দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে কালিদাসের মেঘদূতম ও ঋতুসংহার কাব্য দুটির উল্লেখ করা যায়। মেঘদূত কাব্যের উত্তরমেঘে যক্ষপ্রিয়ার দুঃখ অনেকটা এই পর্যায়ের। ঋতুসংহার কাব্যে দেখি প্রকৃতি বিভিন্ন ঋতুতে নায়ক নায়িকার কাছে বারো মাসের ভোগ সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছে--- কোনো কোনো শ্লোকে পাই নিদাঘকালাহয় মুপাগতঃ প্রিয়ে (১।১) কিংবা ঘনাগমঃ কামিজন প্রিয়ঃ প্রিয়ে! (২/১)—তবে এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানব হৃদয়ের যোগ অনেক পরিমাণে কৃত্রিম। তবে কালিদাস ছাড়া আর কোনো সংস্কৃত, কবির কাব্যে এ জাতীয় বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাই অনুমান করা চলে যে বারোমাসের বর্ণনা রীতি সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের পথ ধরে বাংলায় আসে নি।

সম্ভবতঃ প্রাচীন কালে দুঃখ বর্ণনাপূর্ণ খণ্ড খণ্ড কবিতা লোক সাহিত্যে প্রচলিত ছিল।। তাই পরবর্তী যুগে আরও পল্লবিত ও নানা বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়ে মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যে আশ্র পেয়েছে। তবে মধ্যভারতের কোনো কোনো আদিম জাতির মধ্যে বাংলা দেশের অনুরূপ বারমাসীর গান প্রচলিত ছিল। পাঞ্জাবে এখনও তার অস্তিত্ব আছে। এই সব প্রদেশের প্রভাবেও মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যে বারো মাসের সুখ দুঃখের বর্ণনা স্থান পেতে পারে। এই বারো মাসের বর্ণনা যে কেবলমাত্র মঙ্গল কাব্যগুলিতেই দেখা যায় তা নয়, সমসাময়িক সাহিত্যেও এ বর্ণনার উপস্থিতি লক্ষ্য করি। কোনো কোনো রামায়ণের অনুবাদে সীতার বারমাস্যা, বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধার বারমাস্যা, চৈতন্য চরিত কাব্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা, মৈমনসিংহগীতিকায় মলুয়ার বারমাস্যার পরিচয় আছে। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলেযে মঙ্গল কাব্যের এ একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। এই বারমাস্যা গুলির বর্ণনা কালে কালে বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হলেও কবি মুকুন্দের কাব্যে ফুল্লরার বারোমাসের দুঃখের কাহিনী নানা বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

কবি মুকুন্দের ফুল্লরা দরিদ্র। কিন্তু দারিদ্র্যের জ্বালা নিয়ে বসে বসে সে কাঁদে না, বিধাতাকে দোষ দেয় কিন্তু স্বামী কালকেতুকে সে কোনোদিন দোষারোপ করে নি। কারণ। তার অর্থ না থাকলেও সুখ ছিল। দরিদ্র স্বামীকে নিয়ে তার শান্তির সংসার ছিল। কিন্তু এই শান্তির সংসারে সতীনের উপস্থিতি তাকে পাগল করে দিয়েছিল তাই নানা কৌশলে। ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে যখন সে তাড়াতে পারে নি তখন শুরু করেছে বারোমাসের দুঃখের কাহিনী।

বছরের প্রথম মাস বৈশাখ। এই বৈশাখের তীব্র দহন জ্বালায় জীবকুলের যে দশা হয় সেই দশায় নিজেকে ফেলে ফুল্লরা তার দুঃখের কাহিনী শুরু করেছে। বৈশাখের প্রচণ্ড সূর্য। তাপে ধরিত্রী শুষ্ক, চারিদিক ধূ ধূ করছে। সূর্যের তাপ থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই, কোথাও গাছ নেই যে তার তলায় ফুল্লরা মাংসের পসরা সাজাবে। ধরিত্রী এতই উত্তপ্ত যে ফুল্লরার পা পুড়ে যায়, গায়ে মাথায় যে আচ্ছাদন দেবে তার উপযুক্ত কাপড়ও ফুল্লরার কাছে নাই। পরিধেয় যে খুঞ্রার বসনটি তার সম্বল সেটি এত ছোট যে শিরে দিলে নাহি আঁটে। প্রকৃতির এই বিরূপতা কাটিয়ে যদিও বা মাংস বিক্রি করতে

পারতো তো ভাল হোত। কিন্তু মাসটি যে বৈশাখ, এ সময় বেশীর ভাগ বাঙালী ব্রত আচরণ করে নিরামিষ খায়। তাই সকলের কাছে বছরের প্রথম মাস সুখ আনন্দের অনুভূতি বয়ে নিয়ে এলেও, ফুল্লরার কাছে এ মাস বিষের মত। - বৈশাখ যদি বিষ তবে জ্যৈষ্ঠমাস পাপিষ্ঠ, কারণ সূর্যের দারুণ অগ্নিবাণে ভস্মীভূত ধরিত্রীর প্রান্তর। ফুল্লরার একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র যা খুঞা পাতার সুতোয় বােনা তাও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর আচরণে ফুল্লরা কাহিল তাই জ্যৈষ্ঠমাস তার কাছে পাপিষ্ঠ। সূর্যতাপে পাখিকুলও তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত। ফুল্লরা সেই দগ্ধ প্রান্তরে মাংসের পসরা নামিয়ে যে একটু তুষার জল খাবে তারও উপায় নাই। আকাশে মাংস লোভী চিলের দল উড়ে বেড়াচ্ছে একটু সুযোগ পেলেই চিল ছোঁ মেরে মাংস নিয়ে পালাবে। প্রকৃতির রিক্ততা ফুল্লরার সংসারে এ সময় দারুণ খাদ্যাভাব সৃষ্টি করে তাই বনের বৈচিফলই একমাত্র সম্বল'। ঐ দিয়েই ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে হয় ফুল্লরা ও কালকেতুকে।

আষাঢ় মাস বর্ষা ঋতুর সূচনা করে। খরতপ্ত গ্রীষ্মের পর দূর দিগন্ত জুড়ে আকাশে জমে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের স্তুপ। ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা এসে হাজির হয়। প্রকৃতি শান্ত হলেও দরিদ্র ব্যাধের সংসারে সুখ আসে না। তাই বৃষ্টির জল ধারার মধ্যেই ফুল্লরাকে মাংসের পসরা নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়। পেটের জ্বালা বিষম জ্বালা। এ সময় সম্পন্ন গৃহস্থেরও সম্বলে টান পড়ে তাই মাংসের উচিত মূল্য পাওয়া যায় না। সামান্য কিছু খুদকুড়ার বিনিময়েই মাংস দিতে হয়। যা পাওয়া যায় তা দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না আধপেটা খেয়েই থাকতে হয়। দুঃখের তীব্রতায় ফুল্লরা নিজেকে অভাগ্যবতী বলে মনে করে। সুতরাং ভাগ্যহীনার বেঁচে থেকে লাভ কি তাই সে আত্মঘাতী হতে চায়। বর্ষায় কতশত জোক তাকে কামড়ায় কিন্তু এ দারিদ্র্য পীড়িত জীবন শেষ করে দিতে সাপ তাকে কামড়ায় না। এও যেন, এক দৈব বিড়ম্বনা।

এর পরে আসে ভরা বর্ষার মাস শ্রাবণ। ঝিম ঝিম বর্ষণ চলে দিন রাত-শুক্লপক্ষকৃষ্ণপক্ষের পার্থক্য বোঝা যায় না। আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন সূর্য ও চন্দ্র কিছুই দেখা যায় কেবল চারিদিকে কালিমালিপ্ত অন্ধকার আর বিরামহীন বৃষ্টি। নদনদী খাল-বিল সব জলে পরিপূর্ণ কিন্তু কেবল ফুল্লরার গৃহে শূন্যতা, খাদ্যাভাব। তাই এই

অসময়েও বনের পশু শিকার করতে হয়। নতুবা দরিদ্র ব্যাধ পরিবারের পেট চলবে কেমন করে? ফুল্লরা খেদ করে বলেছে বহু পাপকর্ম ফলে এ সময় শিকার করতে হয়। আবার বর্ষা থেকে বাঁচবার। মত শক্ত পোক্ত বাড়ীও ফুল্লরার নেই যে কুঁড়ে ঘর তাদের আশ্রয় তা অল্প বৃষ্টিতেই বানে। ভেসে যায়। একদিকে খাদ্যাভাব অন্যদিকে আশ্রয়াভাব তাকে পাগল করে তোলে।

বর্ষাকালের রেশ ভাদ্রমাসেও থাকে। সে সময় নদ নদী জলাশয় জলে ভর্তি। ফুল্লরা। বলেছে এ মাসে চারদিক চারকোণ মোট আটদিকে জল। জল ভেঙ্গে ভেঙ্গে ফুল্লুরাকে মাংসের পসরা নিয়ে ঘরে ঘরে ফিরতে হয়। কারণ ক্ষুধার জ্বালা বড় জ্বালা। আনলে পোড় অঙ্গ ভিতর বাহিরে।

এর পর আসে শরৎ কাল। প্রকৃতি রাণী এই ঋতুতে সৌন্দর্য সম্ভারে নিজেকে অপরূপ করে তোলে। আশ্বিন মাস বাঙালীদের কাছে উৎসবের মাস। এই সময় বাঙালীদের শ্রেষ্ঠ। পূজা দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এ পূজার ব্যাপকতা এতই গভীর যে মনে হয় যেন প্রতি ঘরে। ঘরে এ পূজার উৎসব চলে। লোকে মহিষ ছাগল দেবীর কাছে বলি দেয়। তাই প্রসাদী মাংস ঘরে ঘরে। ফুল্লরার মাংসের পসরা নিয়ে ঘোরাই সার হয়। যেহেতু এ মাস উৎসবের মাস তাই বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে বউরা ভালো ভালো পোশাক পরে ও সাজসজ্জাকরে তাদের। চিত্তে আনন্দের জোয়ার আসে কিন্তু অভাগী ফুল্লরার দরিদ্র জীবনে উৎসব আনন্দের কোন প্রভাব পড়ে না। সে অন্নচিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে।

এরপরে আসে কার্তিক মাস হেমন্ত ঋতুর শুরু। এই মাস থেকেই ধীরে ধীরে শীত পড়তে থাকে। মানুষ এই সময় শীত থেকে বাঁচার জুন্য উত্তম বস্ত্র পরিধান করে। ফুল্লরা। বলেছে বিধাতা সকলের জন্য শীতনিবারণের বস্ত্র জোগাড় করেদেয় আর সে যেন বিধাতার চিন্তা ভাবনার বাইরের মানুষ তার এ সময়ে জোটে কেবল হরিণের চামড়া। তাই গায়ে দিয়েই তাকে শীত থেকে বাঁচতে হয়। দেবীচণ্ডীকে তাই ফুল্লরা তার দুঃখ বুঝতে বলেছে। দরিদ্র মানুষেরা যেমন গুড়ি সুড়ি হয়ে বসে বা জানুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে শীত কাটানোর চেষ্টা করে কিম্বা সূর্যের তাপে শরীর উত্তপ্ত করে বা

আগুনের কাছে বসে তাপ নিয়ে শীতথেকে বাঁচে, ফুল্লরা তাই করে, সে খেদের সঙ্গে বলেছে—জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।

অগ্রহায়ণ মাস মার্গশীর্ষ। এমাস ফসলের কাল। বাঙালী মানুষের অঙ্গনে সোনার ধানের পরিপূর্ণ। সর্বত্রই ফসল। হাট মাঠ ফসলে পরিপূর্ণ। সকলের জীবনে তখন একটু সচ্ছলতা আসে। বিধাতা যেন তখন সকলের জন্য উদর পূর্ণ করে অন্নের ব্যবস্থা করেন। ফুল্লরাও তখন সে অন্ন থেকে বঞ্চিত হয় না। কিন্তু বিধাতাই আবার ফুল্লরার জন্য কালান্তক শীত পাঠায়। এ যেন দরিদ্রের সর্বশূন্যতা। কোন দিকে সুখ নেই। ফুল্লরার যে দোপাটা আছে তাও গায়ে দিতে টানাটানি করতে হয়।

তারপর আসে শীতের প্রাবল্য, পৌষ মাস। সাধারণ মানুষ এই কালে সুখী। লেপ চাদরে তুরা শীতের নিবারণ করে। ফুল্লরা এই সময় হরিণের মাংসের বদলে একটি পুরানো পাটের চাদর পায়, কিন্তু তা এত ধূলায় ভর্তি যে সারা গায়ে ধূলোয় ভরে যায়। গায়ে দিয়েও স্বস্তি পাওয়া যায় না। ধূলোর জন্যে শুয়ে থেকে চোখ খোলারও উপায় নাই। এই ভাবে পৌষ মন কাটে ফুল্লরার।

মাঘমাসে শীতও যেমন থাকে তেমনি কুয়াশায় চারিদিক ঘন আবরণে ঢেকে যায়। ব্যাধ কালকেতু শিকারে বেরিয়ে জন্তু দেখতে পায় না। জন্তুরাও কুয়াশার সুযোগে লুকিয়ে পড়ে। তাই এই মাস শিকারে খুবই অসুবিধার সৃষ্টি করে; অথচ শাক ভাত খেয়ে ফুল্লরা যে জীবনধারণ করবে তারও উপায় নেই কারণ,--মাঘমাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক। ফলে এই মাস একরকম অর্ধাহারে অনাহারে কাটাতে হয়।

ফাল্গুন মাস যেন শীত যেতে যেতেও যায় না। যেন দুগুণ হয়ে জাঁকিয়ে বসে। এ মাসও ফুল্লরার জীবনে দুঃখের বার্তা বহন করে আনে। ফুল্লরার দরিদ্র সংসারে বাসন পত্র বলতে আছে মাটিয়া পাথরা' বা পাথরের ও মাটির বাসন। সেটিকেও বন্ধক দিয়ে খুদ বা চাল আনতে হয়। তখন আর খাবার জায়গা থাকে না মাটিতে গর্ত করে আমানি ভাত খেতে হয়। সেই গর্ত জাজ্বল্যমান দারিদ্র্যের চিহ্ন স্বরূপ বর্তমান রয়েছে।'

আর যে চৈত্রমাসকে মধুমাস বলে-যে সময়ে বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হয়, রিক্ত শাখায় দেখা দেয় নতুন পল্লব, প্রকৃতি যেন নব যৌবনে শিহরিত হয়ে ওঠে। চারিদিকে মধুলোভী পতঙ্গের গুঞ্জরণে প্রকৃতি যেন মিলনোন্মুখ হয়ে ওঠে। নারী পুরুষ কামনায় অধীর হয়, কিন্তু ফুল্লরাও তে যুবতী কিন্তু উদরের জ্বালা তাকে পুড়িয়ে মারে যৌবনের কামনা কাছে আসতে পারে না। এক শয্যায় স্বামীর সঙ্গে শুয়েও সে যেন ক্রোশ-ব্যাপী দূরত্বে অবস্থান করে। এ দুঃখ যুবতী নারীর বলার কথা নয়। তবুও দারিদ্র্য জ্বালা যে কি ভীষণ তা ফুল্লরা তার জীবন দিয়ে বুঝেছে। তাই ছদ্মবেশী চণ্ডীকে সে বারোমাসের দুঃখ কাহিনী শোনায়।

শেষে ফুল্লরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে, সারা জীবন সে দুঃসহ দারিদ্রকে হাসি মুখে বরণ করে নিয়েছে। তার একমাত্র অভিমান স্বামীর প্রতি নিঃসপত্ন অধিকার। প্রেমের রাজ্যে ফুল্লরা সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকতে চায়, আর স্বামী গর্বে গরবিনী হয়েই ফুল্লরা সব দারিদ্র্যকে মুখ বুজে সহ্য করেছে। কিন্তু এই প্রেমের রাজ্যে যখন আর একজন সুন্দরী নারী এসে হস্তক্ষেপ করতে চায় তখন আর সে স্থির থাকতে পারে নি। ফুল্লরার এই দুঃখ কাহিনী শুনে দেবী চণ্ডী তাকে বর দিয়ে বলেছেন—"আজি হৈতে দূর হৈল দুঃখের বিগতি।

বারমাস্যায় ফুল্লরা কেবল দুঃখিনী নারী নয়, রক্ত মাংসে গড়া এক ঈর্ষাপরায়ণা নারী। সে কারো সহানুভূতি পাবার জন্য তার বারো মাসের দুঃখ কাহিনী বলেনি বা তার সংসারের রিক্ততা বা তার জীবন সংগ্রামের ছবি আঁকে নি। কেবল এক সুন্দরীকে বিদায় করে দেওয়ার জন্যই তার এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী মঙ্গলকাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। তাকে কেউ কেউ দুঃখের কবি বলেন কিন্তু বারমাস্যার দুঃখ বর্ণনায় বেদনারস কিছুমাত্র প্রকাশ পায়নি, আসলে সপত্নীভীতির আশঙ্কা এই দুঃখবর্ণনাকে একটি সরস স্বাদুতা দিয়েছে।

তাছাড়া এই অংশে কবি মুকুন্দ প্রকৃতির পটভূমিকার তথা বাংলা দেশের ঋতু বৈচিত্র্যের ফলে মানব জীবনে যে পরিবর্তন আসে তারও সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। বাঙালীর সামাজিক রীতি-সংস্কারের পরিচয় পাই বৈশাখ মাসে নিরামিষ আহারের

কথায়, মাঘ মাসে কাননে শাক না তোলার রীতিতে। দরিদ্র মানুষের, বিশেষ করে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর রিক্ত জীবন যাপনের বাস্তব চিত্র মুকুন্দের কাব্যে "কালকেতু ফুল্লরা' কাহিনীর অনেক স্থানে প্রকাশ পেলেও ফুল্লরার বারমাস্যায় তা জীবন্তরূপ পেয়েছে। তাই ফুল্লরার বারমাস্যা অংশ মধ্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতির এক নির্ভর যোগ্য দলিল।

১৩.৫ সামাজিক ও পারিবারিক জীবন

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সব থেকে বেশি ব্যপ্তি পেয়েছিল যে সাহিত্যধারা, তা হলো মঙ্গলকাব্যধারা । আর, এই ধারায় যে স্রষ্টার নাম বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং মানবিকতা বোধে সমদ্ধির জন্য খ্যাতি ও দীপ্তির উচ্চশিখরে উঠেছিল, তিনি হলেন কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুকুন্দরামকে পরিচিত পথ ধরেই এগোতে হয়েছিল, কাহিনীর কাঠামো ছিল আগে থেকেই প্রস্তুত। কিন্তু তবু এ কাব্যের ছত্রে ছত্রে থেকে গেছে মুকুন্দরামের নিজস্বতার পরিচয়।

মন্দরামের এই নিজস্বতার সব থেকে বড় পরিচয় তার সমাজসচেতনতা এবং অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। আর এই পর্যবেক্ষণ শক্তি কেবল বিশেষ কোন একটি শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। অভিজাত—এবং অনভিজাত --এই উভয়শ্রেণীর সামাজিক পারিবারিক রীতিনীতির খুটিনাটি তিনি পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। আর, এরই প্রকাশমান রপ" "গৌরীর অধিবাস" "হরগৌরীর বিবাহ"; "নিক্সার সাধভক্ষণ", "কালকেতুর বিবাহের অনুব", "কালকেতুর বিবাহ ইত্যাদি অধ্যায়।

মুকন্দরাম তীর চণ্ডীমঙ্গলের 'আখেটিক খণ্ড'-এ দুটি বিবাহের বর্ণনা দিয়েছেন। একটি অভিজাত শ্রেণীর-'হর-গৌরীর বিবাহ'; এবং অপরটি অনভিজাত। শ্রেণী "কালকেতুর বিবাহ। দুই বিবাহের বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য হয়তো আছে, কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত-হিন্দ, ঘরের বিবাহের রীতিনীতি কোথাও চোখ এড়িয়ে যায় না। অথচ, দেবসমাজের বিবাহের কি ব্যাধসমাজের বিবাহের চিত্র—এ দুইয়ের কোনটিই এখানে যথাযথভাবে উপস্থিত নয়—উপস্থিত যা, তা আমার অতি পরিচিত বাঙালী হিন্দু ঘরের ছবি।

উমা-মহেশ্বর এবং কালকেতু-ফুল্লরা উভয়ের বিবাহ স্থিরীকৃত, হয়েছে ঘটকের মধ্যস্থতায়। প্রথম ক্ষেত্রে নারদ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সোমাই ওঝা ঘটকের ভূমিকা পালন করেছেন। ঘটকের চিরাচরিত বরপ, তাদের প্রস্তাবিত পাত্র-পাত্রীকে তারা সমসময়ই “Made for each other" বলে দাবী করে। এখানেও তার অন্যথা হয়নি। সোমাই ওঝা কালকেতু-ফুল্লরা সম্পর্কে বলেছে—“খজিয়া পাইল যেন হাঁড়ির মুখে সরা।”

এর পরবর্তী পর্যায়েই মুকন্দরাম এই দুই বিবাহের শ্রেণীগত পার্থক্যের সব থেকে বড় ইঙ্গিত দিয়েছেন। দেবসমাজের বিবাহে নেই কোন পণপ্রথার চল, যা, আছে ব্যাধসমাজে (নিম্নবর্ণীয়দের মধ্যে)—স্থির হয়ে যায় ওঝাই বা কত পাবে, আর বরপক্ষই বা কতটুক, নেবে।

“পণের নির্দেশ কৈল দ্বাদশ কাহন।
ঘটকালি পাবে ওঝা তুমি চারিপণ ।।
পাঁচ গণ্ডা গুয়া দিব গুড় পাঁচ সের।
ইহা দিলে আর কিছু না করিবে ফের!”

বিয়ের বেশীরভাগ আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই এই দুই শ্রেণীর মিল দেখিয়েছেন মকরাম—তবে দু-একটি ব্যতিক্রম , তো থেকেই যায়। গধাধিবাস, সমঙ্গল। সূত্র বন্ধন, যোড়শমাতৃকা পজা, বসুধারা দান, নান্দীমুখ, শ্রাদ্ধাদি—এসব অনুষ্ঠান। রয়ে গেছে উভয়ক্ষেত্রেই। ব্যাধসমাজের বিবাহে যুক্ত হয়ে গেছে আরও কিছ; নন, মাত্রা। যেমন—বিবাহ পরবতী সময়ে বর-কনের মীমাংসভাোজন, ঢেমচা দগড় বাজনা, চামড়ার আসনে উপবেশন ইত্যাদি। পার্থক্য আছে জামাতাকে যৌতুক দানের ব্যাপারটিতেও। শিবকে হিমালয় যৌতুক হিসেবে দিচ্ছেন— ঝারি, শষ্যা, থালা, ধেন এবং উত্তম আসন। অন্যদিকে, সঞ্জয়কেত, ব্যাধ কালকেতুকে দিচ্ছেন-

‘যৌতুক ধনুক খান। দিল ‘খর তিন বাণ” ইত্যাদি। সব থেকে অভিনব ফুল্লরার বিদায়কালে-

“পাথরে আমানি ভরি দিলা- সঞ্জয়ের নারী'। কতখানি প্রখর পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং বাস্তবদন্তি থাকলে তবেই বিবাহ বর্ণনার ক্ষেত্রে এমন পখন পথ ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয়, তা সহজেই প্রণিধানযোগ্য।

এ-তো গেল বিবাহের কথা। কিন্তু যেসব অনুষ্ঠান পুরোপুরি অন্দরমহল কেন্দ্রিক, সেখানেও তো মকেরামের লেখনী তেমনই সাবলীল, তেমনই স্বচ্ছন্দ। নিদয়া অর্থাৎ, কালকেতুজননী যখন সন্তান-সম্ভবা, তখনকার মেয়েলী অনুষ্ঠান " নিদয়ার সাধভক্ষণ” শিরোনামাঙ্কিত অংশে অসাধারণ নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি।

সাধভক্ষণের পুর্ববর্তী পর্যায়, অর্থাৎ, নিদয়ার গর্ভবতী অবস্থায় প্রথম থেকে নবম মাস পর্যন্ত এমনভাবে মুকন্দরাম বর্ণনা করেছেন যে, অবাক হয়ে যেতে হয় একটু একটু করে মাতৃত্ব পদে আরঢ়া হতে চলেছেন কালকেতু জননী-দেহ ও মনের এই পরিণতির ছবি সত্যিই অসাধারণ। নিদয়া নিজেই জানায়, স্বামীকেবি খেলে তার মুখে রুচি ফিরতে পারে।--তার তালিকায় যা কিছু পাওয়া যায়, বেশীর ভাগই তার হয় অম্ল জাতীয়, না হয় তিতজাতীয়। স্বামীকে সে এনে দিতে বলে কল, করমচা, আমসি। আবার মাঝে মাঝে চাইছে চিংড়ির বড়া, বেজি ও গোসা? পোড়া, হাঁসের ডিমের বড়-সবকটিই মুখরোচক। নিদয়া যখন বলে-

“সদাই ন্যাকার উঠে দিনে দিনে বল টুটে
বদনে সঘনে উঠে জল।
মূলা বেগুনেতে সিম তাঁহে দিয়া রাধ নিম
তাহে দেও উড়ঘর ফল।”

তখন স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে, এ সবই একজন গর্ভবতী রমণীর কাছে উপাদেয় বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক, এবং চিরকালই' তাই হয়ে আসছে। নিদয়ার এই খাদ্যরচির বর্ণনাই আরও একবার প্রমাণ করে দেয় যে, কবির সাংসারিক জ্ঞান কতটা প্রখর ছিল!

শুধুমাত্র বিবাহ-বর্ণনা বা সাধভক্ষণের চিত্রাঙ্কণেই মন্দরামের সাংসারিক জ্ঞানের পরিধি সীমিত নয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজে চিরকাল কিভাবে এক প্রজন্মের হাত থেকে অন্য প্রজন্মের হাত থেকে অন্য প্রজন্মের হাতে দায়-দায়িত্ব, কাজকর্ম সব কিছুই অর্পিত হয়ে যায়, তাও মুকন্দরামের সতক চোখ এড়িয়ে যায়নি। অসাধারণ নৈপুণ্যে মকর: দেখিয়েছেন। এ-চিত্রকশীলবসেখানে। কালকেতু-জননী নিদয়া এবং কালকেতুপত্নী ফুল্লরা। নববধ, ফুল্লরা শাশুড়ীর সঙ্গে থেকে একটু একটু করে যেমন শিখে নিল পারিবারিক নিয়ম-কানুন, রন্ধন পদ্ধতি, রীতি-নীতি, পুজা পদ্ধতি, তেমনি পাশাপাশি নিদয়ার সঙ্গে হাটে গিয়ে হাট-বাজার করতেও শিখল। একসময় সে নিজেই এসবে পারদর্শিতা অর্জন করল-

> “মাংস বেচি লয় কড়ি, চালু লয় দাল বড়ি
> তৈল লোন কিনয়ে রেসতি
> শাক-বাইগন মূলা অট্যিাথোত কাঁচকলা
> সকলি পরিয়া লর-পসতি।”

এমনি করে কালকেতু-ফুল্লরা যখন নিজেরাই সমস্ত সংসারের যাবতীয় কায্যাদি নিজেরাই নিষ্পন্ন করতে সক্ষম হলো, তখন তাদের হাতেই সমস্ত অপণ করে ধর্মকেতু বং নিদয়া। কাশীবাসী হলো। এ তো এক কালের মধ্যবিত্ত সমাজের প্রায় প্রতিটি ঘরের বাস্তব ও জীবন্ত চিত্র।

১৩.৬ পশুদের দুঃখ বর্ননা

চন্ডীমঙ্গল যদিও দেবতার মাহাত্মকীর্তনসচক কাব্য. তব, যখন তা কোন শক্তিশালী লেখনীর দ্বারা চালিত হয় তাতেও আসে ভিন্ন মাত্রা, হয় ভিন্ন স্বাদের রসসঞ্চার। মুকন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল’তেও সেই একইভাবে নবতর মাত্রা সংযযাজিত হয়েছে। দেব-দেবী চরিত্রেও তিনি যেমন মানবিকতা আরোপ করেছেন ; মেনি বনের পশদের যে কথোপকথন আমরা শুনি, তাতে তাদেরকেও মনুষ্যেতর জীব বলে ভাবতে ইচ্ছে করে না।

দেবী চণ্ডী আসলে বন্য পশুদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আর এ কাব্যে তাঁর ভূমিকা; বিশেষতঃ "পশুদের ক্রন্দন' শিরোনামাঙ্কিত অংশে অনেকটাই বনদেবীর মত। বিশাল বনাঞ্চলের সমগ্র পশুকুল তাঁর সন্তান। তাঁরই আশ্রিত, সন্তান তুল্য পশুদের রক্ষণাবেক্ষণও তিনিই করেন। তাই পশুদের ভক্তিবিনত চিত্ত তাঁকে যেমন প্রণাম জানায়, তেমনি পাশাপাশি দারুণ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে এই বিপদতারিণী চন্ডীর-ই শরণাপন্ন হয়।

"সমগ্র চণ্ডীমঙ্গল"-তে দুবার পশুকুলের সঙ্গে দেবীকে দেখা গেছে। প্রথমবার দেবীর সঙ্গে বিজুবনে পশুদের দেখা হয়। দেবীকে দেখতে পেয়ে পশুরা তাঁকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করল, এবং সেই সঙ্গে অভয় চাইল—যাতে শত্রুর হাত থেকে তারা বাঁচতে পারে, নির্ভয়ে, 'নিরাতঙ্ক"-এ থাকতে পারে। দেবী তাদের অভয় দিলেন এবং সেই সঙ্গে বললেন যে তারা যেন নিজেদের মধ্যে ঐক্য, বন্ধুত্ব বজায় রাখে-

"যে জন যাহার শত্রু থাক মিত্রভাবে।

থাকিবে আনন্দে সবে কেহ না হিংসিবে ।।"

—এই তো গেল প্রথমবারের কথা। দ্বিতীয়বার যত্ন পশুদের সঙ্গে দেবীর সাক্ষাৎ হয় তখন তাদের চুড়ান্ত দুরাবস্থা। ব্যাধ কালকেতু তার সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য আপন বৃত্তির ওপরই নির্ভরশীল। ফলে বনের পশুদের সামনে দেখা দিয়েছে সমূহ বিপদ। কালকেতু ব্যাধ হলেও সে একজন প্রবল পরাক্রান্ত বীর অসীম শক্তি ধরে সে; বনের পুরা তার সঙ্গে এটে উঠতে পারে না কিছুতেই। পশুরাজ সিংহ এবং অন্যসব পশুরা একত্রিত হয়ে তাই স্থির করুল যে, এ বিপদ থেকে ত্রাণ পেতে হলে চণ্ডীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন পথই নেই। তাই তারা সমবেত হয়ে চণ্ডীর দেউলে গেল নিজেদের অবস্থা জানাতে-

"উপনীত হৈল পশ, তমাল-তরুমুলে।

প্রদক্ষিণ নমস্কার করিল দেউলে, ।।

সেখানেই তারা তাদের অভিযোগ পেশ করতে লাগল। সবার আগে সিংহের অভিযোগ, কারণ পশুদের রাজা হয়েও সে আজ নিরুপায়-

"ভালে টীকা দিয়া-মাগো করিলে মৃগরাজ

করিব তোমার সেবা রাজ্যে নাহি কাজ।।"

ভালুকেরও, দুঃখ-যন্ত্রণা অন্তহীন। কারও কোন সাতে-পাঁচে থাকে না সে, নিতান্তই নিরীহ। তবু কেন বার্ধক্যে উপনীত হয়ে তাকে এই চরম যন্ত্রণা পেতে, হবে? সে আজ নির্বংশ হতে চলেছে-তার স্ত্রী সাত পুত্র, নাতিরা একে একে বীরের শিকার হয়েছে; নিরীহ প্রাণীকেও এত অত্যাচার সহ্য করতে হবে কেন? তাই সে বলে—সে তো কারো ক্ষতি চায়নি।

উইচারা খাই আমি নামেতে ভালুক।

নেউগি চৌধুরী নই, না করি তালুক।।"

-তবু, অত্যাচার কেন? শরভ-করভ, কোক, বরাহ—সকলেরই অভিযোগ।

তারা নিরীহ পশু কেন তাদের উপর এই অত্যাচার। শরভ করভেরা দ্রুত ধাবিত " হতে জানলেও কালকেতুর কাছে সে ক্ষমতা তুচ্ছ।' মুথাভোজী বরাহ-কেও সহ্য করতে হচ্ছে মৃত্যুশোক। তার স্বামী-শাশুড়ী-ননদ এমনকি কোলের সন্তানকেও কালকেতুর করাল গ্রাস থেকে সে রক্ষা করতে পারেনি। নানা জাতীয় সুদৃশ্য হরিণদেরও আজ বড় বিপদ। কাতর কণ্ঠে তারা বলে -

"কেন হেন জন্ম বিধি কৈল পাপবংশে।

হরিণ ভুবন-বৈরী আপনার মাংসে ।"

সজারুর জল আরও বেশী। গর্তে লুকিয়ে যে সে পরিত্রাণ পাবে—তারও, উপায় নেই। সুচতুর কালকেতু সেই গতে জল ঢেলে সজারুকে বাইরে টেনে আনে । আর এ ভাবেই তাকেও শ্রী-পুত্র-কন্যাকে হারাতে হয়েছে। যেমর্কট রামচন্দ্রের কৃপালাভে ধন্য হয়েছিল, কালকের হাতে তারও নিস্তার নেই। ব্যাধ জালে আটক করেছে তার

সন্তানদের জল কি সহ্য হয় ? বিশাল বপু হস্তিনী আজধূলি-ধসরিত কলেবরে তার কমলোচন শিশুপুত্রের কথা স্মরণক্ষরে 'কেঁদে ভাসাচ্ছে। সে রক্ষা পাবে কেমন করে বিশাল শরীরই আজতার সব থেকে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে । না পারে ছুটতে পারে আত্মগোপন করতে। সে বাঁচার কোন রাস্তাই দেখছে না-

"বড় নাম বড়-গ্রাম বড় কলেবর।

লুকাইতে ঠাঁই নাই বনের ভিতর ।।

কি করিব, কোথা গেলে তরি ।

আপনার দন্ত হৈল আপনার বৈরী

পশুকুলের এই কাতর ক্রন্দন বিচলিত করে তুলল দেবী চণ্ডীকে, ভকিৎসল বনচর পশুদের এই সারণের পশ দর এই সকাতর-নিবেদন উপেক্ষা করতে পারেন না তিনি। তাই পদ্মাবতীকে সঙ্গে করে পশুদের দর্শন দিলেন তিনি দেবীকে সামনে পেয়ে সমস্ত পশুরা আরও একবার তাদের নিদারুণ দুর্বিপার্কের কথা জানাল দেবী পশুরাজের আক্ষেপই চুড়ান্ত-

"অন্যের সেবক হইলে সর্বত্রেতে তরি ।

তোমার সেক্ত হইয়াসংশেতে মরি'

দেবী সমস্তই শুনলেন, সবই বুঝলেন অবশেষে তিনি পশুকুলকে বরাভয় দান করে বুললে যে আর কোন ভয় নেই তাদের তারা নিশ্চিতে দিনমান করক। কালকেতু যাতে তাদের উপর আর উপদ্রব না করতে পারে ব্যবস্থা তিনি করবেন ।

স্পষ্টতইবোঝা যায় যে, মকুন্দরাম একাব্যের গোড়ায় "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ এই শিরোনামাঙ্কিত অংশে ডিহিদার মামুদ শরীফের অত্যাচারে জর্জত প্রজাদের যে ছবি একেছেন—বন্য পশদের অত্যাচারের কাহিনী কর্ময় তারই প্রতিফলন ঘটেছে। তাদের দুঃখ নিবেদন ও কাতর কুন্দনের মধ্যে প্রকৃতই নির্যাতিত প্রজাকুলের হৃদয়বেদনার প্রকাশ ঘটেছে। অবশ্য, প্রশরামিনষ্যেতর প্রাণহলাদেরকে কোন দুঃখ থাকতে পারে না

বা তারা যে কাঁদতে পারে না তা নয়। কিন্তু কোন কবি যখন তাদের সেই কাতরোক্তি এবং হাহাকারদীর্ণ ক্রন্দনকে লিজৈর দৈব-দুর্বিপাকের অভিজ্ঞতার রসসিঞ্চিত করে উপস্থাপিত করেন, তখন তা নিয়ে সন্দেহে এক নবতর ব্যঞ্জনায় সমদ্ধ হয়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলনের জন্যই 'পশুদের ক্রন্দন'।

১৩.৭ গ্রন্থোৎপত্তির কারণ

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারায় চণ্ডীমঙ্গল একটি জনপ্রিয় কাব্য। মধ্যযুগের অনেক কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করলেও মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় শ্রেষ্ঠ কবি ব্যক্তিত্ব। আমরা এ প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'দেব বন্দনা' খণ্ডের অন্তর্গত গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ অংশটি আলোচনা করব। গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ অংশে কবি মুকুন্দ তাঁর বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে তৎকালীন সমাজ জীবনের জীবন্ত চিত্রকে অঙ্কন করেছেন। কবিরা সেলিমাবাজ (সেলিমাবাদ) শহরের অধিবাসী গোপীনাথ নিয়োগীর তালুকে সাত পুরুষ ধরে সুখে স্বচ্ছন্দেই বাস করছিলেন। কিন্তু কবি রাষ্ট্র সংক্রান্ত দুর্বিপাকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাঠান শক্তির পতন ও মোঘল শক্তির অভ্যুত্থান-এর সন্ধিকালে দেশে যে অর্থনৈতিক দুরাবস্থা ও নৈরাশ্য দেখা দিয়েছিল কবি তার ঘূর্ণাবর্তে পড়ে দেশত্যাগী হলেন। ঐ সময় মামুদ শরীফ নামে এক ডিহিদার ছিলেন; তাঁর নায়েব রায়জাদা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিল। তার কাছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বৈষ্ণব কারও নিস্তার ছিল না। কোণাকুনি হিসাবে জমির দৈর্ঘ্য মাপা হতে লাগল, উর্বর জমির হিসাবে পতিত জমির উপর খাজনা চাপান হল, টাকা ভাঙ্গাতে গেলে পোদ্দারকে টাকা পিছু গড়াই আনা বাটা দিতে হত, ধার করলে টাকা পিছু প্রত্যহ একপাই সুদ দিতে হত। মজুরী দিলেও কাজ করবার লোকের অভাব। অস্থাবর সম্পত্তি, ধান, গোরু ইত্যাদি ক্রয় করবার লোক নেই। দেশ ছেড়ে পালিয়ে কেউ যে আত্মরক্ষা করবে তারও উপায় নেই। কারণ পেয়াদারা প্রজাদের উপর কড়া দৃষ্টি রেখেছে। ব্যাকুল প্রজা টাকার দ্রব্য কর আদায় বিক্রয় করে কোনমতে দিন গুজরাণ করত। বিপদের উপর বিপদ, কবির মুরুব্বী-

প্রভু গোপীনাথ বন্দী		বিপাকে হইলা বন্দী

হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে

শেষ পর্যন্ত কবি চণ্ডীবাটী গ্রামের শ্রীমন্ত খাঁ এবং মুনিব খাঁর সহায়তায় স্ত্রী, শিশুপুত্র ও ভাই রমানাথকে নিয়ে দেশত্যাগী হলেন। পথে দস্যুর দল কবির শেষ সম্বল হাতিয়ে নিল। এক সদাশয় ব্যক্তি বদু কুণ্ড কবিকে 'দিবস তিনের দিল ভিক্ষা।

অতঃপর কবি গোড়াই নদী পার হয়ে গেলেন মামারবাড়ী, মাতুল পুত্র গঙ্গাদাস কিছুদিন যত্ন করে তাদের রাখলেন। তারপর দামোদর পার হয়ে কবি উপস্থিত হলেন কুচট্যা নগরে সেখানে।

তৈল বিনা কৈল স্নান   করিল উদক পান

শিশু কান্দে ওদনের তরে।

পুকুরের পাশে শালুকের নৈবেদ্য ও ফুল দিয়ে কবি পুজো করলেন দেবীর

"ক্ষুধা ভর পরিশ্রমে   নিদ্রা যাই সেই ধামে

চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।"

আর কবিকে,

"দেবী চণ্ডী মহামায়   দিলেন চরণ ছায়া

আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।

কবি তারপর শিলাই নদী পার হয়ে আড়য়া গ্রামের ভূস্বামী বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় লাভ করলেন এবং কবির কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে বাঁকুড়া রায় কবিকে পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন।

১৩.৮ নির্বাচিত প্রশ্ন

- চন্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি মুকুন্দের গ্রন্থোৎপত্তির বিবরন দাও ।
- কবি মুকুন্দের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে ফুল্লরার বারোমাস্যা সম্পর্কে আলোচনা কর ।

- কবি মুকুন্দের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগীয় সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের পরিচয় দাও ।

১৩.৯ সহায়ক গ্রন্থ

চন্ডীমঙ্গল পরিক্রমা - সুখময় মুখোপাধ্যায়

কবি মুকুন্দ রাম - ক্ষেত্রগুপ্ত।

চন্ডীমঙ্গল -এস, ব্যানার্জী

বাংলা মঙ্গল কাব্যর ইতিহাস - আশুতোষ ভট্টাচার্য

একক ১৪- গোরক্ষবিজয়

বিন্যাস ক্রম

১৪.১ গোরক্ষবিজয়

১৪.২ নির্বাচিত প্রশ্ন

১৪.৩ সহায়ক গ্রন্থ

১৪.১ গোরক্ষবিজয়

"মহীপাল যোগীপাল গোপীপাল গীত।

ইহা শুনিয়া যত লোক আনন্দিত ।।

মঙ্গলচন্ডীর গীত করে জাগরণে ।

দম্ভ করি বিষহরি পুজে কোন জনে ।।"

চৈতন্য-ভাগবতের এই বর্ণনায় বাঝো যায়, মঙ্গলচন্ডীর গীত, বিষহরির গান ও পাল রাজাদের সম্বন্ধীয় গাথাগুলি তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় ছিল। মঙ্গলচন্ডীর গীত উত্তরবঙ্গে এবং বিষহরির গান পূর্ববঙ্গে এখনও প্রচলিত রয়েছে । মহীপাল ও যোগীপালের গীত আবিষ্কৃত হয়নি বটে, কিন্তু গোপীপালের (চাঁদের) অনেক গাথা পাওয়া গিয়েছে। গোপীচাঁদের গাথা শুধু বাংলা দেশে নয়, সমস্ত ভারতবর্ষেই বিশেষ সমাদর লাভ করছিল বলা জানা যায়।

সম্ভবতঃ এক সময়ে বাংলার নাথ সম্প্রদায় বাঙালী রাজা গোপীচন্দ্রের অদ্ভুত কাহিনী, পরম যোগী গোরক্ষনাথ ও মীননাথ প্রভৃতির অলৌকিক কীর্তিগাথার সঙ্গে মিশিয়ে দেশ-দেশান্তরে গেয়ে বেড়াত। তাতে বোধ হয়, তাদের কীর্ত্তি কলাপের কথা সমস্ত ভারত প্রচারিত ও লোক সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় গিয়েছিল। এই গীতিকবিতাসমূহ যে পূর্বকাল যুগীদের দ্বারা দেশবিদেশে মুখ মুখে গীত হত, তা লোকমুখ থেকেই সহজই অনুমান করা যেতে পারে । এখন চট্টগ্রামের মুসলমান ও হাঁড়ির মুখে গুরু মীননাথ ও

গোরক্ষনাথের গান এবং "দিন গেলে তিন নাথের নাম লইও" প্রভৃতির মত গীত সময়ে সময়ে শ্রুত হয়ে থাকে। কীরূপ একটি গান এখানে পাঠকবর্গকে উপহার দিচ্ছি -

"গুরু মীননাথ রে উল্টা উল্টা ধারা।

পুকুর মুরে ধান শুকাইয়া উগারতলে বাড়া ।।

গুরু হে আম গাছে শৈলের পোনা বগায় ধরি খায়।

তা দেখিয়া খুদ পীপড়া পল লইয়া যায়।।

গুরু হে পাঁচপণ দিয়ে কিনলাম না ও নয় বুড়ি তার জলই।

কচু বনে রাখিলাম নাও বেঙে গিলিল গলই ।।

গুরু হে একটি কথা শুনেছিলাম ত্রিপিনীর ঘাটে।

মরা মানুষে ভাত রান্ধ জীতা মানুষের পেটে ॥

গুরু হে এরালি বনে করালির ছানা বাঘিনী গেল চাইতে ।

কোলা বেঙে খাপ দি'রৈছ বাঘিনীরে খাইতে ।"

আমাদের এই "গোরক্ষবিজয়" ও সেইরকম একটা গান। ড. গ্রীয়ারসন সাহেবের প্রচারিত "ময়নামতীর গান", দুর্লভ মল্লিক বিরচিত "গোবিন্দচন্দ্রের গীত", শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্ মহাশয় সংগৃহীত "ময়নামতীর গাথা," ভবানী দাস রচিত "ময়নামতীর পুথি", আবদুল সুকুর মোহাম্মদ কৃত "ময়নামতীর গান", সহদেব চক্রবর্তীর "'ধর্ম্মমঙ্গল', শ্যামদাস সেনের "মীনচেতন" এবং এই "গোরক্ষবিজয়"একই শ্রেণীর গ্রন্থ্। রামাই পন্ডিতের "শূন্যপূরাণ' কেও কতকটা এই শ্রণীর আন্তর্গত করা যেতে পারে। এই সব প্রত্যেক গ্রন্থই নাথ ধর্মের ও ধর্ম পূজার প্রসঙ্গ নিয়ে বিরোচিত হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকেরই সঙ্গে প্রত্যেকের অল্পকিছু সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। "ময়নামতীর গান" গুলিতে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনীর সঙ্গে গোরক্ষনাথ ও হাড়িফার প্রসঙ্গ দেখা যায়। "গোরক্ষবিজয়ে" মীননাথের পতন ও শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক তার

পুনরুদ্ধার - কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এটি নাথ ধর্মের একখানি প্রধান উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এটা থেকে বাংলার তৎকালীন সমাজ, ধর্ম, ভাষা ও ইতিহাসের কথা জানতে পারা যায়।

“বর্তমান কালে ‘যুগী” বলে পরিচিত ও নাথ ধর্মাশ্রিত জনসম্প্রদায় এক সময় একটা বিশিষ্ট জাতি বলে পরিগণিত, ছিল, তাতে আর সন্দহ নেই ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাদের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিত হয়নি। নাথ ধর্ম নিয়ে এখনও কোন ঐতিহাসিক গবেষণার আলোচনা করেছেন বলে আমরা জানি না। মহামহোপাধ্যায় পন্ডিত, পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শ্রাস্ত্রী মহাশয়, প্রাচ্য-বিদ্যা-মহাণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ‘বর্তমান বৌদ্ধধর্ম্ম’ নামক ইংরেজী পুস্তকের ভূমিকায় (এবং সম্প্রতি পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত “হাজার বছরের বৌদ্ধ গান” নামক গ্রন্থের ভূমিকায়) প্রসঙ্গক্রমে নাথধর্মের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছে। তাঁর মতে নাথ ধর্মের উৎপত্তি বৌদ্ধ ধর্মের বাইরে , কিন্তু কালক্রমে তা বৌদ্ধ ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিল। তাঁর এরকম মতামতের ভিত্তি কি, জানি না ; তবে নাথ মার্গ, বজ্রমান-মার্গ, মন্ত্রযান মার্গ, সহজ-সাধনা ইত্যাদি ধর্মপন্থা একই গোষ্ঠীভূত - একটি থেকে আর একটি গন্ডী টেনে সম্পূর্ণরূপে বিশেষিত করা সম্ভবপর নয় । চৈতন্যদেবের প্রেম-বন্যায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের শাখা-প্রশাখাগুলি ভেসে ডুবে গিয়েছে, কিন্তু নাথ' উপাধিধারী জনসমূহ এখনও সগৌরবে তাহাদের স্বাধীন অস্তিত্ব রেখে চলেছে। নাথধর্মের জীবনী-শক্তির এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে ? বল্লাল-চরিতে যুগীগণের পুরোহিতদেরকে “রুদ্রজ ব্রাহ্মণ” বলা হয়েছে। যুগীগণ এখন “শিবগোত্র” বলে নিজেদের পরিচয় প্রদান করে। যুগীদের নাথ গণ শিব-অংশে সম্ভূত বলে বিখ্যাত । ভারতের ৯ম, ১০ম ও ১১শ শতাব্দীর ধর্মান্দোলনে তাদের গুরুগণের হস্তচিহ্ন সুস্পষ্ট বিদ্যমান। ‘গোরক্ষবিজয়’ এই যুগী গুরুগণেরই কীর্ত্তি কথা নিয়ে বিরচিত ।

আলোচ্য পুথিখানিকে “ময়নামতীর পুথি”’র আদিকান্ড বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে এবং এটা কে উক্ত পুথির সমসাময়িক প্রাচীন, তাতেও কোনও সন্দেহ করা যায় না। এটাতেও ‘ময়নামতীর পুথিতে’ উক্ত হাড়িফা, কানফা, পানফা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ

প্রভৃতি সিদ্ধাগণের জন্ম বিবরণ এবং ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্রের উল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যায়। ময়নামতী গোরক্ষনাথের এবং তার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র হাড়িফার মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। ভাব, ভাষায় ও কবিত্ব এই গ্রন্থ প্রায় ময়নামতীর পুথির সম শ্রেণীভুক্ত; এমন কি, উভয় পুথিতে কোন কোন ছত্রের আশ্চর্য্য রকম মিল পর্যন্ত রয়েছে ।

এর আগে শ্যামাদাস সেনের রচিত বলে কথিত "মীনচতন" নাম যে পুথির নামোল্লেখ করা হয়েছে, তা সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ মহাশয়ের সম্পাদকতায় ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়েছে। আমাদের মতে উক্ত পুথি ও সমালোচ্য "গোরক্ষবিজয়' অভিন্ন পুথি বই আর কিছুই নয়। পুথি দুইখানি পাশাপাশি রাখলে স্বতঃই, তাদেরকে যমজ বলে পাঠকদের ভ্রম হবে। বাংলা হাতের লেখা পুথির স্বভাব সিদ্ধ পাঠক-পার্থক্যের কথা ছেরে দিলে দুই পুথিরই প্রায় সব স্থলেই ভাবে ও ভাষায়, এমনকি কোন কোন স্থলে ছত্রে ছত্রে ও অক্ষরে অক্ষরে মিল দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ উভয় পুথিই একই মূল গ্রন্থের নকল মাত্র। এ স্থলে তা থেকে কিছু উদ্ধৃত করে আমরা অনর্থক ভূমিকার কলবর বৃদ্ধি করতে ইচ্ছা করি না।

পাঠকেরা পরিশিষ্টে দেখতে পাবেন, আমাদর এই 'গোরক্ষবিজয়'র নাম এক প্রতিলিপিতে "মীননাথ-চৈতন্য গোরক্ষবিজয়" লিখা রয়েছে। তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে, সম্ভবতঃ আদি পুথিখানির পূর্ণনাম "মীননাথ-চৈতন্য-গোরক্ষবিজয়" অথবা "গোরক্ষ বিজয় মীনচেতন" ছিল। হয়তো সংক্ষিপ্ত হয় তাই অবশেষে কোথাও বা "গোরক্ষবিজয়" নাম এবং কোথাও বা "মীনচেতন" নামে পরিচিত হয় গিয়েছে । ফলতঃ উভয়নামেরই বিস্তর সার্থকতা রয়েছে, তা সহজেই বোঝা যায়।

এই গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা কে, তা নিয়ে এখন এক বিষম সমস্যা উপস্থিত। "মীনচেতনে" দেখা যাচ্ছে, ওটা শ্যামদাস, সেন নামে কবির রচিত, আর "গোরক্ষ বিজয়ে" দেখা যাচ্ছে; ওটা কবীন্দ্র দাস, সেখ ফয়জুল্লা, ভীমদাস ও শ্যামদাস সেনের রচিত । এ অবস্থায় এর প্রকৃত মীমাংসা একরকম অসম্ভব বললেই হয়। তবুও আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটা বুঝেছি, গ্রন্থের ভণিতা ও অন্যান্য কয়েকটি কথা লক্ষ্য করে আমরা এ স্থানে সমস্যাটির বিচারে প্রবৃত্ত হচ্ছি-

“গোরক্ষ বিজয়ে” নিম্নলিখিত ভণিতাগুলি আছে –

(১) কহিন কবিন্দ্র অদ্য কথা অনুমানি।

শুনিয়া বলিল তবে সিদ্ধারজে বাণী ॥

(২) (ক) কহেন কবিন্দ্র দাস সুন নরগণ।

সিদ্ধার সঙ্গীত বাণী সুন বিবরণ।

(খ) কবিন্দ্র বচন সুনি ফজুল্লা এ ভাবিয়া ।।

মীননাথ গুরুর চরিত্র বুঝাইয়া ।

(৩) গোর্খের বিজয় কথা কবি রচিল।

‘সঙ্গিত পাচলা করি প্রচারিয়া দিল ।।

এই গ্রন্থে অবলম্বিত পুথির ভণিতাগুলি হল -

(১) বল হীন ভীমদাসে মনে অনুমানি ।।

সুনিয়া রচিলা সিদ্ধার সঙ্কেত যে বাণী ।।

(২) কহ মির ফজুল্লাএ, শুন রাজা মিন রায়

এব আপনার রক্ষা কর।

কামশাস্ত্র বুঝি পাইলা বিবিধ কৌতুক কৈলা

গোর্খ বাক্য পিন্ড রক্ষা কর ।।

(৩) কহিলেক ফজুল্লাএ মনেতে ভাবিয়া

মীননাথ গুরুর জে চরিত্র বুঝিয়া ।

(৪) কহে সেখ ফজুল্লায় বিচারিয়া পাজী।

স্ত্রীর বিষম মায়া বাদি আর বাজী ॥

এই কাব্যে অবলম্বিত ৩য় পুথির ভণিতাগুলি এই –

(১) বোলে কবি ভীম দাস মন অনুমানি।

সুনিয়া রচিল তব সিদ্ধা সবের কাহিনী ।

(২) কহে সখ ফাজুল্লাএ শুন গুরু মীন রায়

এবে আপনা চিন্তা সার।

কামশাস্ত্র বুজি পাইলা বিবিধ কৌতুক কৈলা

গোর্খ বাক্য পিন্ড রৈক্ষা কর ।

(৩) কহে সেখ ফাজুল্লাএ মানত ভাবিআ।

মীননাথ গুরুর জে চরিত্র বুঝিআ ।

(৪) কহে সেখ ফাজুল্লাএ বিচারি মন পাঞ্জি।

স্ত্রীর বিষম মায়া জানি হাসি বাজি ।।

কবির চতুর্থ পুথির ভণিতাগুলি এই –

(১) কই হিন্যি ভিম দাস মনে অনুমান।

সুনি আ আসিলাম আমি সিদ্ধার জবানি ।।

(২) কহে সেক পজুল্ল বিচারি মন পাঞ্জি ।

স্ত্রীর বিসম মায়া জানি হাসি বাজী ।।

কবির ৫ম পুথির ভণিতাগুলি এই –

(১) সেন স্যাম দাস কহ প্রভুর ভাবিয়া ।

কহ গোর্খনাথে প্রভু স্থির কর হিয়া ।।

(২) কহ মির ফজরল্লা বিচারিয়া পাজি।

স্ত্রীর বিসম মায়া যন হাসি বাজি ॥

কবির ৬ষ্ঠ পুথির ভর্ণিতাগুলি এই -

কহি সেক ফজুল্লা সুন গুরু মীন রাএ

আপনার চিন্তা কর সার।

কাম শাস্ত্র বুঝি পাইলা বিবিধ কতুক কৈলা

গাখ বাক্য পিন্ড রৈক্ষা কর ।

কবির৭ম পুথির ভণিতাগুলি এই -

কহ হিন ফজুল্লা মন অনুমানি।

রচিল সিদ্ধার সঙ্গীত জে বাণী।।

কবির ৮ম পুথির ভণিতাগুলি এই –

(১) কহে সেক ফজুলাএ (ফজুল্লাএ) শুন গুরু মীন রাএ

জাব আপনা চিন্তা সার।

কাম শাস্ত্র বুঝি পাইলা বিবিধ কতুক কৈলা

গোর্খ বাক্য পিন্ড রৈক্ষ্যা কর ।

(২) কহ সেখ কুজল্লাএ (ফজুল্লাএ) বিচারি মন পাজী।

স্ত্রীর বিসম মাআ জান হাসি বাজী ।।

“মীনচতন’ কেবল নিম্নলিখিত দুইটি ভণিতা আছে, -

(১) কহে সেন শ্যামদাস প্রভুকে ভাবিয়া ।

কহেন যে গোর্ক্ষনাথে স্থিরতা করিয়া ।।

(২)সেন সামদাস কহে গোর্ক্ষ মহাশয়।

আনন্দে করিল তবে কদলি বিজয় ।

“মীনচেতন” সহ নয়খানি পুথিতে যে ভণিতাগুলি পাওয়া গিয়েছে, তা পাঠকদের সামনে উপস্থিত করা হল। সেইসব আলোচনা করে দেখতে পাই, গ্রন্থখানি কবীন্দ্র দাস, সেখ ফয়জুল্লা, ভীমদাস ও শ্যামদাস সেন এই চারজন কবিরই রচিত। কিন্তু চার জন কবি মিলিত হয় এরকম একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, এরকম আনুমান নিতান্ত অনুমান বলই মনে হয়। সুতরাং বলতে হবে, উপরের চারজনের মধ্যে অবশ্য একজনই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করে গিয়েছেন ; কিন্তু সেই একজনক, এখন আমাদের তাই দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে “কবীন্দ্র” ঔপাধিক এবং মীর্জা ফয়জুল্লা নামক কবি বিদ্যমান আছেন, কিন্তু ভীমদাস শ্যামদাস সেনের নাম আগে আর কখনো শোনা যায়নি। এক কবীন্দ্র পরমেশ্বর পরাগল খাঁর আদেশে মহাভারত রচনা করে গিয়েছেন। মীর্জা ফয়জুল্লার রচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায়নি, কিন্তু তাঁর রচিত অনেক বৈষ্ণব পদাবলী পাওয়া গিয়েছে । এই কবীন্দ্র পরমশ্বর গৌড়ের সম্রাট হোসেন সাহের (১৪৯৪-১৫২৫ খৃঃ অব্দ) আমলের লোক এবং সম্ভবতঃ চট্টগ্রামবাসী ছিলন । মীর্জা ফয়জুল্লা সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক, যে যুগ আধিকাংশ পদাবলী লেখক আবির্ভূত হয়ছিলন।তাঁর নিবাস নিশ্চিত জানা গেলেও তিনি খুব সম্ভব চট্টগ্রামবাসীই ছিলেন। ভীমদাস ও শ্যামদাস সিন কোথাকার ও কখনকার লোক, জানবার উপায় নেই। তবে সম্ভবত তাঁরাও চট্টগ্রামবাসী লোক ছিলন ।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর, মীজ্জা ফয়জুল্লা, ভীমদাস ও শ্যামদাস সেন চট্টোগ্রামবাসী হলেও সমসাময়িক লোক ছিলেন বলে মনে করার কোন কারণ দেখি না। আবার এক সময়ের লোক বলে ধরলেও তাঁরা এক গ্রামবাসী ছিলেন বলে অনুমান করার কোন কারণ দেখা যায় না। এরকম অবস্থায় আমরা দেখতে পারি, বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন দেশের চারজন লোক মিলে এই গ্রন্থখানি রচনা করছিলেন, এটা কখনও সম্ভব নয়। বিশেষতঃ সমালোচ্য পুথিটি রূপান্তরিত হতে হতে যতই আধুনিক প্রতিভাত হোক না কেন, পুর্বোক্ত কবি চারজনের আনুমানিক আবির্ভাবকালের অনেক পূর্বের রচনা বলেই মনে হয়। এই কারণে আমরা ওটাকি, “পরাগলী মহাভারত” -রচয়িতা কবীন্দ্র পরামশ্বরর বা

বৈষ্ণব পদকর্তা মীজ্জা ফয়জুল্লার রচিত বলে মনে করতে পারি না । সুতরাং কবীন্দ্রদাস ও সেখ ফয়জুল্লা তাঁদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি ছিলেন, এরকম অনুমানও অসম্ভব মনে হয় না। একটি ভণিতায় ফয়জুল্লার নামের সঙ্গে "মীর' উপাধির সংযোগ দেখা যায় ঠিকই, কিন্তু তা যে বৈষ্ণব কবি মীর্জা ফয়জুয়ল্লার দেশ বিশ্রুত নামের সাদৃশ্য থেকে অজ্ঞ লিপিকরদের দিয়ে কল্পিত হয়নি ; তাই বা কে বলবে ?

দুইখানি পুথিতে শ্যামদাস সেনের যে ভণিতা পাওয়া গিয়েছে, তা আর কারও ভণিতার সঙ্গে মেলে না। পাঠকেরা লক্ষ্য করবেন, অন্যান্য গ্রন্থের মত "গোরক্ষবিজয়"র প্রারম্ভ ভাগে কোন দেব দেবীর বন্দনা নেই। কোনরকম বন্দনা ছাড়া প্রাচীন কবিগণ প্রায়ই কোন গ্রন্থ রচনা করেন না। শ্যামদাস সেনও বা এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম করবেন কেন, মোটেই বোঝা যায় না। ওটাতে যে সামান্য বন্দনাটুকু আছে, তা হিন্দু কবির বন্দনা কিনা, সে বিষয় খুব সন্দেহ আছে। আবার এতগুলি ও এ পুথির মধ্যে কেবল দুইটিতে মাত্র তাঁর নাম পরিদৃষ্ট হয় কেন, তারও কোনও উপযুক্ত কারণ খুজে পাওয়া যায়না। এই সব কারণ - বিশেষতঃ ভণিতাগুলির অল্পতা দেখে তাকে কিছুতেই এই গ্রন্থের মূল রচয়িতা বলে অনুমান করতে প্রবৃত্ত হয় না। বস্তুতঃ তিনি এর প্রকৃত রচয়িতা নন - তাঁর নামটি কোনরকমে প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে।

ভীমসেন সম্বন্ধও আমাদের ঠিক সেই কথা। তিনটি পুথিতে তাঁর যে তিনটি ভণিতা পাওয়া গিয়েছে, তা কবীন্দ্র দাসেরই ভণিতার মতো। দেখামাত্রই বোঝা যায় যে, ভণিতাগুলিতে কবীন্দ্রদাসের নামের স্থানেই ভীমদাসের নাম বসিয়ে দেওয়া হয়েছে । লিপিকরের অনবধানতা বা অজ্ঞতাবশত "কবীন্দ্রদাস নামের "ভীমদাস" নামে পরিণত হওয়াও কিছু আসম্ভব মনে হয় না।

কবীন্দ্র ও সেখ ফয়জুল্লা - এই দুইজনর মধ্যে কি এই গ্রন্থির প্রণেতা, এখন আমাদের তাই বিচার্য্য । "কবীন্দ্র" শব্দকে সেখ ফয়জুল্লার "উপাধি" বলে মনে করতে পারলে সব গোল চুকিয়ে যেত ঠিকই (যদিও সেকালে মুসলমানের ঐরকম উপাধি থাকার কথা জানা যায় না) । কিন্তু "কবীন্দ্র" শব্দের সঙ্গে "দাস" শব্দের সংযোগ দেখে কিছুতেই

ঐরকম মনে করা যেতে পারে না। সুতরাং বলতে হবে কবীন্দ্র ও ফয়জুল্লা এক ব্যক্তি নন।

এ স্থানে বলে রাখা আবশ্যক, পরম শ্রদ্ধাস্পদ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন, “ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ” থেকে প্রকাশিত শ্যাম দাসের ভণিতাযুক্ত “মীনচেতন” পুস্তকের প্রকৃত রচয়িতা চট্টগ্রামবাসী সেখ ফয়জুল্লা, শ্যামদাস সেন নন।

সম্পাদকের কাছে ‘গোরক্ষ বিজয়ে’’র যে আটটি হাতের লেখা পুথি আছে, সেগুলি বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্য একমাত্র আদর্শ পুথিতে ছাড়া অন্য কোন পুথিতেই কবীন্দ্র দাসের ভণিতা পাওয়া যায় নি। সেই পুথিতে তাঁর মোট ভণিতা তিনটি মাত্র, কিন্তু ওই আটখানি পুথিতে সেখ ফয়জুল্লা নামে যথাক্রমে (১+৩+৩+১+১+১+১+২=১৩) টি ভণিতা পাওয়া গিয়েছে। এখন বেশি সংখ্যক পুথিত বিশি সংখ্যক ভণিতা যাঁর পাওয়া যাচ্ছে, এই গ্রন্থটি যে তাঁরই রচিত, অন্য প্রমাণ ছাড়া কেবল এর দ্বারাও তা দৃঢ়রূপ বলা যেতে পারে । সেখ ফয়জুল্লা এর প্রকৃত রচয়িতা না হলে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশের লোক দিয়ে লিখিত এতগুলি প্রতিলিপিতে তাঁর নাম পাওয়া যাবে কেন, তা বুঝে ওঠা দুস্কর। এই কথা বিশেষতঃ গ্রন্থ্ মধ্যে ও যে সকল প্রমাণ বিদ্যমান আছে, তা বিবেচনা করে আমাদের মনে হয়, সেখ ফয়জুল্লাই এই গ্রন্থটির রচনা কর গিয়েছেন।

পক্ষান্তরে সত্যের অনুরোধে আমরা এ কথাও বলতে বাধ্য যে, ভণিতাগুলির ভাষা দেখে বিচার করতে গেলে কবীন্দ্র দাসকেই এই গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা বল স্থির করতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু তা সত্য হলে এতগুলি প্রতিলিপির মধ্যে কেবল একটিতেই, তাঁর নাম পাওয়া যায় কেন? একদিকে গ্রন্থে ফয়জুল্লার ভণিতাধিক্য ও তাঁর রচনায় মুসলমানর হস্তচিহ্ন ও অপরদিকে কবীন্দ্রদাসের এরকম ভাবের ভণিতা - উভয়ে মিলে সমস্যাটিকে বড়ই জটিল করে তুলেছে ।

সম্পাদকের আদর্শ পুথির একত্র অবস্থিত ২ (ক) ও (খ) ভণিতা দুটি দিয়ে এই সূচিত হয় যে কবীন্দ্র দাসের বচন শুনেই ফয়জুল্লা মীননাথের কাহিনী রচনা করেছেন। আবার ওই পুথির ৩য় ভণিতা থেকে জানা যায় যে, কবীন্দ্রদাস গোরক্ষনাথের এই বিজয় গাথা রচনা করে তা সঙ্গীত পাঁচালী আকারে (দেশময়) প্রচারিত করে দিয়েছেন। এরকম দ্বিবিধ উক্তির সামঞ্জস্য সাধন করে আমরা এটাই বুঝি, এই গাথার আদি প্রচারক বা রচয়িতা কবীন্দ্রদাস এবং ফয়জুল্লা তাঁরই প্রচারিত গাথা অবলম্বন কর এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করছেন। কেবল এই একমাত্র (আদর্শ) পুথিতেও যদি ফয়জুল্লার নাম না থাকত, তবে অন্য প্রমাণ অগ্রাহ্য করে কেবল ভণিতার ভাষা মাত্র দেখেই আমরা কবীন্দ্রদাসকেই সমালোচ্য গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা বলে স্থির করতে পারতাম। কিন্তু প্রত্যক পুথিতেই যখন 'ফয়জুল্লার ভণিতা পাওয়া যাচ্ছে, তখন তাঁকেই সমালোচ্য পুথির প্রকৃত প্রণেতা বলে মানতে আমরা ন্যায়তঃ বাধ্য। অন্য কথায় বলতে গেলে, আমরা কবীন্দ্র দাসকে এই গাথার আদি প্রচারক বা রচয়িতা ছাড়া সমালোচ্য পুথির রচয়িতা বলে স্বীকার করত পারি না। সকল দিক বিবেচনা করে দেখলে একমাত্র সেখ ফয়জুল্লাকেই এই গ্রন্থের প্রকৃত প্রণেতা বলে আমাদের স্বীকার করতে হবে । এটা যে হিন্দু কবির রচনা হতে পারে না, সে কথা আমরা আরও পরে,প্রদর্শন করছি ।

এই গোরক্ষবিজয় কাহিনী এক সময় "গাজীর গানের' পালার মত লোক মুখ গীত হত। তার প্রমাণ এখনও কতকটা পাওয়া যায়। চেষ্টা করলে আজও এ দেশের বৃদ্ধ লোকের পাকস্থলী থেকে এর অনেকাংশ নিষ্কাশিত করা যেতে পারে আমাদের মনে হয়, কবীন্দ্র দাস এই (মৌখিক) গাথার আদি রচয়িতা ছিলন, কিন্তু সেখ ফয়জুল্লাই তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। গ্রন্থে নিজেদের গুরু বা আদেষ্টাব নামোল্লেখ করে তাঁদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা সে কালের কবিগণের এক একটা স্বভাব সিদ্ধ রীতি ছিল, তা বোধ হয় সকলেই জানেন। "গোরক্ষবিজয়" কবীন্দ্র দাসের নামোল্লেখও সম্ভবতঃ এই ; কারণ ঘটে থাকবে । পাঠকগণ আর একটি কথা লক্ষ্য করবেন, "মীনচতনর মত আমার আদর্শ পুথি, ২য় ও ৫ ম পুথিগুলি হিন্দু লেখকের এবং ৪র্থ পুথিটি একজন মঘের হাতের লেখা।

সম্পাদকের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পুথিগুলি অসম্পূর্ণ বলে তাদের লিপিকরের নাম জানা যায় নি ঠিকই, কিন্তু তার মধ্য একটি মঘের ও অপর দুটি হিন্দুর বাড়িতে পাওয়া গিয়েছি। সম্পাদকের ৩য় পুথিটি মাত্র "চান গাজী" নামক জনৈক মুসলমানের হাতের লেখা। যদি ফয়জুল্লাই এর প্রকৃত রচয়িতা না হবেন, তবে হিন্দু ও মঘ লোকেরা তাঁর নাম কোথায় পাবেন, অথবা স্ব স্ব গ্রন্থে তাঁর নাম বজায় রাখবেন কেন, তার কোন উপযুক্ত কারণ খুঁজে বের করা দুষ্কর। সুতরাং কেবল এর দ্বারাও স্থির করা যায় যে, সেখ ফয়জুল্লা ভিন্ন এর প্রকৃত রচয়িতা আর কেউ নন। তা না হলে প্রত্যেক প্রতিলিপিতেই বা তাঁর নাম পাওয়া যাচ্ছে কেন, তারও কোন সদুত্তর মেলা কঠিন।

'"মীনচতন" পুথিতে কেবল প্রণেতার নামটি প্রক্ষিপ্ত, এমন নয় ; এর স্থান স্থান আরও প্রক্ষিপ্ত রচনা কিছু দেখা যায়। এর শেষাংশের "কালান্তলক্ষণ" প্রসঙ্গের সঙ্গে "যোগ-কালন্দর" ধৃত উক্তির বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছি বলে মনে হয়। "গোরক্ষ বিজয়'র এতগুলি প্রতিলিপি আমরা দেখেছি, কিন্তু কোনটাতেই "মীনচেতন"'র মত এত পাঠ-বিপর্যয় পরিলক্ষিত হয় না। তা সে সব কথা যাক, আলোচ্য গ্রন্থখানি যে কোন হিন্দু কবির রচিত নয়, তা নিম্নোদ্ধৃত বন্দনাংশ থেকেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হব-

"প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার ।
নিয়মে সৃজিলা প্রভু সকল সংসার ।।
স্বর্গ মত্ত পাতাল সৃজিলা ত্রিভুবন।
নানা রূপে কেলি কর না জা এ লক্ষণ ।।
তবে প্রণামিয়ে তান নিজ অবতার ।
নিজ অংশে করিলেক হইতে প্রচার ।।"

এরূপ 'বন্দনা সাধারণতঃ মুসলমান কবিরাই করার থাকেন, তা তাঁদের রচিত কাব্যরাজি দখলই স্পষ্ট বোঝা যাবে। আমাদের মনে হয়, "নিজ অবতার" অর্থ (যদিও ঠিক মোহাম্মদীয় শাস্ত্র-সম্মত নয়) এখান "হজরত মোহম্মদ'কেই লক্ষ্য করা গিয়েছে।

হিন্দু কবিদের রচিত গ্রন্থ্ এরকম “বন্দনা” কোথাও আছে কিনা, আমরা জানি না। “প্রথম প্রণাম করি প্রভু কর তার’ এটি মুসলমান কবিরই নিজস্ব উক্তি। নানা মুসলমান কবির রচনা উদ্ধৃত করে প্রোক্তরূপে উক্তসমূহের সমর্থন করা যেতে পারত, কিন্তু একে আমাদের স্থানাভাব, তাতে আবার কথাগুলিও এতই সত্য ও সন্দেহ বিরহিত যে, তার সম্বন্ধে আর অন্য প্রমাণ প্রায়াগর প্রয়োজন দেখি না।

এছাড়া গ্রন্থে মুসলমান ভাব ও ভাষার অন্যান্য যে সামান্য ছায়া পড়েছি, তার দ্বারাও বোঝা যায় যে, এটা মুসলমান ভিন্ন হিন্দু কবির রচনা হতে পারে না। “গোরক্ষ বিজয়” ও “‘মীনচতন’ উভয় গ্রন্থই ‘সয়াল” (সকল’ অর্থ বাচক) শব্দটি চট্টগ্রামের মুসলমান কবিগণের নিজস্ব সৃষ্টি। বহু কবির রচনায় এর অনক প্রয়াগ দেখা যায়।

একটি মুসলমানী পুথি থেকে এর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল –

“শুদ্ধ মাহম্মদ সখা প্রদান আল্লার ।

যার প্রম সৃজিলেক সয়াল সংসার ॥”

‘মন’ অর্থে ‘মনুরা’ ও ‘মনাই’ শব্দের বহুল প্রয়োগ এই গ্রন্থে দেখা যায়। এগুলি খাঁটি মুসলমানের সম্পত্তি। আরবী ‘মনবরা’ থেকে বাঙ্গালায় ‘মনুরা’ হয়েছে । সমগ্র হিন্দু সাহিত্যেও এই শব্দদ্বয়ের একটা দৃষ্টান্ত কোথাও মিলবে কিনা, সন্দেহ আছে। ‘খাক’ শব্দটি যে মুসলমানের সম্পত্তি তা একটা বালকেও জানে। “খাকেত মিসিব খাক রৈব মাত্র সার” - এরকম উক্তিও সমগ্র হিন্দু সাহিত্য বিরল বলেই আমাদের বিশ্বাস ।

এই গ্রন্থকে মুসলমান কবির রচনা বলার পক্ষে এতদধিক প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন আছে বল মন হয় না। এত যোগ-তত্ত্ব বিষয়ে যে সকল কথা বলা হয়ছ, নানা মুসলমান কবির রচনায় ঐরকম কথা অনক দেখা যায় । আলি রাজার ‘জ্ঞান-সাগর” সৈয়দ সুলতানের “জ্ঞান প্রদীপ’, মোহম্মদ সোফির “নুরকন্দিল”, আলাওলের কাব্যরাজি

এবং মুসলমান কবিগণর ভাটিয়াল গান আমাদের এ কথার সাক্ষ্য প্রমাণ করবে। এই ভাব কবির ভণিতা এবং গ্রন্থির ভাব ও ভাষা বিচার আমরা যা দেখছি, তা থেকে আমরা এখন দীনিশবাবুর সুরে সুর মিলিয় অসংকোচে বলতে পারি, শ্যামদাস সেন, ভীমদাস বা কবীন্দ্র দাস কেউই এই গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা নন, চট্টগ্রামবাসী সেখ ফয়জুল্লাই এর একমাত্র ও প্রকৃত রচয়িতা।

এই গ্রন্থের সৃষ্টি পতন বৃত্তান্তটি ইস্লাম-শাস্ত্রানুমোদিত নয় ও এত হিন্দু যোগ শাস্ত্রের অনক কথা আছে । তা দেখে আবার কেউ কেউ বলতে পারেন যে, মুসলমান কবি হলে এরকম সৃষ্টি পত্তন লিখবেন কেন ও হিন্দু যোগের এত কথাই বা জানবেন কি করে ? তার উত্তরে আমরা সবিনয়ে বলছি, এই গ্রন্থটি যে আদৌ একটি হিন্দু পুরাণ (আদ্য পুরাণ) অবলম্বন কর রচিত হয়েছে, একথা কবি নিজেই স্বীকার করে গেছেন। সুতরাং এটিতে এরকম সৃষ্টিপত্তন ও হিন্দু যাোগের কথা আছে বলে । বিস্মিত হবার কোনও কারন নেই। “যোগের কথা বলতে কল মুসমানী ও হিন্দু নাগর মধ্য মূলতঃ পার্থক্য অতিসামান্য বলেই আমরা জানি । বিশষতঃ যোগ শাস্ত্রবিষয় প্রাচীন মুসলমান কবিগণ যতো বাংলা গ্রন্থ লিখে গিয়েছেন, হিন্দু কবিগন তত গ্রন্থ লিখেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আলি রাজার “জ্ঞান-সাগর”, সৈয়দ সুলতানের “জ্ঞান-প্রদীপ” ও “জ্ঞান শেখ চৈতসা', মোহম্মদ সাফর 'নুরকন্দিল', মুরসিদের 'বারমাস্যা', যোগকালন্দ্রর' ও 'সত্য-জ্ঞান-প্রদীপ প্রভৃতির মত গ্রন্থ হিন্দু কবিগন রচনা করছেন বলে আমরা জানি না। এই হিসাবেও সমালোচ্য পুথিটিকে মুসলমান কবির রচনা বলেল সহজেই অবধারিত করা যেতে পারে ।

পাঠকগণ দেখবেন, পুথিটি “ওঁ হরি। নমো গণেশায় নমঃ । বেদে রামায়ণে চৈব” ইত্যাদি হিন্দু কবির ব্যবহৃত " বাক্যাবলী দ্বারাই আরাম্ভ করা গিয়েছে; কিন্তু তা হলেও এটা হিন্দু কবির রচিত বলে মনে করা যেতে পারে না। এই কথাগুলি যে সকল মূল কবিই লিখে থাকেনতা নয়; নকল নবিশষগণও তা লিখে দিতে পারেন। এক্ষেত্রেও যে তা হিন্দু নকলকার গণেরই কাব্য, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হতে পারে না। '

আরও একটা কথা এখানে বিবচ্য। গোরক্ষ-বিজয়ে’র যতগুলি প্রতিলিপি আমরা পেয়েছি, সবগুলিই হিন্দুর বাড়ীতে পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে একটি মুসলমানের এবং একটি বৌদ্ধের লেখা; আর সবগুলিই হিন্দু প্রতিলিপিকারকের হাতে লেখা। হিন্দু লেখকরা হিন্দু কবি কবীন্দ্র দাসের নামের স্থান একজন মুসলমানের নাম বসিয়ে দেবেন, এটা একবারেই অসম্ভব। এর দ্বারাও বোঝা যায় যে, এটি কবীন্দ্র দাসের রচনা নয়। অতএব আমরাও মাননীয় দীনেশ বাবুর মত এই গ্রন্থির প্রকৃত গুণ ‘‘আদি রচয়িতা’ বল সেখ ফয়জুল্লার কণ্ঠেই জয়মালা পরিয় দিচ্ছি।

তিনখানি পুথির সাহায্য ‘গোরক্ষ বিজয়’ সম্পাদিত হয়েছে । আদর্শ পুথিটি ১১৮৪ ‘‘সম (সন) সাক্ষ এ (?) বাসরে লিখিত বলে জানা যায় । ওটা বঙ্গাব্দ কি শকাব্দ, তা কিছু ঠিক বোঝা গেল না। ওটাকে শকাব্দ ধরলে (১৮৩৭- ১১৪৪=) ৬৫৩ বছর পূর্ব্বে এবং বঙ্গাব্দ ধরলে (১৩২৩-১১৮৪=) ১৩৯ বছর পূর্ব্ব পুথিটি প্রতিলিপিত হয়েছিল বলে অবধারণ করতে হয়। তবে প্রথম কালটি গ্রহণ করার বিপক্ষে একটি কথা আছে । এদলে সাধারণত কাগজ দুই তিন শো বছরের বেশি দিন স্থায়ী হয় না। অন্ততঃ সরকম প্রাচীন কোন কাগজ বা পুথি' এ পর্যন্ত আমাদর চাখে পরেনি। এই কারণ ওই কাল গ্রহণ করতো আমাদের স্বভাবতই একটা দ্বিধা জন্মাচ্ছ । দ্বিতীয় কাল গ্রহণ সম্বন্ধে কান প্রশ্নই হতে পারে না। বরং পুথির ও কাগজের অবস্থা দেখে তাকি ১৩৯ বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী প্রাচীন বলেই মনে করা হয়। এই রকম কোন কাল দেওয়া থাকলে কাগজ দেখে আমরা তাকে অন্ততঃ দুইশো বছরের প্রাচীন বলি মন করতাম।

দ্বিতীয় পুথিটি একটা প্রাচীন পুথির নকল১২৫৬ মঘী সনে লিখিত । ওটার বয়স (১২৭৮-১২৫৬) ২২ বছর মাত্র ।

তৃতীয় পুথিখানি খন্ডিত,তারিখ নেই। কাগজ দেখে ওটাকে একশো বছরের প্রাচীন মনে হয় না।

আদর্শ পুথির প্রতিলিপিকারক শ্রীড়োমন পাট্টাবীর (?) নিবাস ভট্টাচার্য্যর তালুক থাইনর মস্তার" (?) কাথাও জানা যায় নি। পুথিটি ত্রিপুরা জেলার চৌদ্দ গ্রাম থানার কোন গ্রামে থেকে আমাদের জনৈক বন্ধু শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বিশ্বাস মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছিল। হয় পুথির লেখকের নিবাস চট্টোগ্রাম বাঁশখালী থানার অন্তর্গত ডেঙ্গাপাড়া নিবাসী জনেক হাড়ীর বাড়ীত পাওয়া গিছিল ।

"মীনচেতন" পুথিটি সন ১২২৪ মাহে ২৮ চৈত্রের লেখা এর লেখক "শ্রীতনু রামদেব দাস সদা এ গুরুপদে আসমোকাম ভানি" । ভানি কাথায়, বলতে পারি না। এই পুথির বয়স (১৩২৩-১২২৪=) ৯৯ বছর মাত্র।

'গোরক্ষ বিজয়ের' বর্ণিত ঘটনারাজি অনক পূর্বর মুসলমান আমলেরও পুথি বলে মন করা হয়। কিন্তু পুথিটি? কখন রচিত হয়েছিল, কে বলবে? কালে কালে রূপান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও পুথির ভাষায় প্রাচীনত্বের অনেক নিদর্শন রয়েছে । সে সমস্ত আমরা পরিশিষ্ট ভাগে "প্রাচীন শব্দ তালিকা" অংশে প্রদর্শন করবো। সবদিক বিবেচনা করে আমাদের মনে হয়, এই (পুথিটি অন্যান্য পাঁচ বছর পূরবে রচিত হয়েছিল । দীনেশবাবু এদিক পাঁচ ছয় শো বছর পুর্বের রচনা বলে অনুমান করছিলেন।

দুর্গার শাপে গোরক্ষনাথের গুরু পরম যোগী মীননাথের কদলীনগর গমন ও যোগভ্রষ্ট হয় সেখানে ১৬ শ কদলী রমণী গণের সঙ্গে বিহার ও অদ্ভুদ প্রকারের সংসারাশ্রম এবং পরে গোরক্ষনাথ কর্তৃক বহু কষ্ট্রে তার উদ্ধার সাধন, এই পুথির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

গ্রন্থর সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করি বুঝিবার বিষয় নয়, - উপভোগ করার বস্তু । আমরা পাঠকবৃন্দক গ্রন্থটি একবার মনোযোগর ও সঙ্গে পাঠ করে দেখবার অনুরোধ করি। এই গ্রন্থে বাংলার ধর্ম, ইতিহাস ও সমাজ সম্বন্ধে আলোচনাযোগ্য অনেক কথা আছে। । "ময়নামতীর পুথি"তে দেখেছিলাম,--

"চারি সিদ্ধাএ শাপ পাইল দুর্গা দেবীর পাশে।

মীননাথ চলি গল কদলীর দেশ।

গার্থনাথ চলি গল ভাড়ার শঙ্কর

কাণফা চলিয়া গেল বহরীর ঘর ॥

হাড়িফা পাইল বর তোমা সবিবার।

তেকারণে হীন কর্ম্ম কর তোমার ঘরে।”

এই কথা বলে রাণী ময়নামতী পুত্র গোপীচাঁদ রাজার সঙ্গে সিদ্ধাগণের অলৌকিক কার্য্যাবলীর আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থেও সেইসব কথার প্রতিধ্বনি আছে; যথা -

“তবে সিদ্ধা চলি গেল যার জেই ঘর।

প্রথম কাণফা গেল বহাড়ির দ্বার ।

হাড়িফা চলিয়া গিল মনামতি পুরী ।

তথা গিয়া রহিল হাড়িরূপ ধরি ।

গাভুর সিদ্ধাই গেল আপনার দেশ।

মীননাথ চলি গেল কদলী উদ্দেশ।।

কদলীত দেখে যুবতী সব প্রজা।

স্ত্রীরাজ্য হত্র সে জে স্ত্রী হএ রাজা ।”

(ক) হাড়িফার কার্য্যকলাপ ও মেহারকুলে (ত্রিপুরায়) গমন করে রাণী ময়নামতীর গৃহে হাড়ির কর্ম করার কথা ‘ময়নামতীর পুথি’তে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে; সতরাং এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

(খ) কাণফা ‘ডাহুকা’ নামের স্থান ‘বহরীর’ ঘর গমন করছিলন। এই ‘ডাহুকা’ (পাঠান্তরে ডাহুরা বা ডউকা) কোথায়? ‘ডাহুকা’ কে ‘ডবাক’ মন করল তার দ্বারা ‘ঢাকা’ বুঝতে পারি কি? ‘বহরা’ শব্দকে কোন রমণীর নাম বল মনে করার আগেই এখানে একটি কথা বলে রাখি। বধির’ শব্দের অপভ্রংশ ট্টাগ্রামে পুংলিঙ্গে “বহরী ও স্ত্রীলিঙ্গে ‘বহরী’ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমাদের মনে হয়, ‘বহরী’ শব্দ এখন ঐ রূপ

কোন বধিরা রমণীকেই নির্দেশ করা হয়েছে। মীচতন পুথিতে,‘বহরী’ স্থান ‘আরবী’ পাঠ এবং আমাদের প্রাপ্ত আটখানি পুথিতেই ‘বহরী’ পাঠ দেখা যায়।

(গ) গাডুর সিদ্ধার “আপনার দেশ” কোনটি, তার কোন উল্লেখ পুঁথিতে দেখা যায় না। পাঠকগণ জানেন, এক “পূর্ণচন্দ্রের” কাহিনী নিয়ে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ‘পূর্ণচন্দ্র’ নামে এক নাটক রচনা করে গিয়েছেন ওই নাটকে তাকি"“শ্যালকোট” রাজ্যের রাজা “শালিবানের” পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের মনে হয়, এই গাভুর সিদ্ধাই ওইখানে ‘পূর্ণচন্দ্রের’ নাম উল্লিখিত হয়েছে। ‘গোরক্ষ বিজয়’ এরই অন্য এক স্থান গাডুর সিদ্ধাকে ‘সাল্লবনের বিটা’ বল উল্লিখিত দেখতে পাই; যথা,-

“তার লাগি যদি জাএ হাত পা ও কাটা।

তথাপিহ হই আমি সাল্লবনির বিটা ।।”

‘গাডুর’ বা যুবক অবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ করে যোগ সাধনে গুরুর আশ্রমে বাস করেছিলেন বলেই সম্ভবতঃ তাঁর ‘গাডুর সিদ্ধা’ । নামকরণ হয়েছিল। ওই নাটকে তিনি গোরক্ষনার মন্ত্রশিষ্য বা মানস পুত্র ছিলেন বলে উল্লেখিত হয়েছেন।

“আজ্ঞা দিল ভবানী পাইলা তুমি আশ ।

বর পাইলা চল তুমি সত মা এর পাশ ॥

সত মাএ ভজিবোর দখিয়া জোয়ান।

তাহার কারণ তুমি পাইবা অপমান ॥”

এই কথাগুলিতে “গোরক্ষ বিজয়ে” যে ঘটনার আভাস দেওয়া গিয়েছে, “পূর্ণচন্দ্র” নাটকে সৎমার ব্যবহার ও তার দ্বারা পূর্ণচন্দ্রের লাঞ্ছনায় তাই পরিস্ফুট করা হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীযুক্ত রাধা গোবিন্দ বসাক মহোদয়ের প্রচারিত “শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, পূর্ণচন্দ্র নামে এক মহানুভব। ব্যক্তির সুবর্ণচন্দ্র নামে এক পুত্র ছিলেন। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র বঙ্গান্তর্গত চন্দ্রদ্বীপের রাজ পদ লাভ করেন। তাঁর এক

পুত্র শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরের রাজত্ব করতেন। তিনি সেখান থেকে তাম্রশাসন প্রচারিত করেছিলেন। সুবর্ণচন্দ্রের আরেক পুত্র মাণিক চন্দ্র রাণী ময়নামতীর স্বামী ও গোবিন্দ চন্দ্রর বা গোপীচাদের পিতা এবং পাটিকারা বা মহারকুলর রাজা ছিলন র' দুর্লভ মল্লিকির 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত''উল্লিখিত আছে--

"সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ্র পিতা।

তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা ।"

'ধাড়ি' শব্দের 'বৃহৎ', সুতরাং 'পূর্ণ অর্থ করে কেউ কেউ "ধাড়িচন্দ্র" অর্থ "পূর্ণচন্দ্র ধর নিয়েছেন। সুতরাং বলতে হবে, প্রাক উক্ত তাম্রশাসনের পূর্ণচন্দ্রই "চন্দ্ররাজ বংশের আদি পুরুষ ছিলন। "গোবিন্দচন্দ্র-গীতে'র উদ্ধৃত পদানুসারও ধাড়ি চন্দ্রের (পূর্ণচন্দ্রেয়) পুত্র সুবর্ণচন্দ্র এবং তার পুত্র মাণিক চন্দ্র বলে জানা যায়, কিন্তু শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বলেন, সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও তার পুত্র শ্রীচন্দ্রদেব ও মাণিকচন্দ্র । এই বৈষম্যের সামঞ্জস্য বিধান আবশ্যক। "পূর্ণচন্দ্র নাটকের 'পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে চন্দ্ররাজ বংশের উক্ত আদিপুরুষ "ধাড়িচন্দ্রের" বা পূর্ণচন্দ্রের কোন সম্পর্ক আছে। কিনা, তারও একটা মীমাংসা হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) গুরু গোরক্ষনাথের ভারত-ব্যাপী প্রভাব ছিল বলে মনে হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারত 'গোরক্ষ' শব্দ যুক্ত অনেক স্থানের নাম থেকে এবং গোরক্ষনাথের 'জলধরী' উপাধি দেখে মনে হয়, পাঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধর নগর তাঁর জন্মস্থান ছিল। তা যাই হোক, তিনি যে এই শস্য-শ্যামলা, মলয়জ শীতলা বঙ্গভূমিকেই তাঁর প্রধান কার্য ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করেছিলেন, তার প্রমাণ অনেক স্থানেই দেখতে পাই। "মীনচেতনে" স্পষ্টভাবে

"গোর্খনাথ চলি গেল বঙ্গ নিকেতন" ।

বলে উল্লিখিত রয়েছে । "গোরক্ষ বিজয়ে" তাঁর পুনঃ পুনঃ বিজয় নগর ও বকুল তলায় গমনের উল্লেখ দেখা যায়। ত্রিপুরা জেলায় এক বিজয় নগর আছে, কিন্তু পথিতে উক্ত বিজয় নগর এটা বলে মনে হয় না। রাজসাহীর অদরে প্রসিদ্ধ বিজয় সেনের রাজধানী এক বিজয় নগর আছে। সম্ভবতঃ তাই পুথির উক্ত স্থান হবে । বকুলতলা' সত্য সত্যই

কোন স্থানের নাম কিনা, বলবার উপায় নেই। “ময়নামতীর পুথি’-তে তাঁর ‘ডাড়ার’ সহর বা রাঢ় দশ গমনির উল্লেখ পাওয়া যায়। ওই পুথির এক জায়গায় তাঁর চার স্থানে চারটি সাধন পীঠ থাকারও উল্লেখ পাওয়া যায় ;

“আদ্য মাটি আছে কিছু মহারকুল নগরে।"

নিজ মাটি আছে কিন্তু বিক্রমপুর সহরে ।

আর আছি আদ্য মাটি তরপের দেশ ।

চাটিগ্রাম পূর্ব্ব মাটি জানিবা বিশেষ ॥”

এই উক্তি দ্বারা বিক্রমপুর (ঢাকা), মেহরকুল (ত্রিপুরা), তরপের দেশ (শ্রীহট্ট) এবং চাটিগ্রাম (চট্টগ্রাম) - এই কয়টি দেশই তাঁর লীলা-ক্ষেত্র ছিল বলে জানা যায় । কিন্তু এই সকল পীঠস্থান ‘কোথায়, তা আজও নির্ণীত হয়নি। এ বিষয় আমাদের ঐতিহাসিক দিগের দৃষ্টিপাত করা একান্ত দরকার।

(ঙ) মীননাথ যে “কদলী নগরে” গিয়ে যোগভ্রষ্ট হয়েছিলেন, তার উল্লেখ অনেকগুলি গ্রন্থেই পাওয়া যাচ্ছে । কিন্তু এ ‘কদলী নগর’ কোথায়? এ সম্বন্ধীয় পুথিগুলিতে অন্যান্য যে সমস্ত স্থানের নামোল্লেখ আছে, তার সবগুলির নির্দেস আজও হয়নি সত্য, কিন্তু তার মধ্যে একটি স্থানও কল্পিত বলে মনে হয় না। এ অবস্থায় “কদলী নগর” কে একটা কল্পিত স্থান বল একবারের উড়িয়ে দেওয়া কতদুর যুক্তিসঙ্গত হবে, বলতে পারি না । শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় “কদলী নগর” অর্থ স্ত্রীস্বাধীনতার দেশ কামরূপ, মণিপুর বা ব্রহ্মদেশ আনুমান করেছেন। তাঁর এরকম অনুমানের ভিত্তি কি, জানি না। তবে ‘কদলী নগর’ যে স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ ছিল সে বিষয় সন্দেহ নেই। “স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ’ বললে সে কালে একমাত্র প্রাচীন কামরূপকেই বুঝতো বলে মনে হয়। কারণ আর কোন দেশের স্ত্রী জাতি ঐ দেশের নারী জাতির মত স্বাধীনতা ছিল না আজও লোক-প্রবাদ সে কথা ঘোষিত হচ্ছে। দেশের বর্ণন করতে গিয়ে গোরক্ষনাথ একস্থান বলেছেন,-

“নাথে বোলে এহি রাজ্য বড় হএ ভালা।'

চারি কড়া কড়ি বিকা এ চন্দনর ‘তালা ।।

লোকর পিধন (দেখে) পাঠর পাছড়া।

প্রতি ঘর চাল দেখে সোনার কোমড়া।

কার পুখরির পানি কেহ নাহি খাএ ।

মণি-মাণিক্য তারা রৌদ্রেতে সুখা এ॥

এক রাউলের ঘরে দুই চারি মাই ।

ষোল শয় কদলী একলা মীনের ঠাই ।।

স্থানে স্থানে দেখে সব আমরা নগর।

সকল নগরে দেখে উচ্চ উচ্চ ঘর ।

সুবর্নের ঘর সব পতাকা রচিত ।

সকল দেশের লোক রতনে ভূষিত

রাজ্যের সকল দেখে ভাল তার রঙ্গ।

প্রতি ঘর দ্বার দেখে হিরণ্যের টঙ্গ।

ধন্য ধন্য রাজ নগর করিয়া বাখানি।

সুবর্ণের কলসি সর্ব্বোলোকে খাএ পানি ।।

“ময়নামতীর পুথি’-তেও মাণিকচাঁদের রাজ্যের (মোহারকূলের) ঠিক ঐরূপ বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয় । কদলী দেশ-বাসীগণ যে নাথ- ধর্মবিশ্বাসী যুগী জাতীয় ছিল, তার বহুল প্রমাণ আলোচ্য গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। গোরক্ষনাথ যখন তীর গুরু (মীননাথের) উদ্দেশ্যে “কদলী নগরে” উপস্থিত, তখন তিনি তার মীননাথের ধনিত এক অতীব রমণীয়-সরোবর-তীরে বিশ্রাম করছিলন । সই সময় এক নগর-যুগিনীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত

হয়। যুগিনী গোরক্ষনাথের রূপ-লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রেম-ভিক্ষা করতে গিয়ে বলছে,-

'যুগী বাড়ীত যোগী যাইবা, অন্ন জল তৃপ্তি পাইবা

কিবা আর হইবেক ব্যয় ।

তুমি আমি জ্ঞাতিজন, এক গোত্রে উৎপন,

তাতে কিছু দোষ নাই হএ ।"

তারা যে ব্যবসায়ও বস্ত্র-বয়নকারী ছিল, তার প্রমাণও এই গ্রন্থে আছে । উক্ত যুগিনীই বলছে,-

"কাটিমু চিকন সুতি, তুমিহ বুনিবা ধুতি,

হাটতি নিবা যে বেচিবার।"

এই যুগী জাতীয়রা যে এখনও বস্ত্র তৈরিতে সিদ্ধ হস্ত, তা মন হয় কাউকেও বলে দিতে হবে না।

"তবে সে সমাজ জাইবা, মদের ঘটি আগো পাইবা'

কথা কইবা দুই হাত লাড়ি।

এই উক্তিও কোনও পার্বত্য জাতীয়কে নির্দেশ করছে বলে মনে হয়। সামাজিক হিসাবে দেখা যায়, পার্বত্য জাতীয়েরাই। উৎসবাদিতে সকলে একত্র হয়ে কলসী কলসী মদ্য পান করে থাকে। এই গ্রন্থের মধ্যে বহু স্থানেই তাদেরকে 'যুগী রাউল' বল উ-ল্লখ করা গিয়ছ; যথা - 'মোর তুলি খোটা দিব তোর যুগী রাউলে।" ।

এই 'রাউল' শব্দটি কান অর্থবোধক ও কোন ভাষা থেকে উৎপন্ন, ঠিক বলত পারি না। চট্টগ্রাম 'রাউলী' শব্দের খুব প্রচলন আছে। রাউল' অর্থ 'বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে বোঝায়। '"রাউলীর নিকট ছিল চাওয়া" বলল "অসম্ভব প্রার্থনা করা" বুঝত হয়। কারণ 'রাউলীর' ছলি হয় না, সে কি করে ছেলে দিবে? "ভাল কথা রাউলর ঝি গো করিছ

বচন" - ইত্যাদির মতা (বাক্য এক বোঝা যায় যে, এই 'রাউল'গণ একবার গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না, বরং তাদের পুত্র কলত্রাদি ছিল । এই হিসাবে বৌদ্ধ 'রাউলী' শব্দের সঙ্গে এই 'রাউল' শব্দের আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকলেও অর্থগত কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না । সকল দিক বিবেচনা করে আমরা তাদেরক গৃহস্থ্ যোগী বলেই অনুমান করছি।

মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতির মত এই 'রাউল' যোগীরাও নাথ সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল, সন্দেহ নেই । উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত যোগীরা মাগিয়া খেতেন, তা মীননাথ নিজেই স্বীকার করেছেন । গোরক্ষনাথর বিবিধ প্রবোধ বচনও যখন কামিনী-কাঞ্চনের মায়ামোহ ত্যাগ করা মীননাথের পক্ষে অসম্ভব মনে হচ্ছিল, তখন তিনি বলছেন,- "আমার আশা ত্যাগ কর। আমি অধঃপাত গিয়েছি । তথাপি অনুরোধ করি, আমাকে –

"মাগনিয়া যুগী বলি নাহি দিও খোটা।
অনন্ত সিদ্ধার মধ্যে না বলিও ঝুটা ।"

এবং মরিল -

"কাঁথা ঝুলি নেও পুত্র তার লাউয়া লাঠি ।
মুষ্টেক তোমার হস্ত মোরে দিও মাটি ॥"

আজও যুগীদেরকে মৃত্যুর পর গর্তের ভিতর বসিয়ে মাটি দেওয়া হয়ে থাকে, তা মনে হয় অনকই জানেন।

"ময়নামতীর পুথি"র মতো এই গ্রন্থেও "কার পুখরির পানি কিহ নহি খাএ"- এরকম উক্তি আছে। পুকুরের কথা বলতো গেলে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলায় যত পুকুর আছে, বাঙলার বা তার বাইরের আর কোন দেশে তত পুকুর ও আছে কিনা বলতে পারি না। এই তিন জেলাবাসী লোকের মত আর কোন দেশের লোক এমন গর্ব করে এরকম উক্তি করতে। পার, তা আমাদের জানা নেই। এক সময়ে কোচ জাতীয়েরা দলবদ্ধ হয়ে দেশের নানা স্থানে গিয়ে বাস করছিল। এখনও ত্রিপুরা জেলার

স্থানে স্থানে তাঁদের খনিত পুষ্করিণী পুঞ্জ (পুঞ্জ বললাম ; কেন না একই স্থানে রাশি রাশি পুষ্করিণী খনিত হয়েছে) “কোচের কাটা পুকুর” বলে উক্ত হয়ে থাকে। তারা কারও পুষ্করিণীর জল কেউ খেত না। তাই এই পুষ্করিণী পুঞ্জের সৃষ্টি হয়েছিল। তারা সন্ন্যাসী-বেশে থাকত এবং অনাহুতভাবে গৃহস্থর বাড়ী উপস্থিত হয় আহার সংগ্রহ করত। তাদের অন্যকোন ব্যবস্যা ছিল না। কোন কোন স্থানে তাদের বংশধরেরা এখনও বাঙালী ভাবে বাস করছে । এদের কে ‘ফিরালী, ‘কপালগন্ডা’ এবং ‘খলা ও ঘাগী’ বলেও বলা হয়ে থাকে। তারা দেশে দেশে ফিরে লোকের কপাল বা ভাগ্য গণনা কর , ‘এ বার খুব তুফান হইবে’, ‘আগুনের ধূম বেশী হইবে’ ইত্যাদি আজগুবি কথা বলে ভিক্ষা করে বেড়ায়। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একটি মহিষ-শৃঙ্গ থাকে, পরিধানে গেরুয়া। প্রত্যেক গৃহস্থের দ্বারে গিয়ে তারা এই শিঙ্গাতে এক একবার ফুঁ দিয়ে থাকে তাতে নাকি গৃহস্থের কল্যাণ হয়। আলোচ্য গ্রন্থর ১১৭ পৃষ্ঠায় কবি এক স্থানে ওদেরকে “মাগনিয়া যোগী” অর্থাৎ পেটের দায়ে 'যোগী বলি উল্লখ করেছেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় “কদলী নগর” অর্থে স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ কামরূপ মণিপুর বা ব্রহ্মদেশ অনুমান করছেন, সে কথা আগেই একবার বলা হয়েছে। আমরা জানি, পার্বতীয় সকল জাতির মধ্যেই স্ত্রী-স্বাধীনতা এখনও প্রবল রয়েছে । কোচবিহার বা কামরূপ কামতা বিহার রাজ্যে এক সময় কুহকিনী রমণীগনের বিশেষ প্রভাব ছিল। এসখানে আজও স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রবল এবং স্ত্রী লোকেরাই প্রায় সকল কাজ করে থাকে। তারা নানা প্রকার তন্ত্র-মন্ত্র ও মোহিনী বিদ্যা অবগত ছিল। সেই সব সময় সে দেশে পুরুষের সংখ্যা কম ছিল বলে মনে হয়। তা না হলে নারীদের এত প্রাধান্য হবে কেন? “একক রাউলির ঘরে দুই চারি মাই” এই উক্তিটি স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্যই বোঝাচ্ছে। এই জন্যই মনে হয়, একে সাধারণত “নারীরাজ্য” বলা হত। এই পুথিতেও দেখা যায়,

“কদলীতে দেখ যুবতী সব প্রজা।

স্ত্রী রাজ্য হএ সেজে স্ত্রী হএ রাজা ॥”

এখনও সাধরণর বিশ্বাস যে, কামরূপ গেলে পুরুষকে ভেড়া বানিয়ে রাখা হয়। সম্ভবতঃ মীননাথের সেই দশাই হয়ছিল । তাঁর পতনের পর থেকেই মনে হয়, ঐ প্রবাদ বিশেষ রূপ প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। কামরূপ দেবী ভগবতীর যোনি-পীঠ। এইস্থানে নিস্কাম ভাবে সাধনা সিদ্ধি লাভ করতে পারলে সিদ্দ যোগী হওয়া যায়। প্রায় তীর্থক্ষেত্রে সাধকের পরীক্ষার জন্য প্রেতের বাস আছি । কেন না, ধর্মের পথ কন্টকাকীর্ণ; সাধন পথ অনেক বাধা অনক বিঘ্ন । আমাদের মনে হয়, ভগবতী দূর্গা দেবী ? স্বয়ংই তাঁর কামরূপিণী সহচরীগণের সহায়তায় যোগী মীননাথের তপঃপ্রভাব পরীক্ষা করেছিলেন। মীননাথ সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। এই যোনিপীঠ গোরক্ষনাথেরও পরীক্ষা গ্রহণের সঙ্কেত বাণী এই গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। গোরক্ষনাথ মাতৃভাবে ভাবিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন কিন্তু মীননাথের পতন হয়েছিল। তারই উদ্ধারের জন্য গোরক্ষনাথের প্রয়াস আর তারই ফলে এই “গোরক্ষ বিজয় - মীনচেতন” গ্রন্থ্।

প্রচলিত শিব-কীর্ত্তনে প্রথমেই আমরা “কুচনী নগরর” উল্লেখ পাই। “কুচনী নগর” বললে কোচ জাতিকে তার বর্হিভূত মনে করা যায় কি ? পাঠকরা দেখেছেন, মীননাথ দূর্গা দেবীর নিকট শাপপ্রাপ্ত হয়ে উত্তর দিকে গিয়েছিলেন ; যথা, -

“পূর্ব্বে গেল হাড়িফা দক্ষিণে কানফাই।

পশ্চিমে গেলেন্ত গোর্খ উত্তরে মীনাই ।।”

এখন কথা হতে পারে, মীননাথ কোন স্থান থেকে উত্তরে গিয়েছিলেন? প্রথম, - হাড়িফার গন্তব্য স্থান “ময়নামতী” বা ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মেহারকূল, তা আমরা জানি। এই ময়নামতী এক পশ্চিম এবং গোরক্ষনাথের গন্তব্য স্থান আলোচ্য পুথি মতে “ডাড়ার সহর” বা রাঢ় দেশ এবং শ্যামদাসের “মীনচেতন” মতে “বঙ্গ নিকেতন” থেকে পূর্ব - এর মধ্যে একটি স্থানকে কেন্দ্র ধরলে সেখান থেকে উত্তরে কোচবিহার বা কামরূপ কামতা বিহার রাজ্য পাওয়া যায়। আর কানফার গন্তব্য “ডাহুকা” যদি ডাবাক বা ঢাকা প্রদেশ হয়, তব মীননাথের গন্তব্য স্থান যে প্রাক-উক্ত স্থান হয়, তাতে অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত নলিণীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় “মীনচেতনার আলোচনায় গোরক্ষনার্থর গন্তব্য স্থান রাঢ় দশান্তর্গত রাজসাহীর “বিজয়নগর’ বলে অনুমান করছেন। যদি তাঁর এ অনুমান সত্য হয়, তবে আমাদের এই আনুমানিক কেন্দ্রের সঙ্গে তার বেশ একটা সামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হয় । নিমোকৃত অংশে সম্ভবতঃ শৈব ধর্মের আদি গুরু মহাদেবের বিহার-শৈল কৈলাশে (হিমালয়ের) পাদ মূলবাসী কোচদেরকেই শিব বংশ সম্ভূত বলে কল্পনা করা হয়েছে, -

“কৈলাসিত হর গৌরী আছে সেই ঠাই ।।"

তবে যদি হর-গৌরী ক্রীড়া কৌতুহল।

তান বংশ হতে ক্ষিতি ভরিল সকল ।।”

শৈবধর্ম যে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ অনার্য কোচ, ত্রিপুরা, নাগা প্রভৃতি পার্বত্য জাতির মধ্যে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়ে ক্রমে আর্য্যধর্ম্মভুক্ত।

হয়ে গিয়েছিল, এ কথা অনেকেই বলে থাকেন। নাথ যুগীরা যে এরকম অনার্য্য জাতির অন্তর্ভুক্ত, তাতে আর সন্দেহ নেই । কোচ জাতীয়রা শৈব ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। এখনও কোচবিহার রাজ্যে (প্রাচীন কামরূপ কামতাবিহার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ) বহুতর প্রাচীন শিব মন্দির দেখা যায় ।

বঙ্গসাহিত্যে এই শ্রেণীর গ্রন্থ বড় বেশী নেই । এ জন্যে এবং বিষয়ের বিচিত্রতার ও কবির সহজ সরল বর্ণনার গুণে এই গ্রন্থখানি সুন্দর-বড়ই সুন্দর । এর সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য লিখনি মুখে বুঝান থেকে অনুভব করা অপেক্ষাকৃত সহজ । এর কবি যেমন শিক্ষিত ও পন্ডিত ছিলেন, তেমন অসাধারণ ভাবুক ও জ্ঞানী ছিলেন। মুসলমান কবির পান্ডিত্য, কবিত্ব ও ভাবুকতা দেখে পাঠ-করে যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত হবেন । বিষয়ের কাঠিন্যর জন্য অনধিকারী পাঠকের পক্ষ তার ভাব-গ্রহ কঠিন মনে হতে পারে , কিন্তু কবির লেখা সর্বত্রই জলের মত তরল। কবি যে সকল উপমা দিয়েছেন, তা ঠিক গ্রাম্য সরল প্রাণ কবির লেখনীরই উপযুক্ত। বাঙ্গালী হৃদয়ের এমন খাঁটি কথা খুব অল্প গ্রন্থেই পাওয়া যায়। গভীর সাধন তত্ত্বের কথাগুলি আমরা বুঝতে পারিনি , কিন্তু

মন্তব্য

গ্রন্থটি যতবার পড়েছি ততবারই এটি নতুন বলে মনে হয়েছে। এটি পাঠ করে প্রত্যক বারই মুন বিমল সুখ ও আনন্দ লাভ করছি। আমাদের মাতৃভাষায় মুসলমান কবির এমন সুন্দ্র গ্রন্থ আছ, এ কথা ভাবলে হৃদয় আনন্দপুত হয় ওঠে।

১৪.২ নির্বাচিত প্রশ্ন

- গোরক্ষবিজয় কাব্যের কবি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর ।
- গোরক্ষবিজয় কাব্যের কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার বর্ননা কর ।

১৪.৩ সহায়ক গ্রন্থ

গোরক্ষবিজয় - আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - দেবেশ কুমার আচার্য

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য় খন্ডর ২য় পর্ব)- অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়